হরর কাহিনি

ভুতুড়ে দুর্গ

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত



হরর কাহিনি

দুটি বই একত্রে

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

ভুতুড়ে দুর্গ

মোট দুই ডজন গল্প নিয়ে এবারের হরর সংকলন। সম্পাদক বলছেন, 'এ বইয়ের প্রায় সবগুলো গল্পই বেশ ভয়ের। কিছু কিছু গল্প তো শিরদাঁড়ায় বরফ জল ঢেলে দেয়। আর নতুনরা যে কত চমৎকার লেখেন, "ভুতুড়ে দুর্গ" আবারও তা প্রমাণ করল।' প্রমাণ চান? তা হলে বসে যান বইটি নিয়ে। দেখুন সম্পাদক বাড়িয়ে বলেছেন কিনা।



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

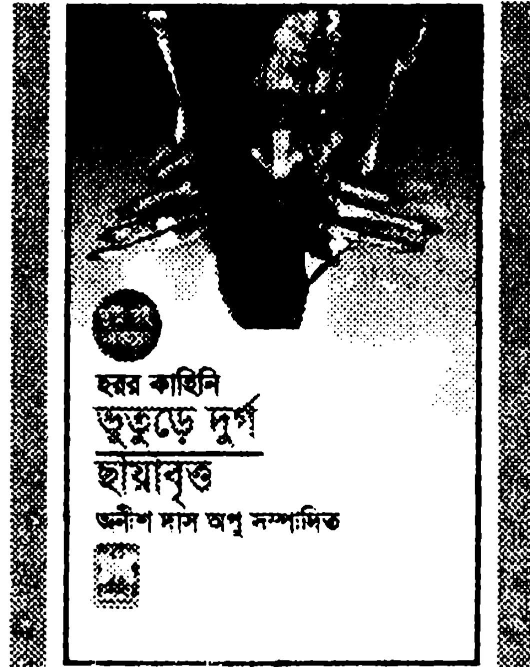
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হরর কাহিনি

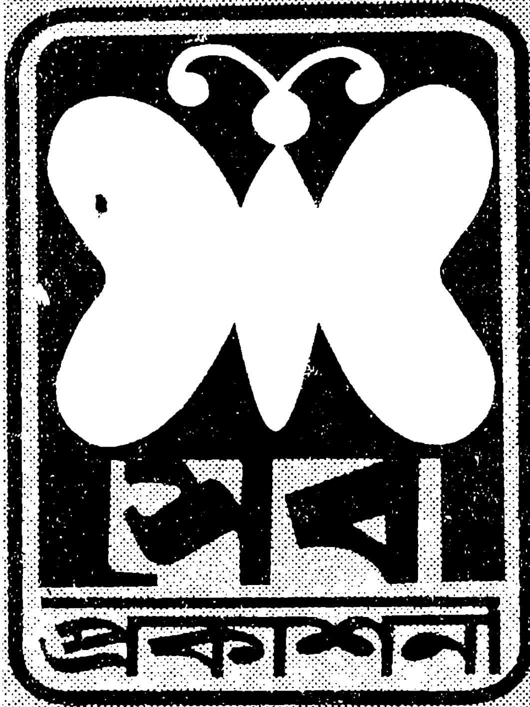
ভুতুড়ে দুর্গ

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-0257-1



আটানব্বই টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১ ৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: [illegible]৮-১৯০২০৩

BHUTURE DURGO

CHAYABRITTO
A Collection of horror stories
Edited by: Anish Das Apu

সূচি

ভূমিকা

রক্ত তৃষ্ণার গল্পগুলো রেডি করার সময় টিংকু ভাই আরেকটি গল্প সংকলনের প্রস্তাব দিলেন। বুঝলাম সম্পাদিত হরর কাহিনির নেশা তাঁকে বেশ পেয়ে বসেছে। কিন্তু বললেই তো আর এ ধরনের বই করা যায় না। ভাল ভাল হরর গল্পের দরকার হয়। আমার সন্দেহ ছিল, সাত সাতটি হরর সংকলন করার পরে আরেকটি এরকম বই করার জন্য মাল-মশলা পাব কিনা। রসদ যোগালেন হরর গল্পের মহাভক্ত টিংকু ভাই। বেশ কয়েকটি গল্পের নাম উল্লেখ করে বললেন, 'এগুলো পড়ে দেখতে পারেন। আমার ভাল লেগেছে। আপনারও হয়তো ভাল লাগবে।'

হরর গল্প পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে, লক্ষ করেছি, টিংকু ভাইয়ের রুচির সঙ্গে আমার পছন্দ-অপছন্দ বেশ মিলে যায়। অমিল যে হয় না, তা নয়, তবে এমনটি ঘটেছে কমই।

যা হোক, টিংকু ভাইয়ের নির্বাচিত গল্পগুলো পড়লাম। সত্যি ভাল লাগল। আমি নিজেও কয়েকটি গল্প বাছাই করলাম। ব্যস, তারপর দাঁড়িয়ে গেল 'ভুতুড়ে দুর্গ'। এ বইয়ের প্রায় সবগুলো গল্পই বেশ ভয়ের। কিছু গল্প তো শিরদাঁড়ায় বরফ জল ঢেলে দেয়। আর নতুনরা যে কত চমৎকার লেখেন, 'ভুতুড়ে দুর্গ' আবারও তা প্রমাণ করল। আমি নির্দিষ্ট কারও নাম উল্লেখ করতে চাই না। আপনারা পড়লেই বুঝতে পারবেন কথাটা বাড়িয়ে বলেছি কি না।

...'ভুতুড়ে দুর্গ'র জন্য গল্প বাছাই করতে গিয়ে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। আমি হঠাৎ করে অনেকগুলো চমৎকার পিশাচ কাহিনি পেয়ে গেছি। গল্পগুলো এত দারুণ, তক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আরেকটি হরর সংকলন থুড়ি পিশাচ সংকলন নামিয়ে দেব। টিংকু ভাইকে বলতেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন। আমরা দু'জনে মিলে আগামী পিশাচ সংকলনটির নামও ঠিক করে ফেলেছি—**'ভৌতিক হাত'**। পাঠক, অপেক্ষা করুন, ভুতুড়ে দুর্গ'র পরেই আসছে *ভৌতিক হাত*...

...আমার অসংখ্য ভক্ত-পাঠক ফোন করে এবং এস এম এস পাঠিয়ে আমার পিশাচ উপন্যাস 'ওয়ার উলফ'-এর খবর জানতে চেয়েছেন। পরপর তিনটি হরর সংকলন তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে উপন্যাসে হাত দিতে পারিনি। ওটা

অর্ধ-সমাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। এবার হাত দেব। রহস্যপত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় লক্ষ রাখুন। হঠাৎ করেই চমকটা পাবেন।

... 'ভুতুড়ে দুর্গ' কেমন লাগল জানাতে ভুলবেন না। আরেকটা কথা, অনেকেই সকাল বেলা আমাকে ফোন করে পান না। এর কারণ আমি রাত জেগে লিখি, দিনে ঘুমাই। কাজেই আমাকে ফোনে পেতে হলে অনুগ্রহ করে বেলা তিনটার পরে ফোন করবেন। সবাই ভাল থাকুন। শুভেচ্ছা।

অনীশ দাস অপু

ভুতুড়ে দুর্গ

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

ষোলো বছর বয়সে স্বপ্নটা প্রথমবার দেখি আমি। কী দেখি পাঠকদের বলছি সে কথা। দেখি লাল রঙের মস্ত এক অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি আমি। একটু পরেই এক লোক দরজা খুলে বলল, 'বাগানে গিয়ে চা খাও।' আমি লিভিংরুম, কিচেন পেরিয়ে বাগানে চলে এলাম। বাড়ির পেছনদিকে বাগানটা। ছ'জন নারী-পুরুষ বসে ওখানে চা পান করছে। কিন্তু তাদের আমি চিনতে পারলাম না। এরপর একজন লোক কথা বলে উঠল, আর অমনি মনে পড়ে গেল সে আমার সাথে একই স্কুলে পড়ত–জ্যাক স্টোন ওর নাম, যদিও চিনি না ভাল মত। ও বলল, অন্যরা ওর মা-বাবা-ভাই-বোন।

বাগানে ভাল লাগল না আমার। কেউ কথা বলছে না আমার সাথে, আর গরমও প্রচণ্ড। বাড়ি ফিরতে মন চাইছে। বাগানের কিনারে প্রাচীন এক দুর্গ, অসম্ভব উঁচু আর সরু এক দালান।

মিসেস স্টোন হঠাৎই আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'জ্যাকের সাথে যাও, ও তোমার ঘর দেখিয়ে দেবে। দুর্গে থাকবে তুমি।' জানি না কেন, কিন্তু তাঁর কথা শুনে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে আমার। দুর্গটা ভয়ঙ্কর আর অশুভ মনে হতে থাকে, কিছুতেই ওখানে যেতে পা সরে না। এ সময় সটান উঠে দাঁড়ায় জ্যাক, এবং নিজের অজান্তে তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হই আমি। দুর্গের ভেতর, আঁধার চিরে আমরা দু'জনে উঠছি তো উঠছিই, সিঁড়ি আর ফুরোয় না। শেষমেশ আমার কামরার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। জ্যাক দরজা মেলে ধরল এবং...আমি প্রতিবারই ঘুম ভেঙে জেগে উঠি এ পর্যন্ত এসে।

বহুবার এ স্বপ্নটা দেখেছি আমি। ঘুরেফিরে একই স্বপ্ন–বাগান, পরিবারটি, দুর্গ–সেই একই ছবি। এবং প্রতিবারই আঁতকে উঠি, মিসেস স্টোন যখন বলেন, 'জ্যাকের সাথে যাও, ও তোমার ঘর দেখিয়ে দেবে। দুর্গে থাকবে তুমি।' কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও প্রতিবারই অন্ধকারময় সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে দুর্গে উঠতে বাধ্য হই আমি, এবং জ্যাক দরজাটা খোলামাত্র ঘুম ভেঙে যায়। কামরাটার ভেতর কী আছে জানা হয় না আমার।

এরপর আরেক কাণ্ড। স্বপ্নের মানুষগুলোর ছবি বদলে যেতে লাগল। মিসেস স্টোনের চুল প্রথমটায় ছিল কালো, কিন্তু পনেরো বছর বাদে পেকে সাদা হয়ে গেল। তিনি নিজেও বৃদ্ধা আর দুর্বল হয়ে পড়লেন। জ্যাকেরও বয়স বেড়ে গেছে, প্রায়ই অসুস্থ থাকে সে। ওর এক বোনকে এখন আর দেখি না, তার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে। এ মানুষগুলোকে ভাল লাগে না আমার, এ স্বপ্ন দেখারও বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হয় না। কিন্তু রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে অপ্রিয় স্বপ্নটা দেখেই যেতে হচ্ছে।

তারপর হঠাৎ একদিন ছ'মাসের জন্যে বন্ধ হলো স্বপ্ন দেখা। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভুলে যেতে চাইলাম ওই বাগান, মানুষজন আর দুর্গটার কথা। কিন্তু এরপর এক রাতে আবার দেখলাম ওটা। এবারে মিসেস স্টোন অনুপস্থিত, এবং গোটা পরিবারের পরনে শোক পোশাক। 'মিসেস স্টোন মারা গেছেন,' ভাবলাম। 'এবার হয়তো জ্যাক আমাকে আর ওই দুর্গে নেবে না।' কিন্তু সহসা মুখ খুললেন মিসেস স্টোন–তাঁকে দেখতে পেলাম না, অথচ সে-ই আগের মতই বললেন, 'জ্যাকের সাথে যাও, ও তোমার ঘর দেখিয়ে দেবে।' যথারীতি, অনুগমন করছি জ্যাককে, এদিকে দুর্গটায় আঁধার ঘন হয়েছে আরও। দুর্গের একটা জানালা থেকে লক্ষ করলাম, বাগানের ঠিক মাঝ বরাবর গাছের নীচে এক স্মৃতিফলক, ওতে লেখা: 'অভিশপ্ত–বিপজ্জনক জুলিয়া স্টোনকে মনে করুন।' ঘেমে নেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম ঘুম ভেঙে।

সে বছর, আগস্টের প্রথম সপ্তাহ। জন ক্লিনটন নামে এক বন্ধুর সাথে সাসেক্সের এক বাসায় বেড়াতে গেলাম। ও নিজেও অবশ্যি এই প্রথম যাচ্ছে।

'তোমার ভাল লাগবে,' বলে ও। 'আমার বাসার লোকজনও আসছে। ওরা বলল, ওখানে যত খুশি ঘুরে বেড়াও, সাঁতার কাটো কোন অসুবিধা নেই। রোববার বিকেলে গাড়ি নিয়ে ওখানে চলে যাব আমরা।'

রোববার সাসেক্সে এসে পৌঁছলাম আমরা, উপভোগ্য ভ্রমণের পর। ওই গ্রামটায় যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা। বাড়িটা চিনি না বলে এক লোকের কাছে পথনির্দেশ জানতে চাইলাম। সে বলল, নদীর ওপারে গাছের জটলার পেছনে বাড়িটা, গ্রামের বাইরে পড়েছে। গাড়ি চালাচ্ছে জন, এবং এমনই গরম পড়েছে, আমি ঘুম দিলাম।

গাড়ি থেমে পড়তে ঘুম ভাঙল আমার, এবং আবিষ্কার করলাম বহুবার স্বপ্নে দেখা বাড়িটার সামনে এসে পড়েছি–স্টোন পরিবারের সেই বাড়ি। লিভিং-রুম, কিচেন পার হয়ে পেছনের বাগানে চলে এলাম দু'জনে। দেখার প্রয়োজন হলো না, আমি জানি, বাগানের কোণে দুর্গটা রয়েছে। শেষ বিকেলের রোদে চাঁদি ফেটে যেতে চায়। স্বপ্নের মত বাস্তবেও অসুস্থ আর শঙ্কিত বোধ করার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত আমি। কিন্তু বাগানের মানুষগুলো মোটেই শত্রুভাবাপন্ন নয়–ক্লিনটন পরিবার গল্প-গুজব, হাসাহাসি করে মাতিয়ে দিল আমাকে।

এরপর মিসেস ক্লিনটন বললেন আমার উদ্দেশে, 'জ্যাকের সাথে যাও, ও তোমার ঘর দেখিয়ে দেবে। দুর্গে থাকবে তুমি।' এবং আমার বন্ধু উঠে দাঁড়াল। বাসার লোকেরা তাকে 'জ্যাক' বলে ডাকে জানতে পারলাম। তাকে অনুসরণ করে ওই কামরাটার কাছে চলে এলাম। সে দরজাটা খুলতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, কেননা স্বপ্নের মধ্যে সব সময় দরজা খোলার আগেই ঘুম ভেঙে যেত আমার। কিন্তু এবারে ভেতরে পা রাখলাম আমি। চমৎকার সাজানো-গোছানো কামরাটা। বিছানায় আমার ব্যাগ-পত্র রাখা। 'অত খারাপ

হয়তো লাগবে না,' মনে মনে সান্ত্বনা দিলাম নিজেকে, 'আর এখানে এসে যখন পড়েইছি ওসব দুঃস্বপ্নও হয়তো আর হানা দেবে না।'

কিন্তু বিছানার কাছে দুটো ছবি দেখার পর পুরানো ভীতিবোধটা ফিরে এল।

একটা ছবি মিসেস স্টোনের, শণের মত চুল মাথায় এক বৃদ্ধা–স্বপ্নে প্রায়ই যেমনটা দেখেছি। অন্য ছবিটা জ্যাক স্টোনের, মুখের অভিব্যক্তি ক্রুদ্ধ আর অসুস্থ তার। এখানে আসার আগে, শেষবার স্বপ্নে দেখা অবিকল সেই মুখ। দীর্ঘক্ষণ চেয়ে রইলাম মিসেস স্টোনের ছবিটার দিকে–ভয়ঙ্কর একজোড়া চোখ মহিলার, গোটা কামরায় অনুসরণ করছে যেন আমাকে।

জন ক্লিনটন এ সময় ফিরে এসে জানাল, ডিনার রেডি। 'এই ছবিটা দেখে ভয় করছে, জন,' বললাম ওকে। 'রাতে নির্ঘাত দুঃস্বপ্ন দেখব। চলো না, এটাকে বাইরে নিয়ে যাই।'

'বেশ তো,' বলল জন।

কিন্তু বইতে গিয়ে দেখি ভয়ানক ভারী, দু'জন মিলেও গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছি। শেষমেশ নামিয়ে রাখলাম মেঝেতে।

জন হঠাৎ বলে উঠল, 'আরে, এ কী! হাতে রক্ত এল কোত্থেকে?' ওর হাত কেটে গেছে। চেয়ে দেখি আমার হাতেও রক্ত। কিন্তু ধোয়ার পর দেখি কোথাও কাটা দাগের চিহ্নমাত্র নেই। ফলে ছবিটা আবারও সরানোর জন্যে হাত লাগালাম। দরজা দিয়ে ছবিটা বের করার সময় ঠিক করলাম মিসেস স্টোনের মুখের দিকে তাকাব না, কিন্তু পারলাম না। লক্ষ করলাম তার চোখ ঠিকই অনুসরণ করছে আমাকে। তার মুখে এখন মুচকি হাসি, কিন্তু চোখ দুটো আগের চাইতেও ভয়ঙ্কর আর ক্রূর দেখাচ্ছে, মুখখানা রক্তের মত লাল এবং ছবিটার ওজনও যেন বেড়ে গেছে বহুগুণ। আমার কামরার বাইরে, দরজার পাশে অতিকষ্টে নামিয়ে রাখলাম ছবিটা।

ডিনারের জন্যে নেমে এলাম নীচে। ডিনার সেরে জন আর আমি ধূমপান করতে বেরিয়ে এলাম বাগানে। দিনের চাইতে রাতে গরম বরং বেশি লাগছে, শুতে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

হঠাৎ একটা কুকুর বাগানের ওপাশ থেকে ছুটতে-ছুটতে এসে বসে পড়ল ওই গাছটার নীচে, আমার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে যেটা দেখা যায়। স্বপ্নে দেখা সেই স্মৃতিফলকটার কাছে বসে রইল কুকুরটা, এক চুল নড়াচড়া করছে না। ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে ওটাকে। দুর্গের দিকে পাক্কা একটি মিনিট চেয়ে বসে থেকে তারপর দৌড়ে পালিয়ে গেল। এরপর এল এক বেড়াল, ওটাও হুবহু একই কাজ করল।

'জানোয়ারগুলোকে দেখলে?' বললাম জনকে। 'অমন করল কেন বলতে পার? ভয় পাচ্ছে মনে হলো না?'

'কে জানে,' অনিশ্চিত শোনাল জনের কণ্ঠ।

মাঝরাতের দিকে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে গেলাম

আমরা। ভাপসা গরমে প্রাণ অতিষ্ঠ, কিন্তু ধকল তো কম যায়নি সারাদিন, ফলে ঘুমাতে বেগ পাওয়ার কথা নয়। মিসেস স্টোনের ছবিটা বিদেয় করা গেছে, তার ফলে ভয়-ভয় ভাবটা কমে গেছে অনেকখানি। মহিলার ভয়ঙ্কর হাসি আর হাতের ক্ষতের কথা একরকম ভুলেই গেছি। চোখ বুজলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেও জানি না।

ঘুমটা ভাঙল হঠাৎই, কটা বাজে কে জানে। ভীষণ অন্ধকার এখন কামরার ভেতরটা। কোথায় রয়েছি বুঝে উঠতে খানিকক্ষণ লেগে গেল। অবশেষে, মনে পড়তে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। একটা প্রদীপ ম্লান আলো ছড়াতে, দেখতে পেলাম এক মহিলাকে, আমার অতি পরিচিত ছবির সেই মহিলা। ভীষণ একজোড়া চোখ, রক্তলাল মুখ, স্মিত হাসি...মিসেস স্টোন আমার ঘাড়ের কাছে হিমশীতল একখানা হাত রেখে কথা বলে উঠল।

'তো, এতবছর ধরে, এত স্বপ্ন দেখার পর দুর্গে এসেছ তুমি। হ্যাঁ, বহু দিন ধরে প্রতীক্ষা করছি আমি, হাল যখন ছেড়ে দিয়েছি প্রায়, তখনই এসে হাজির। কী যে খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারব না। আজ রাতে চমৎকার ভোজ জুটছে...ওহ, ভয়ানক তৃষ্ণার্ত আমি...কী ভীষণ ক্ষুধার্ত...অপেক্ষার পালা শেষ পর্যন্ত ফুরাল। এতদিন পর তোমাকে পেয়ে কত যে আনন্দ হচ্ছে...।

আবারও তার ঠাণ্ডা হাতটা আমার ঘাড় স্পর্শ করল। এবার তার মুখটা কাছিয়ে এল, দাঁত কেটে বসছে আমার গলায়... নড়াচড়ার শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু সহসা সংবিৎ ফিরে পেলাম। পালাতে হবে এই মুহূর্তে। বৃদ্ধার মুখে দুম করে ঘুসি মেরে, তড়াক করে লাফিয়ে নামলাম বিছানা ছেড়ে, ছুটছি দরজা লক্ষ্য করে। দরজার ঠিক বাইরেই ছিল জন।

'শব্দ পেয়ে ছুটে এসেছি,' বলল ও। 'কীসের শব্দ? ব্যাপারটা কী?' তারপর বলে উঠল, 'আরে! তোমার গলায় রক্ত এল কোত্থেকে?'

'জন,' বললাম ভয়ার্ত সুরে। 'যে মহিলার ছবি আমরা এ ঘর থেকে বের করে দিয়েছি...সে ফিরে এসেছে। ভেতরে আছে... জুলিয়া স্টোন তার নাম।'

হেসে উঠল জন। 'দুঃস্বপ্ন দেখেছ,' বলল। ভেতরে প্রবেশ করল স্বচক্ষে দেখার জন্যে। কিন্তু পরক্ষণে বেরিয়ে এল, মুখ মড়ার মতন ফ্যাকাসে। 'তুমি ঠিকই বলেছ...ও ভেতরে আছে! বিছানা আর মেঝেতে রক্ত।'

নীচে দৌড়ে নেমে গেলাম। পা কাঁপছে থরথর করে, দাঁড়াতে পারছি না। শীঘ্রিই দু'বন্ধু বেরিয়ে এলাম বাগানে। পরদিন ও বাড়ি ছাড়লাম। প্রায় বছরখানেক বাদে আবারও গেলাম ওই গ্রামে। গ্রামবাসীদের জিজ্ঞেস করব, দুর্গটি এবং জুলিয়া স্টোন সম্পর্কে তারা কিছু জানে কিনা। এক থুত্থুড়ে বুড়ির মুখে যা শুনলাম সেটা এরকম:

'অনেক বছর আগে এক মহিলা দুর্গের ওই ঘরটিতে মারা যায়। গ্রামের মানুষ তিনবার গির্জায় লাশ কবর দেয়ার চেষ্টা করে...কিন্তু প্রতিবারই কেউ না কেউ রাত দুপুরে মহিলার ভূত দেখতে পায়। মুখে তার রক্ত আর ক্রূর হাসি

লেপ্টে রয়েছে। সবাই তখন বুঝতে পারে, মানুষ খুন করে রক্ত পান করে সে। তাকে আর গির্জায় কবর দেয়ার চেষ্টা করেনি গ্রামবাসী, দুর্গের ওই গাছটার নীচে মাটিচাপা দেয়া হয়। ওখানে রয়েছে সে, ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করছে। লোকে বলে তরুণদের স্বপ্নে দেখা দেয় মহিলা, এবং এক সময় ডেকে আনে এখানে। তারা পৌঁছোনোর পর কী ঘটে তা তো তোমার জানাই আছে...'

মূল: ই. এফ. বেনসন
রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

রাতের বিভীষিকা

আজ ৪ মে।

মনে পড়ছে বছর পাঁচেক আগের সেই পৈশাচিক দিনটির কথা। আবছা ভাবে মনে পড়ে। পুরোটা নয়। কিন্তু এই আবছাভাবে মনে পড়াটাই এমন আতঙ্কের জন্ম দেয় যে মনে হয় পুরোপুরি মনে করতে না পারাটাই হয়তো ভাল। আজ সেই তারিখ যে তারিখটা এলে কেন জানি মনে হয় কে যেন আড়াল থেকে আমাকে দেখছে। আর সেই রক্তিম ঠোঁট আর ধারাল দাঁতগুলো বের করে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। দরজা-জানালাগুলো সব বন্ধ করে লিখতে বসেছি। তারপরও মনে হচ্ছে জানালার কাচের শার্সির ওপার থেকে জ্বলন্ত চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ তুলে জানালার দিকে তাকাতে সাহস পাই না। একবার ভেবেছিলাম লিখব না। উঠে পড়ব। কিন্তু অন্য এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে রেখেছে। আমার হাত যেন সেই শক্তির প্রভাবে কাগজের ওপর কলম নিয়ে ছুটে চলছে। এই শক্তি অশুভ নয়; বরং শুভ। হয়তো শামীম ভাইয়ের পবিত্র আত্মাই আমার উপর ভর করেছে। সেই প্রেতাত্মা হয়তো শামীম ভাইয়ের আত্মাকে জয় করতে পারেনি। হয়তো কোনদিন পারবেও না।

সম্পর্কে শামীম ভাই ছিলেন আমার পাড়াতো ভাই। অগাধ সম্পত্তি রেখে তাঁর বাবা মারা যান। সম্পত্তির পরিমাণ এতটাই বেশি ছিল যে কোনকিছু না করেও তাঁর বেশ চলে যেত। ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষা শেষ করে ঘরে বসে ছিলাম। এমন সময় হাজির হলেন শামীম ভাই।

'কী রে মিশুক, বেড়াতে যাবি?'

'কোথায়?'

'খাগড়াছড়ি। আমার গাড়িটা নিয়ে লং ড্রাইভে যাব ভাবছি। তাতে করে পুরো পাহাড়ি জায়গাটাই ঘুরে দেখা যাবে। এখন শুধু হোটেল বুক করা বাকি।'

'যাব না মানে?' লাফিয়ে উঠে বলেছিলাম, 'অবশ্যই যাব।'

'তা ব্রাদার, আপনার পরীক্ষা-টরীক্ষা নেই তো সামনে? গত বছর তো আপনাকে পরীক্ষার আগে সিলেটে নিয়ে গিয়ে সে কী টেনশন!'

'আরে না-না। পরীক্ষা তো শেষ হলো মাত্র। এখন একদম ফ্রি।'

'তা হলে আর দেরি কেন? চল, দু'জন মিলে ঘুরেই আসি ওদিকটা।'

৪ মে। বিকাল পাঁচটা।

বৃষ্টি ভেজা আবহাওয়ায় আমরা ঢাকাকে গুডবাই জানালাম। জিপের ভেতর ক্যাসেট প্লেয়ারে ফুল ভলিউমে বাজছে স্টিং-এর ডেজার্ট রোজ। স্টিয়ারিং-এ হাত

ঘোরার সাথে সাথে তালে তালে শামীম ভাইয়ের ঠোঁটেও গান চলছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে আমি বাইরে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখছিলাম। সব-মিলিয়ে একটা পিকনিক মুড। তখন যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম এই রাস্তা আমাদের জন্য সামনে কী নিয়ে অপেক্ষা করছে!

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামল। অন্ধকার গাঢ় হলো। অন্ধকার বাড়ার সাথে সাথে বৃষ্টির তেজও বাড়তে থাকল। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। এত কান্না আকাশ যেন আর ধরে রাখতে পারছে না। ভেজা রাস্তায় বাধ্য হয়েই শামীম ভাইকে গাড়ির স্পিড কমিয়ে দিতে হয়েছে। রাত সাড়ে দশটার দিকে বৃষ্টি কিছুটা ধরে এল।

বিরক্ত স্বরে বলে উঠলেন শামীম ভাই, 'ওফ, কী জ্বালারে, বাবা! ভেজা রাস্তায় এর আগে কখনও গাড়ি চালাইনি। স্টিয়ারিং কন্ট্রোল করতে করতে হাত অবশ হয়ে গেছে।'

'তা হলে এসো, এক কাজ করি। সামনের মোটেলটায় গিয়ে একটু রেস্ট নেই। সাথে ডিনারটাও সারি। তারপর আবার শুরু করা যাবে।'

'দারুণ বলেছিস। চল্।'

মোটেলের ডাইনিং-এ জানালার কাছে একটা টেবিলে বসে দু'জনে গোগ্রাসে ডিনার সারলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। দু'জন দুটো ম্যাংগো জুস নিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। এমন সময় দেখলাম হোটেলের ম্যানেজার এগিয়ে আসছেন আমাদের টেবিলের দিকে।

'এক্সকিউজ মি, সার, বসতে পারি?'

'শিওর।'

'আজ রাতে আর বাইরে না বেরোলেই কী নয়?'

'কেন বলুন তো?'

'আপনাদের সবকিছু বুঝিয়ে বলতে অনেক সময় লাগবে। আর, তা ছাড়া, আজ রাতে সেটা সম্ভবও নয়।'

'মানে?'

'আজ ক'তারিখ মনে আছে?'

'কেন? মে মাসের চার।'

অবাক বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছিলাম শামীম ভাই আর ম্যানেজার সাহেবের কথা।

'আপনি কি জানেন না আজকে কী?'

'মাফ করবেন। সত্যিই জানি না। দয়া করে একটু পরিষ্কার করে বলবেন কি?'

'এখন বলতে পারব না। তবে, সার, আপনাদের ভালর জন্যই বলছি, আজ রাতটা আর বাইরে বেরোবেন না। আমার মোটেলে রুম খালি আছে। দয়া করে রাতটা এখানে থাকুন।'

'সম্ভব না। আজ আমাদের খাগড়াছড়িতে এক বন্ধুর বাসায় ওঠার কথা। রাতের মধ্যে না পৌঁছলে ওরা ভীষণ চিন্তা করবে।'

'কী আর করা। আমি তো আর কারও নিয়তি আটকে রাখতে পারব না।

তবে...' পকেটে হাত দিয়ে ভদ্রলোক দুটো জিনিস বের করলেন। 'এ জিনিস দুটো রাখুন। জানি না এতে কতটুকু কাজ হবে। তবে একটা কথা পথে কোথাও কোনভাবেই কারও ইশারায় গাড়ি থামাবেন না। এমনকী যদি কোন বাচ্চা মেয়েকে গাড়ির চাকায় পিষে যেতে দেখেন তবুও না।'

'মানে?'

'আপনাদের দু'জনের যে-কোন একজনের সাথে বোধ হয় আর দেখা হবে না। আল্লাহ আপনাদের রক্ষা করুন।' এ কথা বলে ম্যানেজার উঠে চলে গেলেন।

জিনিস দুটো হাতে নিয়ে দেখলাম। কালো সুতোয় একটি সোনালি লকেট বাঁধা। লকেটে লেখা...ঠিক লেখা নয়, আঁকা রয়েছে একটা স্বস্তিকা চিহ্ন।

'ব্যাপারটা মনে হয় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। যাক, ও দুটো তুই গলায় ঝুলিয়ে নে। ভূতের ভয় করবে না।' শামীম ভাইয়ের কণ্ঠে পরিহাস।

'তুমি নেবে না?'

'না রে, কবচ নিয়ে খেলার বয়স নেই। হয়েছে এখন, তাড়াতাড়ি উঠে পড়। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ঝমঝম করে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সামনে কিছুই পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি চলছে খুবই ধীরে। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে একটি বাচ্চা মেয়ে রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটাকে দেখে ম্যানেজার সাহেবের সাবধানবাণী বেমালুম ভুলে গিয়ে শামীম ভাই গাড়ি থামালেন। অবশ্য ও রকম অবস্থায় ছোট্ট একটি মেয়েকে ওভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজতে দেখলে যে কেউ ওই রকমই করত।

'কী খুকী? এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?' বৃষ্টির তেজ উপেক্ষা করে শামীম ভাই জিপের গ্লাস নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মেয়েটি জানাল সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তবে সামনের শহরেই তার বাড়ি। এ রাস্তা ধরে কিছুদূর গেলেই বাড়িটি। আমরা আমাদের জিপে করে তাকে পৌঁছে দিলে তার খুব উপকার হয়।

ফলে মেয়েটাকে পেছনের সিটে নিয়ে আমরা আবার চলতে শুরু করি। কিছুদূর যেতেই গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। শামীম ভাই বৃষ্টির মধ্যে নেমে গেলেন ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সিট থেকে শুনতে পেলাম সাপের মত হিসহিস শব্দ। ঘাড়ে গরম নিঃশ্বাস। চকিতে পিছনে ঘুরি। পেছন ঘুরে যা দেখে তা বর্ণনা করা বোধ হয় আমার পক্ষে কোনদিন সম্ভব হবে না। কোথায় সেই বাচ্চা মেয়ে! ওর জায়গায় বসে রয়েছে এক হিংস্র, জান্তব প্রাণী। ওটার দাঁতগুলো ধারাল গজালের মত, চোখদুটো উন্মত্ততায় জ্বলছে। নাক দিয়ে বের হচ্ছে গরম নিঃশ্বাস। জ্বলন্ত লাল চোখ দুটো দিয়ে জিঘাংসা মিশ্রিত দৃষ্টিতে ওটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তকাল মাত্র ওটাকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তারপরই প্রাণীটা ভয়ঙ্কর এক চিৎকার দিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়েছিলাম শামীম ভাইয়ের নাম ধরে, পরমুহূর্তেই জ্ঞান হারাই।

জ্ঞান হারানোর আগে শুধু দেখেছিলাম, আমার বুকের ওপর থেকে রাক্ষসীটা যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে ছিটকে পড়ল।

হসপিটালের বেডে জ্ঞান ফিরলে আমার মাথার পাশে বাবা-মা এবং অনেককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তাদের মধ্যে আরও একজন ছিলেন। সেই মোটেলের ম্যানেজার। ওঁর কাছে পরে সব শুনতে পাই।

'বলেছিলাম না...' বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন তিনি, 'একজনের সাথে কথা হবে, দু'জনের সাথে নয়।'

'মানে?'

'শামীম সাহেবের দেহটা ফালাফালা হয়ে গেছে। ওটা যে কোনও মানুষের দেহ, সেটাই বোঝার উপায় নেই।'

'কীভাবে এমন হলো?'

'পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়েছে, নেকড়ে জাতীয় কোন প্রাণীর আক্রমণ।'

'কিন্তু...'

'আমি জানি, আপনি কী বলতে চান। কিন্তু সেটা কে বিশ্বাস করবে? আপনারাও তো আমার কথা বিশ্বাস করেননি।'

'কিন্তু ওটা কী ছিল?'

'অশুভ অতৃপ্ত এক প্রেতাত্মা, যার নেশা হলো মানুষের জীবন নেয়া।'

'তা হলে আমাকে ছেড়ে দিল কেন?'

'ওটা একসাথে একজনের বেশি কাউকে হত্যা করে না।'

'কিন্তু ওটা তো আমাকেই আগে ধরেছিল।'

'আপনার গলায় যে রক্ষাকবচ ছিল। তাই আপনার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। না হলে হয়তো এখন আপনার জায়গায় শামীম সাহেব শুয়ে থাকতেন।'

ওই ঘটনার পর কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও ওই চেহারা, ওই রাতের স্মৃতি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এখনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে, হঠাৎ করে পাড়ায় লোডশেডিং হলে, কিংবা কখনও একা থাকলে দুঃস্বপ্নের মত চোখের সামনে সেই পৈশাচিক মুখ ভেসে ওঠে। মনে পড়ে যায় সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথা।

মোঃ মুশফিকুর রহমান

অ্যাভারির ভূত

একেবারে আদিম মানুষের মত চেহারাটা হলেও অ্যাভারিলারসেন নিঃসন্দেহে খুবই উর্বর মস্তিষ্কের ছোকরা। তার মাছ ধরার কায়দাতেই ব্যাপারটার প্রমাণ পাওয়া যায়। রসালো মাছের চার, বড়শিতে লোভনীয় টোপ সত্ত্বেও যখন কিছুতেই কোন মাছ বড়শি ঠুকরেও দেখে না তখন আর সবাই মাছ ধরার বাপান্ত করে সব সরঞ্জাম গুটিয়ে উঠে পড়বে, হয়তো আশা করবে পরে কোন এক সময় মাছদের মতি গতি ফিরতেও পারে। কিন্তু অ্যাভারি সেই বান্দাই নয়।

তার উর্বর মস্তিষ্ক সবচেয়ে চতুর আর অনিচ্ছুক মাছদের পর্যন্ত শায়েস্তা করার এক অব্যর্থ কৌশল বের করে ফেলেছে। তার পদ্ধতিটা কিন্তু একদম সরল। সে মোটা একটা ব্যাঙ বড়শিতে বিঁধিয়ে পদ্মের ভাসমান পাতার ওপর বসিয়ে দেয়। তারপর ছিপের সুতো ছাড়তে ছাড়তে নৌকাটাকে সেখান থেকে বেশ দূরে সরিয়ে এনে আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরায়। যখন সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে একেবারে ফিল্টার পর্যন্ত এসে পৌঁছায় তখন সে ওটা পানিতে ছুঁড়ে নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে যায়। তারপর প্রস্তুত হয়ে ছিপের ডগাটায় একটা মৃদু ঝাঁকি দেয়। তখনই ব্যাঙটা পদ্মের পাতার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে। পানির তল থেকে যেসব মাছ পদ্মপাতার ওপর নিশ্চল ব্যাঙের ছায়াটা এতক্ষণ ওঁৎ পেতে দেখছিল তারা এই সুযোগটাই নেয়। কোন কোন সময় ব্যাঙটা পানিতে পড়ার আগেই কোন মাছ লাফিয়ে উঠে ওটা গিলে ফেলে।

জুলাই মাসের এক ভ্যাপ্‌সা গরম রোববারে অ্যাভারি আর লিউক পার্ডি, লিউকের সাদা রঙের পুরনো জীর্ণ নৌকাটায় বসে এভাবেই মাছ ধরছিল। ওরা তখন নৌকায় আয়েশ করে বসে ওদের সিগারেটটা শেষ হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

ওদের পোশাক-আশাকের ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্মুখও বলতে পারবে না সেখানে পরিপাট্যের কোন চিহ্ন আছে। ওদের দু'জনের পরনের পোশাকেরই একই অবস্থা; রঙ গেছে চটে, কাপড়ের অন্যান্য গুণাগুণের অবস্থাও তথৈবচ। নেহাৎ রোববার বলেই লিউকের পরনে একটা পরিষ্কার মত নীল শার্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দিনটা যে রোববার তা অ্যাভারি জানলেও এটা নিশ্চিত সে ওসবের পরোয়াই করে না; কেননা সে দাড়ি কামায়নি, তার ঘন রুক্ষ লালচে বাদামী চুলে চিরুনি পর্যন্ত ঠেকায়নি, আর তার পরনের পোশাকটার অবস্থা দেখলে মনে হবে গোটা সপ্তাহ জুড়ে সেটা গায়েই ঝুলেছে, আর আসলেও ব্যাপারটা সত্যি। তারা যদি শহর থেকে সামার কটেজগুলোয় থাকতে আসা লোকগুলোর মত হত তাহলে রোদপোড়া একটা সুন্দর রঙ পাবার লোভে ওরা শার্ট খুলে ফেলতে মোটেই দ্বিধা করত না। কিন্তু রোদের ব্যাপারে সেরকম বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না থাকার কারণে কেবল মুখ, গলা আর হাতের কব্জি পর্যন্ত ছাড়া আর কোথাও ওদের বিশেষ

তামাটে রঙ ধরেনি।

লিউকের সিগারেটটা আগে শেষ হলো। 'রেডি?' বলে সে বন্ধুর দিকে তাকাল। অ্যাভারি ওকে গুরুত্ব দিল না। সিগারেটটায় কষে একটা টান দিয়ে বলল, 'ওদের আরও আধমিনিট সময় দেয়া যাক।' এই বাড়তি আধমিনিট আর কিছুই না, শুধু লিউককে স্মরণ করিয়ে দেয়া এখানে কার হুকুম চলে। তিরিশ সেকেন্ড পর অ্যাভারি সিগারেটটায় শেষ একটা টান দিল, তারপর সেটায় টোকা মেরে পানিতে ছুঁড়ে দিল। সে নৌকার ওপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'মনে হচ্ছে এবার শুরু করা যায়।' উঠে দাঁড়াল লিউকও। দু'জনেই উত্তেজনায় টানটান হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল–এক সেকেন্ড, দুই সেকেন্ড। ওদের ছিপ দুটো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ রচনা করে অপেক্ষা করছে। 'এখন।' চাপা গলায় গর্জে উঠল অ্যাভারি।

ওদের দুজনের ছিপের ডগাই ঝাঁকি খেয়ে সামান্য নড়ে উঠল। ব্যাঙ দুটো পদ্মপাতার ওপর থেকে কাঁচের মত স্থির টলটলে পানির ওপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু এই প্রথমবারের মত কিছুই ঘটল না। অ্যাভারি পাথরের মূর্তির মত নৌকায় দাঁড়িয়ে আছে, ওর নীচের চোয়ালটা ঝুলে পড়েছে। দু'জনের ব্যবধানে ব্যাঙ দুটো যেখানটায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেখানকার ছোট ছোট বৃত্তাকার ঢেউ ওঠা পানির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওর ভুরু কুঁচকে গেল। গম্ভীর মুখে সে ছিপের সুতো জড়াতে শুরু করল।

লিউক কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর বন্ধুর দেখাদেখি সেও তার ছিপের সুতো গুটাতে শুরু করল। 'মাছ আজ খাচ্ছে না, অ্যাভারি।'

'কিভাবে আশা করো মাছ আজ খাবে? দেখছ না ওই বিচ্ছুগুলো পানির ধারে কিরকম গোলমাল আরম্ভ করেছে!' কণ্ঠে একরাশ বিরক্তি নিয়ে অ্যাভারি বলে উঠল। ও ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল, লেকের ধারে তিনটা বাচ্চা খেলা করছে। 'ভাগো এখান থেকে!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাভারি। এরকম গোলমাল করলে মাছ ধরা যায়।

'লেকের এই পাড়টা আমাদের!' চেঁচিয়েই উত্তর দিল পাওলি ড্যানিয়েলস, তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বড়টা। তার বয়স দশ, কিন্তু আকৃতিটা বয়সের তুলনায় ছোটই।

'না, এটা তোমাদের না,' অ্যাভারি খেঁকিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ,' লিউকও যোগ দিল, 'এটা আমার বাবার জায়গা।'

'কিন্তু গ্রীষ্মকালে নয়,' পাওলি চেঁচাল। 'আমার বাবা এটা ভাড়া নিয়েছে, এখন এটা আমাদের।'

অ্যাভারি ঝট করে লিউকের দিকে চাইল। দাঁতে দাঁত পিষে চাপা গলায় বলে উঠল, 'ওটাকে যদি আমি পানিতে চুবিয়ে না মারি রে!'

দিনটা গরম আর ভীষণ একঘেয়ে। লিউকের মুখে একটু হাসি খেলে গেল। 'তা করলেও কিন্তু বেশ হয়।' এবার সে বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল। 'অ্যাভারি,

মনে আছে, অলসনদের কুত্তাটাকে আমরা পানিতে চুবিয়েছিলাম?'

'এটা কুকুর ডোবানোর মত সহজ না,' গম্ভীর মুখে ছিপের সুতো জড়াতে জড়াতে অ্যাভারি বলল। শেষে বড়শিতে বিঁধে থাকা ব্যাঙটাও পানি থেকে তুলে ফেলল। 'বাচ্চা ডোবানোর জন্যে তোমার জেলও হতে পারে। হয়তো ফাঁসিতেও লটকে দেবে।'

লিউকও ওর ব্যাঙটা পানি থেকে তুলে নিল। 'কথাটা অবশ্য ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা হলে খুব মজা হত।'

অ্যাভারি বৈঠা মেরে নৌকাটাকে আবার পদ্মপাতাগুলোর দিকে নিতে নিতে আপনমনেই গর্জাল, 'আমি এই ছুটি কাটাতে আসা লোকগুলোকে দুচোখে দেখতে পারি না।'

'আমিও দেখতে পারি না। ওরা যে নিজেদের কী মনে করে!' অ্যাভারিকে সমর্থন করার জন্যেই বলে উঠল লিউক।

'কিন্তু তোমাকে স্বীকার করতেই হবে,' চোখ টিপল অ্যাভারি, ওর মুখে দুষ্টুমির হাসি, 'শহরের মেয়েগুলোর ব্যাপারই আলাদা।'

খ্যা খ্যা করে কুৎসিত ভঙ্গিতে হেসে উঠল লিউক। কথাটা ওর মনে ধরেছে।

পদ্মপাতাগুলোর কাছে পৌঁছে অ্যাভারি কি যেন ভাবতে ভাবতে পেছনের কটেজটার দিকে তাকাল। কটেজটার সামনেই লেকের ধারে সেই তিনটে বাচ্চা এখনও খেলছে। একটা পদ্মপাতার ওপর নিজের ব্যাঙটা রাখতে রাখতে সে বলে উঠল, 'মিসেস ড্যানিয়েলস কিন্তু দেখতে দারুণ।' তারপর তাড়াতাড়িই যোগ করল, 'মানে, আমি বলছিলাম, তার বয়স বছর ত্রিশেক হওয়া সত্ত্বেও।'

লিউক মাথা ঝুঁকিয়ে ওর কথায় সায় দিল। পদ্মপাতার ওপর ব্যাঙটা রেখে ছিপ থেকে সুতো ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'মহিলা মনে হয় খুব একটা ভাল নেই। গোটা গ্রীষ্মকালটা বেচারাকে স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে।'

নৌকাটাকে এবার পদ্মপাতাগুলোর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবার জন্যে বৈঠা মারতে মারতে অ্যাভারি বলল, 'আমরা কিন্তু তার সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলেও পারি।'

'একেবারে বাসায়?' লিউকের চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল।

'কেন, এতে আশ্চর্যের কি আছে? আমরা পড়শী; একটু খোঁজ-খবর তো রাখতেই পারি,' গম্ভীর মুখে বলল অ্যাভারি।

লিউকের হাসিটা এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল। মুখের কাছে দু'হাত জড়ো করে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই পাওলি, তোমার মা কোথায়?'

পাওলি বালুর ঘর-বাড়ি বানাতে ব্যস্ত; ওদের দিকে না ফিরেই উত্তর দিল, 'শহরে গেছে।'

'শহরে কি করতে?' অ্যাভারি জিজ্ঞেস করল।

'চার্চে গেছে, আবার কোথায় যাবে,' পাওলি বলল।

'তাহলে তোমরা যাওনি কেন?'

'গ্রীষ্মকালটা আমাদের ছুটি,' পাওলি উত্তর দিল।

বৈঠা মারা থামিয়ে একটু হতাশ কণ্ঠে অ্যাভারি বলল, 'সে শহরে গেছে। শহর থেকে মনে হয় সন্ধ্যার আগে ফিরবেও না।'

'আমরা রাতেও যেতে পারি।'

অ্যাভারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আর আজ সারাদিন আমরা করবটা কি?'

পাওলির ছোটবোন সিন্ডি, যে কিনা ওর চেয়ে দু'বছরের ছোট কিন্তু আবার মাথায় ওর চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা, পানির মধ্যে মনের আনন্দে দাপাদাপি করছে। শব্দটা অ্যাভারির মেজাজ দিল বিগড়ে। সে কড়া চোখে তাকাল সিন্ডির দিকে; মনে মনে চাইল বিচ্ছুটা পানির তলায় কোন চোরা গর্তে পড়ে জনমের মত তলিয়ে যাক। ঠিক এই সময় তিন নম্বর বিচ্ছুটাও ওর চোখে পড়ল। জোয়েল একটা পাত্রে করে লেকের পানি তুলে নিয়ে গিয়ে বালুতে ফেলছে, আবার পানি নেবার জন্যে ফিরে আসছে। লেকটা মনে হয় এভাবেই খালি করে ফেলবার মতলব করেছে।

হঠাৎ তার কানে এল, সিন্ডি জিজ্ঞেস করছে, 'আচ্ছা, পাওলি, লেকের ওই ধারে ওই পুরনো বাড়িটা কিসের?'

'ওটা ভূতের বাড়ি,' আরেক পাত্র পানি বালুর ওপর ঢালতে ঢালতে জোয়েল বলল।

'ভূতের বাড়ি বলে কিছু নেই,' সিন্ডি রায় দিল।

'তুমি জানো না, ওটা সাংঘাতিক ভুতুড়ে।' জোয়েল কিছুতেই হার মানবে না, সে ভাইয়ের সমর্থনের আশায় পাওলির দিকে চাইল। 'তাই না, পাওলি?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর মুখে জানাল পাওলি।

সিন্ডির ভুরু কুঁচকে উঠল। 'এটা হতেই পারে না। মা বলেছে ভূত বলেও কিছু নেই, ভুতুড়ে বলেও কিছু নেই।'

'আছে আছে!' চেঁচিয়ে উঠল জোয়েল।

পাওলি একেবারে লেকের ধারে গিয়ে চেঁচিয়ে জানতে চাইল, 'অ্যাভারি, ফন্টেন প্লেসে ভূত আছে না?'

অ্যাভারির উর্বর মস্তিষ্ক কাজ করতে শুরু করল। 'হ্যাঁ, অবশ্যই ভূত আছে।'

'দেখলে? আমি বলেছিলাম না!' পাওলির কণ্ঠে বড়মানুষির ভাব।

'আমি জানি এটা মিথ্যে,' সিন্ডি বলল।

'দেখো, অ্যাভারিও বলছে ওখানে ভূত আছে,' জোয়েল যুক্তি দেখাল।

'ও আমাদের বোকা বানাচ্ছে,' সিন্ডি জবাব দিল।

'অ্যাই লিউক,' লিউকের হাঁটুর নিচে ছোট একটা লাথি কষে অ্যাভারি বলল, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

চোখ মুখ কুঁচকে আঘাতের জায়গাটা হাতের তালু দিয়ে ডলতে ডলতে লিউক উঠে বসল। 'আমাকে ডাকার জন্যে লাথিই মারতে হবে?'

'শোন, ওরা ফন্টেন প্লেসের কথা বলছিল...'

'ওই ভুতুড়ে বাড়িটা?'

'আরে গাধা, ওটা মোটেই ভুতুড়ে না! লোকে বলে, ওই পর্যন্তই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি।'

'কিছুদিন হলো শহরের এক লোক বাড়িটা কিনে ফেলেছে, সুতরাং ওটা আর পোড়ো বাড়িও থাকছে না। কিন্তু ওই পিচ্চিগুলো এসবের কিছুই জানে না। আর নতুন বাসিন্দারা যখন এখনও ও বাড়িতে ঢোকেনি তখন বুঝতেই পারছ?'

'কি?'

'কি আবার, লেকের ধারে পিচ্চিগুলো গোলমাল করে আমাদের মাছ ধরা পণ্ড করেছে। ওদের শায়েস্তা করতে হবে।' নিজের চতুর প্ল্যানটার কথা ভেবে আপন মনেই হেসে উঠল অ্যাভারি। 'আমি ওদের বাড়িটা ঘুরে দেখাতে নিয়ে যাব। বাচ্চারা এসব কেমন পছন্দ করে তা তো জানোই, আর তুমি বাড়িটার ভেতর লুকিয়ে ভূত সেজে ভয় দেখাবে।'

'মানে? সেটা কিভাবে করব?'

অ্যাভারি বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকাল। লিউকটা এতই গাধা যে সামান্য একটা সরল সোজা জিনিসও চট্ করে মাথায় নিতে পারে না। 'আমি ওদের লেকের ধার দিয়ে ওই বাড়িটায় নিয়ে যাব,' অ্যাভারি লিউকের মাথায় ঢোকানোর জন্য ভেঙে সরল করে বলছে। 'আর তুমি তখন বাড়ি যাবার নাম করে নৌকাটা নিয়ে আমাদের আগেই ওখানে পৌঁছে যাবে, বুঝেছ?'

লিউক আবার চোখ পিটপিট করছে। 'আসলে...আসলে আমার ওই বাড়িটা খুব একটা ভাল লাগে না।'

'কি হলো আবার। আমি তো বলেছি ওটা ভুতুড়ে বাড়ি না!' অ্যাভারি ওর ভয়টা কাটাতে চাইছে।

'হ্যাঁ, তা জানি, কিন্তু তবু জায়গাটা আমার তেমন পছন্দ না,' লিউক আমতা আমতা করে বলল। 'আমরা বরং এখানে বসে মাছই ধরি।'

'আরে গাধা, মাছ পাচ্ছি কই সকাল থেকে। আর মজার তো একটা কিছু চাই। তাছাড়া তুমিই বলেছিলে এসব শহুরে ছুটি কাটাতে আসা লোকগুলোকে তুমি পছন্দ করো না।'

'না, তা করি না।'

'তাহলে চলো, লিউক। এখানে বসে থেকে কি লাভ। বিচ্ছুগুলোকে আচ্ছা রকম একটা শিক্ষা দেয়া যাক।'

যেখানে পাওলি বালু দিয়ে ঘর-বাড়ি বানাচ্ছিল ঠিক সেখানেই অ্যাভারি নৌকা ভেড়াল। ওরা যখন নৌকা থেকে নামছে তখন জোয়েল সেই আগের মতই লেক থেকে পানি এনে ঠিক পাওলির তৈরি ঘর-বাড়ির পাশেই ঝপাৎ করে ফেলে দিল। বালুর তৈরি বাড়িটার একটা পাশ বলাই বাহুল্য দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। মেজাজ চড়ে গেল পাওলির 'এটা কি করলে, জোয়েল? দিলে তো সব নষ্ট করে!' জোয়েলের পিঠে একটা চড় কষে ধমকে উঠল সে।

'তুমি বলছিলে এটা ওর জন্যেই তৈরি করছিলে,' শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল সিন্ডি।

পাওলি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটার মেরামতির দিকে মন দিতে দিতে বিড়বিড় করে

বলল, 'অবশ্যই, এটা তো ওর জন্যেই। কিন্তু এভাবে সব নষ্ট করে দিলে আমি কাজটা শেষ করব কিভাবে।'

অ্যাভারি আর লিউক কখন ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বাচ্চাগুলো খেয়াল করেনি। 'অ্যাই পাওলি,' অ্যাভারি ওর কণ্ঠস্বরটা যথাসম্ভব বন্ধুসুলভ করতে চাইছে।

পাওলি কাজ থেকে মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাল। 'ও অ্যাভারি। তা তোমরা মাছটাছ পেলে?'

'নাহ্। আজ একটাও পাইনি,' বলতে বলতে অ্যাভারি সেখানেই বসে পড়ল। 'আচ্ছা পাওলি, ওই ফন্টেন প্লেসে যাবে নাকি একবার?'

পাওলি চোখ বড় বড় করে তাকাল। 'ওই ভুতুড়ে বাড়িটায়?'

'নিশ্চয়,' বলে উঠল লিউক। ওর মুখে চাপা হাসি।

আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পাওলি। হতাশ কণ্ঠে বলল, 'কিভাবে যাব। মা চার্চ থেকে না আসা পর্যন্ত এই এদেরকে দেখে রাখতে হবে।'

'ওদেরও সঙ্গে নিয়ে নিলেই হলো,' বলল অ্যাভারি।

'মা আমাদের কোথাও যেতে মানা করেছে। আমাদের যাওয়াটা ঠিক হবে না।' সিন্ডি যেন পাওলিকে সতর্ক করে দিতে চাইছে।

'আসলে ওটা ভুতুড়ে বাড়ি বলেই তুমি ভয় পাচ্ছ,' সিন্ডিকে খোঁচা মারার জন্যই বলে উঠল পাওলি।

'আমি মোটেই ভয় পাচ্ছি না,' জোর দিয়ে বলল সিন্ডি। 'ভুতুড়ে বাড়ি বলে কোথাও কিছু নেই।'

'এটা তোমার ধারণা,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অ্যাভারি বলল। 'কিন্তু ফন্টেন প্লেসটা সত্যিই ভুতুড়ে।'

'ওখানে কি সত্যিই ভূত আছে?' জানতে চাইল সিন্ডি।

'ভূত কি?' এতক্ষণে জোয়েল তার অজ্ঞতা ফাঁস করে ফেলল।

পাওলি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'একজন কেউ মরে গিয়েও তোমাকে যদি ভয় দেখাতে ফিরে আসে, তাকে ভূত বলে।'

'ঠিক বলেছ, পাওলি,' অ্যাভারি বলল। 'ফন্টেন বুড়ো এখনও ও বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়; আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'ফন্টেন বুড়ো কে?' সিন্ডি জানতে চাইল।

লিউক বলল, 'ওটা একটা ভূত।'

লিউকের পাঁজরে কনুই চালাল অ্যাভারি। 'চুপ করো, আমাকে কথা বলতে দাও।'

আঘাতের জায়গাটায় হাত বুলাতে বুলাতে লিউক ক্ষীণ স্বরে কেঁউ কেঁউ করে উঠল। 'আমি তো তোমাকে সাহায্য করতেই চাইছিলাম।'

'তুমি কোন সাহায্য করতেই চেষ্টা কোরো না,' বলে অ্যাভারি পিচ্চিগুলোর দিকে ঘুরে একটা অমায়িক হাসি দিল। 'আসলে ফন্টেন বুড়ো ওই বাড়িতেই থাকত।' সে চিবুকটা চুলকাতে চুলকাতে কি একটা চিন্তা করল। 'তার তিনটে

বাচ্চা ছিল। এই তোমাদের মতই। একরাতে হঠাৎ সে সবাইকে এমনকি তার বউকেও মেরে ফেলে।'

'তাই?' উত্তেজনায় পাওলি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল। 'সে কিভাবে ওদের মারল?'

একটু চিন্তা করে অ্যাভারি বলল, 'একটা হাতুড়ি দিয়ে। ওদের সবাইকেই বিছানাতেই হাতুড়ি দিয়ে ধাম্ ধাম্ ধাম্ করে সে মারতে শুরু করে।' বলার সময় অ্যাভারি মুঠি পাকিয়ে যেন কাল্পনিক একটা হাতুড়ি ধরে আছে এমনভাবে বাতাসে ঝাঁকাতে লাগল।

'আমার বিশ্বাস হয় না,' সিন্ডি বলল।

'খোদার কসম, ঘটনা সত্যি!' অ্যাভারি নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করার জোর চেষ্টা চালায়। 'মিথ্যে হলে যেন আমি এখনই মরে যাই।'

লিউক ভয় পাওয়া কুতকুতে চোখে আকাশের দিকে চাইল। ওর মনে হলো এখনই আকাশ ফেটে কড়াৎ করে অ্যাভারির ওপর বাজ পড়বে।

'তারপর বুড়োটা কি করল?' পাওলির কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা।

অ্যাভারিকে আবার মাথা খাটাতে হলো। 'তারপর সে দোতলার জানালা ভেঙে নিচে লাফিয়ে পড়ে আর ঘাড় মটকে মারা যায়।'

'বুড়োটা সত্যিসত্যি মরে গেল?' জানতে চাইল জোয়েল।

'নিশ্চয়,' অ্যাভারি বলল। 'এখনও সে ভূত হয়ে ওই বাড়িটাতে ঘুরে বেড়ায় আর বাচ্চাদের ধরার জন্যে ওঁৎ পেতে থাকে।'

পাওলি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। 'চলো, এখনই যাই।'

'আমার মনে হয়–,' সিন্ডির কণ্ঠে দ্বিধা।

'তুমি আসলে একটা ভীতু বেড়াল!' সিন্ডির কথা শেষ না হতেই টিপ্পনি কাটল পাওলি।

'মোটেই না,' জোর গলায় প্রতিবাদ জানাল সিন্ডি।

অ্যাভারি দাঁত বের করে হাসল। 'তাহলে চলো যাওয়া যাক।'

'হ্যাঁ, চলো যাওয়া যাক,' লিউকও বলে উঠল।

অ্যাভারি ঝট্ করে আড়চোখে লিউকের দিকে তাকাল। 'লিউক, তুমি বলছিলে না তোমার যেন কি কাজ আছে?'

'কি কাজ?' লিউক যেন অবাক হয়েছে।

অ্যাভারি মাথা ঝুঁকিয়ে ইঙ্গিতে নৌকাটা দেখিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল, 'ওই যে মাছ ধরার সময় যে কাজের কথা বলছিলে।'

লিউক কিছুক্ষণ ওর দিকে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর এক সময় ওর চোখগুলো বড়বড় হয়ে গেল আর সারা মুখে একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'আরে হ্যাঁ, আমাকে তো বাড়ি যেতে হবে। একটা জরুরী কাজ আছে। আমি বরং নৌকাটা নিয়েই যাই।'

'বিদায় লিউক,' অ্যাভারি ওকে বিদায় দেবার সময় ওর পিঠে আস্তে করে একটা চাপড় মেরে বলল। 'আমার ধারণা তোমার সব মনে থাকবে; পরে দেখা

হবে।' লিউকের দিকে তাকিয়ে সে চোখ টিপল।

অ্যাভারি এবার বাচ্চাদের দিকে ফিরে জোয়েলের হাতটা ধরল, 'চলো, এবার যাওয়া যাক। লেকের পাড় ধরে আমাদের অনেকদূর হাঁটতে হবে।'

আধঘণ্টা পর অ্যাভারি আর তিন পিচ্চি সেই পুরনো ভিক্টোরীয় আমলের বাড়িটার কাঠের নড়বড়ে সিঁড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল, যেটা কিনা ফন্টেন প্লেস নামেই পরিচিত।

'ওহ্ দারুণ!' বলেই পাওলি দুড়দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করল। অ্যাভারি পেছন থেকে ওর জামার কাপড় খামচে ওকে থামাল। 'এত তাড়াহুড়ার কি আছে। এখানে ঢুকতে হবে খুব ধীরে আর সাবধানে। ভুলে যেয়ো না এখানেই কোথাও ভূতটা আছে। সবার আগে যাব আমি, তোমরা পেছন পেছন এসো।'

অ্যাভারির পেছন পেছন ওরা সাবধানে সিঁড়ি ভেঙে একেবারে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। অ্যাভারি দরজার হাতলটা ধরে নাড়া দিতেই বুঝল ওটা খোলাই আছে। সে দরজাটা ইঞ্চিখানেক খুলে ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল।

'ভেতরটা কি খুব ভয়ানক?' ফিসফিস করে পেছন থেকে জানতে চাইল পাওলি।

'হ্যাঁ,' অ্যাভারিও ফিস্‌ফিস্ করে উত্তর দিল। 'সব কিছু ধুলো আর মাকড়সার জালে ঢেকে আছে।'

'কোন ভূত দেখা যাচ্ছে?' জানতে চাইল সিন্ডি।

দরজাটা আরও ইঞ্চিতিনেক ফাঁক করে অ্যাভারি জবাব দিল, 'এখন পর্যন্ত তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' তারপর সে দরজাটা পুরো খুলে দেবার জন্যে একটা ঠেলা দিল। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল কবাট। সে সবার আগে ভেতরে ঢুকে চারপাশটা দেখে নিয়ে ওদের ডাকল। 'তোমরা এবার ভেতরে আসতে পারো। মনে হচ্ছে এখানে কোন বিপদ নেই।'

সিন্ডি পাওলিকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, 'তুমি আগে যাও।' পাওলি নড়ল না। 'তুমি বলেছিলে ভূত-টুত ভয় পাও না,' সিন্ডিকে খোঁচা মারার সুযোগটা সে ছাড়ল না।

'আমি মোটেই ভয় পাই না,' সিন্ডি জেদের সুরে বলল।

পাওলি এবার সিন্ডির হাত ধরে টান দিল। 'তাহলে তুমি যাও দেখি।'

সিন্ডি একটা ঝাঁকি দিয়ে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। 'বেশ, আমিই আগে যাচ্ছি।' বুকের সবটুকু সাহস জড়ো করে সে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ভেতরে ঢুকে মেঝের নড়বড়ে একটা কাঠের ওপর পা রাখতেই ভাঙা কাঠটা যেন ব্যাঙের মত ভাঙা গলায় ডেকে উঠল। সিন্ডি এই আকস্মিক শব্দে একটা অস্ফুট চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল। ওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

পাওলি হো হো করে হেসে উঠল। 'ওটা একটা পচা কাঠ, বোকা।' সে এবার বেশ সাহসী ভঙ্গি নিয়ে সিন্ডির পেছন পেছন ভেতরে এসে ঢুকল।

'সিন্ডি আসলেই একটা ভীতু বেড়াল।' অ্যাভারিও হাসছে।

কথাটা জোয়েলের খুব পছন্দ হয়ে গেছে। 'ভীতু বেড়াল, ভীতু বেড়াল, সিন্ডি

একটা ভীতু বেড়াল!' সে ছড়ার মত সুর করে বলতে বলতে ভেতরে ঢুকল।

'আসলেই তুমি একটা ভীতু বেড়াল,' পাওলি বলল, এখনও সে হেসেই চলেছে।

ক্ষোভের সঙ্গে মেঝেতে পা ঠুকে সিন্ডি চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি মোটেই ভীতু নই।'

যখন পিচ্চিরা এই হুল্লোড় নিয়েই মেতে আছে তখন অ্যাভারি খুব সাবধানে সবার অলক্ষে পায়ের গোড়ালির পেছনটা দিয়ে খোলা দরজাটায় লাথি মেরে ওটা বন্ধ করে দিল। দরজা বন্ধের দড়াম্ শব্দটা ওদের সবাইকে চমকে দিল। সব কথা আপনাআপনিই বন্ধ হয়ে গেছে।

পাওলির হাসিও আচমকা উধাও হয়ে গেছে। 'ওটা কিসের শব্দ, অ্যাভারি?'

অ্যাভারি ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে দরজার দিকে তাকাল, একটা মেকি বিস্ময় কণ্ঠে ফুটিয়ে বলল, 'বোধহয় বাতাসে দরজাটা আপনাআপনিই বন্ধ হয়ে গেছে।'

জোয়েল এবার খুক খুক করে কাঁদতে শুরু করল। 'আমি বাড়ি যাব!' সিন্ডি জোয়েলের হাতটা ধরে দৃপ্ত ভঙ্গিতে অ্যাভারির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'দরজাটা খুলে দাও।'

অ্যাভারি দরজার হাতলটা ধরে মিছিমিছিই শব্দ করে ঝাঁকাল। 'শক্তভাবে আটকে গেছে, খোলা যাচ্ছে না।'

জোয়েল কান্নার মধ্যেই আবার চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি বাড়ি যাব!'

'আমাদের এখান থেকে বের করে নিয়ে চলো, অ্যাভারি,' মেঝেতে পা ঠুকে জোর গলায় দাবী জানাল সিন্ডি।

'আমি একবার চেষ্টা করি,' বলেই পাওলি ছুটে গেল দরজার কাছে।

ঠিক সেই সময় ওপরে হাতুড়ি পেটার ধাম্ ধাম্ শব্দ শুরু হলো।

বাম হাতে পাওলিকে ধরে আর ডান হাতে দরজাটা চেপে বন্ধ করে রেখে অ্যাভারি চাপা গলায় বলে উঠল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

তিনটে বাচ্চাই বরফের মত জমে গেছে।

'এটা হাতুড়ির শব্দ,' সিন্ডি ভয়ার্ত গলায় ফিসফিস করে উঠল। এবার হাতুড়ি পেটার শব্দের সঙ্গে একটা মৃদু গোঙানির আওয়াজও শুরু হলো।

'ওটা কি?' ভয়ার্ত চোখে পাওলি তাকাল অ্যাভারির দিকে।

'ফন্টেন বুড়োর ভূত,' বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠল অ্যাভারি। 'এবার সে তার হাতুড়ি নিয়ে আসছে তোমাদের ধরতে।'

তিন পিচ্চিই পাগলের মত চিৎকার করতে করতে দরজার দিকে ছুটল।

'আমি ভেবেছিলাম তোমরা এসবে মোটেই ভয় পাও না,' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাভারি। সে সিন্ডিকে ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু সিন্ডি মাথা নিচু করে চট করে বসে বাউলি কেটে এড়িয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে অ্যাভারির গোড়ালিতে একটা মোক্ষম লাথি কষিয়ে দিতেও ভুলল না। অ্যাভারি যন্ত্রণায় এক পায়ে লাফাতে লাগল।

পাওলি ততক্ষণে একটানে দরজা খুলে চেঁচিয়ে ডাকছে, 'চলে এসো।'

অ্যাভারি একটা শেষ চেষ্টা করল সিন্ডিকে ধরার যখন সিন্ডি আর জোয়েল ওর সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পা হড়কে সে দরজার কাছে মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। তারপর কোনমতে উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে তিন পিচ্চিই সমানে চিৎকার করতে করতে প্রাণপণে উঠোন পেরিয়ে ছুটছে। সে দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে ঘুসি পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'পালাও! হতচ্ছাড়া সব ভীতু বেড়াল কোথাকার, পালাও!' নিজের হাঁটুর ওপর চাপড় মেরে সে হাসিতে ভেঙে পড়ল। 'এবার বিচ্ছুরা আমাদের মাছ ধরা পণ্ড করার মজাটা বোঝো।' সে আর কিছুতেই হাসি থামাতে পারছে না।

দরজার সামনে থেকে ফিরে সিঁড়ির কাছে এসে সে দোতলার দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে ডাকল, 'অ্যাই লিউক, দেখে যাও শহর থেকে ছুটি কাটাতে আসা বিচ্ছুগুলো কি ভয় পাওয়াই না পেয়েছে।' কিন্তু ওপর থেকে মৃদু গোঙানির শব্দটা ছাড়া আর কোন উত্তর এল না।

'লিউক!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাভারি। গোঙানিটা এখনও শোনা যাচ্ছে। গলাটা পরিষ্কার করে আবার হেঁকে উঠল অ্যাভারি। 'এসব বন্ধ করে নিচে এসো লিউক।' গোঙানিটা হঠাৎ থেমে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার শুরু হলো। 'উপরে কি করছ তুমি? নিচে নেমে এসো, আসল মজাটাই তুমি মিস্ করলে।' গোঙানিটা যেন এবার চাপা কান্নায় পরিণত হলো।

'এসব বন্ধ কর লিউক,' ধম্‌কে উঠল অ্যাভারি। ওর মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। 'তুমি কি আমাকেও ভয় দেখাতে চেষ্টা করছ?'

এবার কান্নাটা থেমে গেল। আর শব্দটা থেমে যেতেই চারপাশের নিস্তব্ধতা যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। অ্যাভারির শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। 'তুমি যদি এখনই নিচে না আসো তবে আমি উপরে এসে এখনই তোমার বারোটা বাজাচ্ছি!' নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু থামল সে। 'তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, লিউক?' সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখে সে হাঁক ছাড়ল। যখন কোন উত্তর এল না তখন সে আরও কয়েকটা ধাপ টপকাল। 'আমি উপরে আসছি কিন্তু!' সিঁড়ির পরের ধাপটাতে পা রাখার আগে সে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল। 'তুমি শুনতে পাচ্ছ, আমি উপরে এসে তোমার খেলা বার করছি।'

গোঙানির শব্দটা সেই মুহূর্তেই আবার শুরু হলো। 'এসব বন্ধ করো, লিউক।' সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে অ্যাভারি ধমকে উঠল। শব্দটা তখনও শোনা যাচ্ছে। দোতলায় উঠে একটা বড় হলঘরের এক প্রান্তে একটা দরজা দেখতে পেল। শব্দটা যেন ওদিক থেকেই আসছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে উঠল, 'লিউক, তুমি কি এখানে আছ?' গোঙানির শব্দটা এবার আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। অ্যাভারি দরজার হাতলে হাত রাখল। আর হাত রাখা মাত্রই কল্পনাপ্রবণ মনটা তার অজান্তেই সক্রিয় হয়ে উঠল। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে লিউক গাধাটা সত্যি সত্যিই কিছু না বুঝতে পেরে বাড়ি চলে গেছে, আর দরজার ওপাশে হয়তো সত্যি সত্যিই ভয়ানক কিছু একটা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। সে মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যাপারটা তাড়াতে চাইল। অসম্ভব! ফন্টেন বুড়ো বলে কোনদিনই কেউ

ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাই তো তার উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে সে দরজার হাতলটা ঘোরাতে শুরু করল।

কামরার ওপাশে একটা ছোট্ট জানালা। ধুলো পড়ে পড়ে কাঁচটা প্রায় অস্বচ্ছ হয়ে এসেছে। খানিকটা আলো ওখান দিয়ে ঘরে ঢুকছে, তাও একটা অদ্ভুত লালচে রঙ সারা ঘরটাকে কেমন যেন ভুতুড়ে করে তুলেছে। সেই আবছা আলোতেও অ্যাভারির চোখে পড়ল ঘরের কোণায় রাখা কাপড়চোপড়ের পুঁটলির মত কিছু একটা। হঠাৎ সেই কাপড়ের পুঁটলিটা মেঝেতে একটা গড়ান দিয়ে যেন উঠে বসতে চেষ্টা করছে। আর তখনই পুঁটলিটার ভেতর থেকে একটা হাত বের হতে দেখা গেল। 'অ্যাভারি...' কেউ যেন খুক্ করে কেঁদে উঠতে গিয়েও থেমে গেল।

অ্যাভারি চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা স্বস্তির সঙ্গে ফেলতে ফেলতে লিউকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'কেন, কি ভেবেছিলে? ফন্টেন বুড়োর ভূত?'

'আমি জানি না।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল লিউক।

অ্যাভারি ওকে পাশ কাটিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাতের তালু দিয়ে কাঁচের খানিকটা অংশের ধুলো পরিষ্কার করে বাইরে তাকাল। 'দেখে যাও বিচ্ছুগুলো কেমন ছুটছে। তুমি কিন্তু ভালই বুদ্ধি বের করেছিলে।'

লিউক খানিকটা হতভম্বের মত জিজ্ঞেস করল, 'কিসের বুদ্ধি?' অ্যাভারি ওর দিকে ঘুরে দাঁত বের করে হাসল। 'কেন, ওই হাতুড়ি দিয়ে শব্দ করার ব্যাপারটা। এটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। অথচ দেখো, তোমাকে আমি কি গাধাই না ভাবতাম।'

'কিন্তু আমি তো শব্দ করিনি।'

'নিশ্চয় করেছ!' অ্যাভারির মুখের হাসিটা মুছে যাচ্ছে। 'আমি নিজের কানে শুনেছি।'

লিউক পাগলের মত মাথা নাড়তে লাগল। 'না-না, আমি ওটা করিনি। শব্দটা আমিও শুনেছি আর সে জন্যেই তো অমন ভয় পেয়েছিলাম।'

'তুমি ভয়...' দড়াম্ করে আচম্কা দরজা বন্ধ হবার শব্দে অ্যাভারির কথা মাঝ পথেই থেমে গেল। 'ওটা কিসের শব্দ?'

'বোধহয় বাতাসে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে,' চোখ পিট পিট করে লিউক উত্তর দিল। কিন্তু যুক্তিটা অ্যাভারির মাথায় ঢুকল না। ওরা দু'জনই দু'জনের দিকে তাকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চোখ পিটপিট করতে করতে লিউক বলে উঠল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

'কি?'

'পায়ের শব্দ।' পাগলের মত বলে উঠল লিউক। 'শুনছ, বাইরে হলঘরে পায়ের শব্দ! ফন্টেন বুড়ো! আমাদের ধরতে আসছে!'

অ্যাভারির সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। 'ফন্টেন বুড়ো বলে কেউ নেই। গল্পটা আমিই বানিয়েছি,' বলতে বলতে সে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছাল। 'দেখো, এখানে কেউই নেই।' সে একটানে দরজাটা খুলে ফেলল। দরজায় তখন একটা

ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে। তার ডানহাতে ধরা একটা হাতুড়ি।

লিউক একটা অস্ফুট চিৎকার দিয়েই মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। অ্যাভারি কি যেন বলতে চাইছে, কিন্তু ওর গলা দিয়ে একটা গোঙানির মত শব্দ বেরিয়ে এল শুধু। সে পড়িমরি করে পেছনে সরে এল তারপর আতঙ্কে রক্তজল করা একটা চিৎকার দিয়ে সে ঝাঁপ দিল কাঁচের জানালাটা লক্ষ্য করে।

'আমি এসবের কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার,' হাতুড়ি হাতে লোকটা সাদা কাপড়ে ঢাকা অ্যাভারির লাশটার দিকে চেয়ে বলে উঠল। 'আমি তখন ছাদে কাজ করছিলাম। আপনি তো জানেন, এই বাড়িটা শহরের একলোক কিনে নিয়েছে। তো আমি এই রোববারের দিনটাতেও কাজ করছিলাম। হঠাৎ বাচ্চাকাচ্চার চিৎকার শুনে চোখ তুলে দেখলাম কয়েকটা বাচ্চা ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। ওরা আবার খেলতে খেলতে বাড়িটার কোথাও কিছু ভাঙচুর করে গেল না তো, এটা দেখতে নিচে এসেই শুনলাম দোতলায় কেউ কথা বলছে। আমি দোতলার ঘরটার দিকে যেতেই দেখলাম অ্যাভারি দরজা খুলে বেরিয়ে এল আর আমাকে দেখেই একটা চিৎকার দিয়ে জানালা ভেঙে নিচে লাফিয়ে পড়ল।'

'উন্মাদটা ঘাড় ভেঙে মরেছে,' বলে উঠলেন শেরিফ। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ সব লিখে নিচ্ছেন।

লোকটা তার হাতুড়িটা লিউকের দিকে নির্দেশ করে সহানুভূতি ভরা কণ্ঠে বলল, 'আর বেচারা লিউকের তো মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।'

লিউক তখন বাড়িটার সামনে সাজিয়ে রাখা কাঠের তক্তার স্তূপটার ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে নিচু গলায় একনাগাড়ে অসংলগ্ন কি সব বিড়বিড় করে যাচ্ছে।

শেরিফ মাথা ঝাঁকালেন। 'তোমার কি মনে হয়, ওরা এখানে ভূতটুত কিছু দেখেছিল?

মূলঃ জেমস এম. গিলমোর
রূপান্তরঃ সোহেল ইমাম

পৈশাচিক

ছোটখাটো চিকন এবং হালকা-পাতলা লোকটাকে আমি এর আগে বহুবার দেখেছি। তবে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। এর আগে তাকে দূর থেকে দেখে কৌতূহল মিটিয়েছি। মুমূর্ষু এবং খসে যাওয়া মেপল গাছগুলোর মাঝখানে তার বাড়িটার অবস্থান। এই বাড়িটার দিকে চোখে স্পাইগ্লাস লাগিয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করেছি। মাঝে-মাঝে সে বারান্দায় এসে দাঁড়াত। দূর থেকে তাকে একটা কালো অবয়ব মনে হত। সে এমনভাবে তাকাত যেন সে জানে তাকে আমি দেখছি। তাকে দেখে আমার শরীরটা অজানা আশঙ্কায় শিরশির করে উঠত। তার সম্পর্কে লোকে ফিসফিস করে অনেককিছু বলে বেড়ায়। লোকে তার সম্পর্কে যা-ই বলুক না কেন, দূর থেকে লোকটার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, মানুষটার ভেতর কিছু গোলমেলে ব্যাপার-স্যাপার আছে। লোকে তার সম্পর্কে যে অশুভ ইঙ্গিত দিয়েছে, তা হলে সে সব কি সত্যি?

লোকটার বাড়ি গ্রাম থেকে বেশি দূরে নয়। তারপরও সে কখনও গ্রামে আসেনি। সপ্তাহে একদিন তার গৃহপরিচারিকা বাজারে এসে পুরো সপ্তাহের জিনিস কিনে নিয়ে যায়। লোকটা সম্পর্কে মানুষজনের যে ধারণা, তার গৃহপরিচারিকা সম্পর্কেও তাদের একই ধারণা। বুড়িটার নাম হিলগা। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে সে—শরীরটা প্যাঁচানো গাছের মত।

'তার চোখও শয়তানের মত,' গ্রামের লোকেরা ফিসফিস করে বলে। 'সেও শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে দিয়েছে।' তাই তাকে দেখলে সবাই সাথে সাথে ঈশ্বরের নাম নেয়।

শরৎকাল। কিছুক্ষণ পর বিকাল হয়ে যাবে। একটা উপন্যাস লিখছিলাম। লিখতে লিখতে হাঁপিয়ে উঠেছি। হাঁটার উদ্দেশে বের হলাম। জঙ্গলের এক জায়গায় আগুন লেগেছে। আগুনের লেলিহান শিখা বেশি দূর যেতে পারেনি। এর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম। আগুনের আলোতে গাছগুলোকে লাল আর হলুদ মনে হচ্ছে। এর মাঝ দিয়ে আমি হাঁটছি। তরতাজা বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিলাম। প্রকৃতির কোলে এসে সময়ের কথা মন থেকে দূর হয়ে গেছে।

কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। দূরে বেগুনি-রঙের পাহাড়ের সারি—তার পেছন থেকে সূর্য শেষবারের মত উঁকি মারল। চারদিক থেকে নেমে এল মিহি ধুলোর মত ঘন অন্ধকার। অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাড়িওয়ালি আমাকে নিজের ছেলের মত মনে করে। বেচারি ইতিমধ্যেই হয়তো দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে গেছে।

আমি যে জঙ্গলের ভেতর হাঁটতে বেরিয়েছি, কথাটা লোকটার জানার কথা নয়। তা ছাড়া জঙ্গল থেকে প্রায় নিঃশব্দে বের হয়েছি। তারপরও লোকটা আমার

জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে লণ্ঠন। হাতটা কাঁপছে তিরতির করে। লোকটা আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভয়ের একটা শীতল স্রোত আমার শরীরটাকে যেন বরফ করে দিল।

'বেশ?' মনে হচ্ছে গলা চিরে শব্দটা বের হলো।

'আমার নাম ফিলিপ-ফিলিপ মুর। সম্ভবত আপনি আমার কথা শুনেছেন।' তার কণ্ঠস্বরে মিশে আছে হতাশা, যন্ত্রণা আর দুঃখময়তা। 'এই সময়টা আমার সাথে কাটালে নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে না আপনার। আমার বাড়িটা এখান থেকে সামান্য দূরে।'

'সেটা বোধহয় সম্ভব নয়, মি. মুর,' বললাম আমি। 'সত্যিই আমি দুঃখিত। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখনই বোর্ডিংহাউজে না ফিরলে সবাই চিন্তা করবে। আরেকদিন না হয় যাওয়া যাবে।' বলে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম। সাথে সাথে লোকটাও সরে এল আমার কাছে। এ রকম আচরণের সাথে আমি পরিচিত নই। কিন্তু লোকটার উপস্থিতি যেন বাতাসকেও দূষিত করে ফেলেছে। মানুষটা স্বাভাবিক নয়, তার মাঝে পৈশাচিক কিছু আছে, এ চিন্তা মাথায় আসতেই আমি চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম।

সে খপ করে আমার হাতটা ধরে বলল, 'প্লিজ, চলে যাবেন না।' তার চেহারাটা আমার সামনে। 'মানুষ আমার সম্পর্কে যেসব আজেবাজে কথা বলে সব মিথ্যা। ওসব আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমি চাইলেও আপনার কোন ক্ষতি করতে পারব না, সেটা তো বুঝতেই পারছেন। সে ক্ষমতা তো আমার নেই। দেখুন আমি কত দুর্বল! বুড়ো হয়ে গেছি। এক ঘণ্টার জন্য শুধু আমার বাড়িতে আসুন। একাকীত্ব আমাকে পাগল করে তুলেছে। শুধু বুড়িটার সাথে আমার দেখা হয়। কথা হয়। আর কারও সাথে হয় না। এখন নিশ্চয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন? তাহলে ঘণ্টাখানেকের জন্য আমার সাথে চলুন।'

লোকটাকে নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেছি। তার জন্য মায়া হচ্ছে। তাকে নিয়ে কৌতূহল তো আগে থেকেই ছিল। ভয় হচ্ছে। ঘৃণাও। পরক্ষণে মনে হলো, ভয়ের কী আছে? একটা মাছি মারার ক্ষমতাও লোকটার নেই। সে শুধু আমার সাথে এক ঘণ্টা সময় কাটাতে চাইছে। একাকীত্ব সত্যিই মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। তা ছাড়া লোকটার বাড়ির ভেতরটা দেখার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠল লোকটার মত, তার বাড়িটা নিয়েও শুনেছি অনেক অশুভ কল্পকাহিনি।

অবশেষে তাকে বললাম, 'ঠিক আছে। তবে এক ঘণ্টার বেশি কিন্তু সময় দিতে পারব না।'

লোকটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তবে কেন জানি তার চোখজোড়াতে ঝিলিক মারছে সম্মোহনী শক্তি। নাকটাকে মনে হলো শকুনের। ঠোঁটজোড়া কাগজের। ব্যাপারটা ঘটল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তবে এরই মধ্যে ব্যাপারটা আমার শরীরের সব রক্ত যেন জমাট বাঁধিয়ে দিল।

'আপনি তা হলে যাবেন আমার সাথে!' বাচ্চা ছেলের মত খুশি হলো সে। 'আপনি আসছেন তা হলে? ওহ! আপনার সহানুভূতির কথা কোনদিন ভুলব না

আমি। আপনার শরীরে আনন্দ আছে—যার কথা আমি ভুলে গেছি। হয়তো আপনার সাথে সময় কাটানোর সময় জীবনের সেই আনন্দ আমি খুঁজে পাব। হয়তো যৌবনের স্মৃতিও ফিরে পাব।'

আমি তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। সে আসলে কী বলতে চাইছিল, তার অর্থ আমি বুঝিনি। এরপর অন্ধের মত আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। একজন কসাই তার ছাগলকে যেভাবে বশ করে নিয়ে যায়, অনেকটা সে রকম।

কিছুক্ষণ আমরা আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে হাঁটলাম। তারপর আগাছা ভর্তি একটা উঠান। আমাদের দেখে বাড়িটা যেন ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াল। ওটাকে মনে হচ্ছে বিষণ্ন এবং পরিত্যক্ত। অন্ধকারাচ্ছন্ন জানালাগুলো যেন আমাদের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটা বারান্দায় উঠলাম। মি. মুর দরজাটা খুলল। দরজাটা খোলামাত্র ভ্যাপসা এবং ঠাণ্ডা বাতাস যেন আমাকে জড়িয়ে ধরল। বাধ্য হয়ে কাশলাম কিছুক্ষণ। লণ্ঠনের আলোতে ঘরটাকে মনে হলো ভৌতিক। ভেতরটা বিশাল। অসংখ্য চেয়ার-টেবিল ছড়িয়ে আছে ঘরটার মাঝখানে। একটা দেয়ালে রয়েছে বিশালাকারের ফায়ারপ্লেস। তার পাশে একটা খালি বুকশেল্ফ, যেখানে অনেক আগে হয়তো বই-টই রাখা হত। জানালা এবং সিলিং থেকে ঝুলে আছে মাকড়সার জাল। ঘরটার সবকিছুতেই পড়ে আছে ধুলোর আস্তরণ। নাকে প্রবেশ করল কটু গন্ধ।

'ঘরটা খুব কম ব্যবহার করি,' ফিসফিস করে বলল সে। মনে হচ্ছে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছে মানুষটা। 'সাধারণত ঘরটা তালা দিয়ে রাখি। অতিথি এলে খুলে দেই।'

'অতিথিরা কি মাঝে-মধ্যেই আসেন?'

'না। অনেকদিন পর আপনি এলেন।' লোকটার চেহারায় যেন পরিবর্তন ঘটতে লাগল। রাস্তায় যে রকম মনে হয়েছিল, এখন তাকে সেরকম মনে হচ্ছে। 'অতিথি আপ্যায়নের কথা ভুলে গেছি মনে হচ্ছে।' তার চেহারাটা আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। 'এটাকে নিজের বাড়ি মনে করতে পারেন। এই ফাঁকে আমি কিছু কাঠ নিয়ে আসছি। এই ঠাণ্ডায় আপনাকে কষ্ট দেওয়ার কোনও মানে হয় না।'

একটা চেয়ারে বসলাম আমি। নিজেকে হঠাৎ করে দুর্বল মনে হচ্ছে। লোকটা পাশের টেবিলে লণ্ঠনটা রেখে দ্রুত হেঁটে আরেকটা দরজা খুলল। শুনতে পেলাম একজন মহিলার কণ্ঠস্বর। তাকে ধমক মেরে থামিয়ে দিল মি. মুর। তারপর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

ছায়াময় আর রহস্যে ঘেরা ঘরটাতে আমি এখন একা। হঠাৎ অজানা এক আতঙ্ক আমার নিঃশ্বাসটাকে গলায় আটকে দিতে চাইল। মনে হলো কংকালের একটা হাত আমার হৃৎপিণ্ড খামচে ধরেছে। বুঝতে পারলাম, ভয়ানক বিপদের মাঝে পড়ে গেছি। সময় থাকতে এখান থেকে এখনই পালানো উচিত। ভয়ে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কেন, এটা বোঝার চেষ্টা করলাম না। এটাও আবার বুঝতে পারছি, ভয়টা সত্যি। এর কোনও অংশ অবাস্তব নয়। তারপরও

আমি কিছুই করতে পারছি না। আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। শরীরে শক্তি নেই। মনে হচ্ছে অদৃশ্য শেকল দিয়ে আমাকে চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। কাজেই পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মি. মুর কাঠের অনেকগুলো টুকরো নিয়ে ফিরে এল। রাখল ফায়ারপ্লেসের ভেতরে। ম্যাচের কাঠি দিয়ে কাঠে আগুন জ্বালিয়ে দিল। আগুন জ্বলছে। উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে। আগুনের পাশে এগিয়ে গেলাম সব ভয় ভুলে। সাথে সাথে আমার ঠাণ্ডা শরীর উত্তাপ শোষণ করতে শুরু করল। মি. মুর আমার দিকে তাকিয়ে আছে–এটা আমি না দেখেই বুঝতে পারছি। লোকটা হাসছে।

কিছুক্ষণ আমরা কেউ কথা বললাম না। ঘরটার এক কোণায় একটা লম্বা কেবিনেট দেখা যাচ্ছে। মি. মুর কেবিনেটের দিকে হেঁটে গেল। ড্রয়ার খুলে বের করল অনেকদিনের পুরনো একটা ভায়োলিন কেস। সেটা নিয়ে সে ফায়ারপ্লেসের সামনে এসে বসল। তারপর খুব যত্ন করে বের করল বেহালাটা।

'এটা হচ্ছে প্যাগানিনির বেহালা। প্যাগানিনি সম্পর্কে জানেন তো? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক।' মনে হচ্ছে লোকটা নিজের সাথেই এখন কথা বলছে। 'এ সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি কে আর জানে! মারা যাওয়ার আগে সে এটা আমাকে দিয়ে যায়।'

'সে মারা যাওয়ার আগে?' কপাল কুঁচকে গেল আমার। 'প্যাগানিনি তো মারা গেছে প্রায় একশো বছর আগে।'

আমার কথাটাকে সে পাত্তা দিল না। 'অনেকে বলে, প্যাগানিনি বেহালা বাজানোটা শিখেছে স্বয়ং শয়তানের কাছ থেকে। তবে আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে! আমরা দু'জনই একই গুরুর কাছ থেকে বাজানোর কৌশলটা শিখেছি।'

এখন মি. মুর সম্পর্কে আমার মনে তিল পরিমাণ সন্দেহ নেই। লোকটা বদ্ধ উন্মাদ। শরীরটা ভয়ে কাঁপছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু তার নির্দেশে আবার বসে পড়লাম। 'আপনি আমার মেহমান। তাই আপনাকে আমি বেহালার সুর বাজিয়ে শোনাব। আজ, এখন প্যাগানিনি বেঁচে থাকলে যে ভাবে বাজাত, ঠিক সেরকমভাবেই আমি আপনাকে বাজিয়ে শোনাচ্ছি।'

লোকটা বেহালা বাজিয়ে যে সুর তুলল, সেটা আমি কীভাবে বোঝাব? রঙের কথা আপনি একজন অন্ধকে কীভাবে বোঝাবেন? হঠাৎ করে প্রকাশিত হলো লোকটার মেধা, আর সেই সাথে যেন বেহালাটা জীবন্ত হয়ে গেল। হালকা সুর ঘরটার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ছন্দময় সুরে এমন কিছু ছিল যে, আমি সম্মোহিত হয়ে পড়লাম। মিথ্যা শান্তি এবং নিরাপত্তার এক স্বপ্নীল জগতে আমি হারিয়ে গেলাম। আবেগে আপ্লুত হয়ে চেয়ারটায় শরীরটা এলিয়ে দিলাম। নিজেকে সঁপে দিলাম অবসন্নতায়। মাথার ভেতরে পাক খেতে লাগল নানারকম ছবি।

আচমকা সুরের পরিবর্তন ঘটল। এখন সুরটাকে মনে হচ্ছে জীবন-হরণকারী এবং নারকীয়। নানারকম সুরহীন শব্দে ঘরটা ভরে গেল। মাথার ভেতর ছবিগুলোও বদলে গেল। বীভৎস অনেকগুলো মুখ আমার দিকে তাকিয়ে কদর্যভাবে হাসছে। মাংসহীন হাতগুলোর নখ আমাকে খামচে ধরছে।

করোটিগুলো দাঁত বের করে হাসছে। মনে হচ্ছে নরকের দরজা খুলে গেছে। তাই একে একে বের হয়ে আসছে নরকের বাসিন্দারা।

লোকটা কিছুক্ষণ পর থামল। বেহালাটা নীচে রাখল। এগিয়ে এল আমার দিকে। এখনও সেই নারকীয় সঙ্গীত বেজে চলছে। আমি সম্মোহিত হয়ে পড়েছি। নিজেকে একটুও নড়াতে পারছি না। তার চোখে আত্মতৃপ্তির ছায়া। ঠোঁটের দুই পাশ থেকে বের হয়ে পড়েছে তীক্ষ্ণ দু'টি দাঁত। মুখের কোনা দিয়ে পড়ছে লালা।

'অনেকদিন অপেক্ষা করে আছি...অনেকদিন!' বলে সে আমার দিকে ঝুঁকল। 'কিন্তু এখন...এখন আমি পান করব প্রাণভরে!'

তারপর শক্তিশালী এক পশুর মত সে আমার জামাটা ছিঁড়তে লাগল। ছিঁড়ে জামাটা শরীর থেকে খুলে ফেলল। তারপর ঝুঁকে কামড় দিল গলায়। তীক্ষ্ণ দাঁত দু'টি আমার জুগুলার ভেইনে ঢুকে গেল। সারা শরীর অবশ হয়ে আছে। তারপরও তার কাছ থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। সারা শরীর ঘেমে গেছে। কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না। একটা আঙুলও নড়াতে পারছি না। বুঝতে পারছি আমার আত্মা, আমার শরীর সব দূষিত হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমি অসহায়।

এবার রঙ্গমঞ্চে আগমন ঘটল ডাইনীর মত দেখতে গৃহপরিচারিকা হিলগার। তার চোখজোড়াতে ঝরে পড়ছে ঘৃণা। হাতে লম্বা একটা ধারাল ছুরি। 'তুই, নরকের কীট!' বিলাপ করছে হিলগা। 'তুই আমাকে কথা দিয়েছিলি, ওকে আমরা দু'জন ভাগাভাগি করে ভোগ করব। আর এখন নিজেই...' হিলগার মুখ থেকে ঝরতে লাগল অভিশাপ আর নোংরা গালাগালি। মুখ তুলে সেদিকে তাকাল মি. মুর। তার ঠোঁট থেকে টুপ টুপ করে পড়ছে রক্তের ফোঁটা। জন্তুটা লাফ দিয়ে পড়ল হিলগার উপর। কামড় বসাল তার ঘাড়ে। আর হিলগার লম্বা ছুরি লোকটাকে আঘাত করছে থেকে থেকে। কিন্তু ছুরিতে কাজ হচ্ছে না। লোকটার কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। তবে দু'জন দু'জনকে আঘাত করেই চলেছে।

এরপর ঘরে প্রবেশ করতে লাগল অদ্ভুত আকারের আর কুৎসিত চেহারার দানবেরা। বুঝতে পারছি নারকীয় সঙ্গীতের সুর ওদের নরক থেকে ডেকে এনেছে এখানে আর ওরা কেন এসেছে, এটাও আমার অজানা নয়। অস্পষ্ট এবং আকারহীন ওরা। কুয়াশার ধোঁয়ার মত শরীরগুলো পাক খাচ্ছে, মোচড়াচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা শরীরের আছে আলাদা আলাদা নিষ্ঠুর এবং ক্ষুধার্ত মুখ, আর চোখ–যেগুলো রক্তের নেশায় লাল হয়ে আছে। ধীরে ধীরে ওরা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আরও কাছে চলে এসেছে ওরা।

আতঙ্কের শেষপ্রান্তে পৌঁছে হয়তো আমার মস্তিষ্ক এই নারকীয় দৃশ্য আর সহ্য করতে পারল না। অলৌকিকভাবে সম্মোহিত ভাবটা কেটে গেল আমার। পাগলের মত ছুটে গেলাম দরজার দিকে। সেটাকে ধাক্কা মেরে খুলে ফেললাম। বারান্দা পার হলাম। তারপর পালাতে লাগলাম এই নরক থেকে। আপ্রাণ চেষ্টা করছি রাস্তায় পৌঁছানোর জন্য।

কিন্তু রাস্তায় পৌঁছানোর আগেই গাছের সাথে পা আটকে গিয়ে ধপাস করে পড়ে গেলাম মাটিতে। উঠতে পারলাম না, তার আগেই ওরা দলে দলে এগিয়ে

আসতে লাগল আমার দিকে। ওদের মুখের দু'পাশ দিয়ে লালা পড়ছে। আর সেখান থেকে বের হয়ে আছে তীক্ষ্ণ দু'টি দাঁত। কপাল ভাল ওরা আক্রমণ করার আগেই আমি হারিয়ে গেলাম এক অন্ধকার জগতে, যে জগৎ আমার সব আতঙ্ক আর যন্ত্রণা শুষে নিয়ে মুক্তি দিল আমাকে।

এখানে আমি অনেকদিন ধরে আছি। প্রত্যেকদিন ডাক্তার আমাকে দেখে যায়। ডাক্তারের ধৈর্য আর সহানুভূতি সীমাহীন। কারণ তার ধারণা আমি ব্রেন ফিভারে আক্রান্ত হয়েছি। আমার গল্প শুনে সে শুধু হাসে। গর্দভ কোথাকার! তার কি ধারণা সে আমাকে বোকা বানাতে পারবে? আমার মুখের দু'পাশের দু'টি দাঁত কেন প্রতিনিয়ত লম্বা আর তীক্ষ্ণ হয়ে চলছে? এর উত্তর কি ব্যাটা দিতে পারবে? আমার ঘাড়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা দেখালে সে কেন মুখ ফিরিয়ে নেয়? এর কারণটা সে বলতে পারে না কেন?

নার্সটার সহানুভূতিও বলার মত। খুব সুন্দরী সে। ঘাড়টা বেশ লম্বা এবং ফর্সা। ঘাড়ের রগটা সুন্দরভাবে লাফায়। ওটা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। ওখানে কামড় বসিয়ে রগটাকে ছিঁড়ে আনতে খুব ইচ্ছে হয়। হায় খোদা! নিষ্ঠুর ঈশ্বর! কোনও উপায় কি নেই? কোনও আশা? আমাকে বাঁচানোর জন্য কি কোনও উপায় নেই? ইতিমধ্যে আমি কি তাদের একজন হয়ে গেছি?

আমাকে বলা হয়েছে: মি. মুর এবং তার গৃহপরিচারিকা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এটা আমি বিশ্বাস করি। কারণ প্রতি রাতে ওদের দু'জনের পৈশাচিক চেহারা জানালার পাশে ভাসতে দেখি। প্রতি রাতে শুনি বেহালার সেই নারকীয় সঙ্গীতের সুর। আমাকে ডাকছে ওরা। আমাকে হুকুম করছে ওদের কাছে যাওয়ার জন্য।

আর কতক্ষণ ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব? খুব দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি...হ্যাঁ, খুবই দুর্বল। এই দুর্বল শরীর নিয়ে মানুষ হিসাবে আর কতক্ষণ টিকতে পারব আমি?

শেষমেশ তো ওদের সাথেই যোগ দিতে হবে!

মূল: রেমন্ড হোয়েটস্টোন
রূপান্তর: সরোয়ার হোসেন

প্রতিশোধ

সেদিন, তখন বোধহয় রাত্রি ন'টা, জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের অঝোরে ঝরতে থাকা রিমঝিম বৃষ্টি দেখছি। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, নিচ্ছিদ্র রাত। এরই মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ল জিনিসটা। বাইরের দরজাটা কেমন যেন নড়ছে না? হ্যাঁ, ওই তো ধীরে ধীরে খুলে গেল পাল্লা দুটো। কে এল রে বাবা, এখন আবার! চারদিকে অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি, এর মধ্যে..., ওহ,... ওর কথা তো মনেই নেই, হয়তো হানিফ এসেছে। নাহ্, এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি।

ওই তো হানিফই, কিন্তু টলছে কেন ও?

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। কিন্তু কই? কেউ নেই তো এখানে! চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। বাগানের মধ্যে আলকাতরার মত অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। তবে কী ভুল দেখলাম!

ঘরে ফিরে আসছি। এরই মধ্যে ভিজে প্রায় জবজবে অবস্থা। বারান্দায় উঠতেই দেখি বড় আম্মা বেরিয়ে এসেছেন। আমাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, 'কী রে, হানিফ এসেছে?'

'কই, না তো!' অবাক হয়ে জবাব দিলাম।

আমার কথায় যেন বিস্মিত হলেন বড় আম্মা।

'সে কী! তা হলে আমাদের দরজায় টোকা দিল কে? তুই?'

'উঁহু,' ফের মাথা ঝাঁকালাম আমি।

'কিন্তু, কিন্তু আমার মনে হলো যেন হানিফ এসে করুণ স্বরে ডাকছে আমাকে।'

'আমারও তো মনে হয়েছিল ও বাইরের দরজা খুলে এগিয়ে আসছে,' তাজ্জব কণ্ঠে বললাম আমি। 'কিন্তু বাগানে গিয়ে দেখি কেউ নেই।'

আমার কথা শুনে চিন্তা বেড়ে গেল বড় আম্মার। তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বোঝালাম, হয়তো হানিফ কোথাও বৃষ্টি-বাদলের জন্য আটকে পড়েছে। বৃষ্টি থামলেই চলে আসবে। আর আমরা যে সব দেখেছি অথবা শুনেছি, সব মনের ভুল।

কক্সবাজারের এই প্রকাণ্ড বাগানবাড়িটি আমার নানুর একান্তই নিজস্ব। মনের মত করে এখানকার গোলাপবাগিচাটাকে সাজিয়ে তুলেছেন তিনি। বছরে একবার ঘুরতে আসি আমরা। এবার এসেছি আমি, বড় আম্মা আর তাঁর ছেলে হানিফ। প্রায় মাসখানেক রয়েছি। সামনের হপ্তায় চলে যাব।

একটু দুরন্ত প্রকৃতির ছেলে হানিফ। মারমুখী। বড়ছোট, কারও কথাই কানে তোলে না। নিজে যা বুঝবে, তাই করবে। ওর জন্য ভীষণ অশান্তিতে দিন কাটে বড় আম্মার। আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে মারামারি লেগেই আছে। আমিও

আর বুঝিয়ে পারি না।

বৃষ্টির ছন্দনৃত্য দেখার সৌভাগ্য সে রাতে মাথায় উঠল। রাত বেড়েই চলেছে, চারদিকে ভেজা অন্ধকার। অথচ এখনও হানিফের ফেরার নাম নেই। তবে কি এখানে এসেও কারও সাথে হাতাহাতি করে বসল? নাহ্, আজ ওর সাথে থাকা উচিত ছিল আমার।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এর মধ্যে ওকে কোথায় খুঁজতে বেরোব? এদিকে বড় আম্মা, নানু, নানী সকলেরই শোচনীয় অবস্থা। উপায় না দেখে মালীকেই পাঠিয়ে দিলাম। যত দূর এবং যেখানে যেখানে পারা যায় খোঁজ করে চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরে এল সে। কোথাও পাওয়া যায়নি হানিফকে।

পরদিন সকালে হানিফের খোঁজে লেগে গেল সবাই। এদিক সেদিক খুঁজে বেড়ালাম আমিও। যদি কোথাও পাওয়া যায় হানিফকে। কিন্তু সকলের শ্রমই বৃথা। কোথাও পাওয়া গেল না ওকে। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে জলজ্যান্ত একটা আস্ত মানুষ।

সেদিন রাতেও যা ঘটল তা আগের রাতেরই পুনরাবৃত্তি।

বৃষ্টি ভেজা রাত। বসে আছি। এমন সময় দেখলাম, বাইরের দরজা খুলে গেল। অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি যেন টলতে টলতে ঢুকে পড়ল ভিতরে। উঠে দাঁড়াতে যাব আমি, ঠিক তখনি গোলাপ বাগিচায় ঢুকে অন্ধকারে মিশে গেল মূর্তিটা।

মিনিট দশেক পরেই আমাকে চমকে দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে এসে ঢুকলেন বড় আম্মা। 'কী রে, হানিফ কোথায়?'

তাঁর কথা শুনে বিষম খাবার উপক্রম হলো যেন আমার। চোখ গোল গোল করে বললাম, 'তার মানে?'

'সে কী! হানিফ এ ঘরে আসেনি?' বড় আম্মার চোখ বিস্ফারিত।

'কই না তো।' জবাব দিলাম আমি।

'কিন্তু ও যে আমার দরজায় টোকা দিয়ে বলে গেল "মা, জলদি এসো, আমি মিনহাজের ঘরে আ...আছি।" ' গলা কাঁপছে বড় আম্মার।

গোটা ব্যাপারটাই ভীষণভাবে তোলপাড় করে গেল আমাকে। কী হতে পারে এ ঘটনার ব্যাখ্যা? শোনার ভুল? কিন্তু আমিও তো বড় আম্মার মতই আজ যা দেখেছি সেটা গতকালেরই পুনরাবৃত্তি...।

এসব যখন ভাবছি তখন রাত বারোটা। ঘুম আসছে না। দুশ্চিন্তায় শুধু এপাশ ওপাশ করছি। ঠিক এমনি সময় অনুভব করলাম ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ যেন আমার নিজস্ব অস্তিত্বটাকে ক্রমশ গ্রাস করে চলেছে। ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে। কী ঘটতে চলেছে বুঝতে পারছি আমি, কিন্তু বাধা দেবার এতটুকু শক্তি আমার নেই।

হাঁটছি। ধীর পায়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম সন্তর্পণে।

প্রায় মাইল খানেক চলে এসেছি আমি। গাঢ় আঁধার চারদিকে। হঠাৎ মনে

হলো, কারা যেন চেঁচামেচি করছে। একটু ভাল করে শুনতেই বুঝতে পারলাম চেঁচামেচি নয়, জঘন্য বিকৃত সুরে গান ধরেছে উপজাতীয় অসভ্যগুলো। কেউ কেউ হাততালি দিচ্ছে, নাচছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো! আমি ওদের এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছি অথচ ফিরেই তাকাচ্ছে না এদিকে। নিশ্চয় গাঁজার নেশায় উন্মত্ত হয়ে করছে এসব।

কিন্তু এ কী! আমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? এখন আর পিঠের সেই শীতল স্পর্শটা নেই। যেন গায়েব হয়ে গেছে। অন্ধকার বন জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। শিরশির করে উঠল শরীর। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল মাথার চুল।

ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছি। এমন সময়ই চোখে পড়ল কুয়োটা। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওসব পাত্তা দেয়ার সময় নেই আমার। ছুটে পালাতে পারলে বাঁচি। হঠাৎ অনুভব করলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই, আমার পিঠে সেই শীতল স্পর্শ। যেন বাড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে।

পরদিন সকালে উঠেই ফের ছুটলাম গতরাতের সেই জায়গাটায়। বিশেষ করে ওই কুয়োটা যেন বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আমাকে। স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না কিছুতেই।

কুয়োটার কাছে আসতেই চোখে পড়ল একটা লোককে। ঝুঁকে কী যেন দেখার চেষ্টা করছে। বুড়ো, উপজাতীয় লোকটার বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। একে চিনি আমি। কুফুয়া। এরই এক ছেলেকে বাগিচায় ফুল তোলার অপরাধে বেধড়ক পিটিয়েছিল হানিফ।

পায়ের শব্দ পেতেই ঘুরে তাকাল বুড়ো। চমকে উঠলাম আমি। কী ব্যাপার, অমন ভাবে চেয়ে রয়েছে কেন বুড়োটা? উফঃ! কী জঘন্য দৃষ্টি! যেন, যেন আমার বুক চিরে কলিজা দেখতে পাচ্ছে কুফুয়া। ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন হয়ে গেলাম আমি। ঝিমঝিম করছে মাথাটা। বমিবমি লাগছে। হার্টবিট বেড়ে গেছে। হাঁসফাঁস করছে বুক। বেশিক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না আমি। পড়ে গেলাম মাটিতে।

'অ্যাই মিনহাজ, আমি এখানে!'

আচমকা একটা মিনমিনে কণ্ঠস্বর চমকে দিল আমাকে। কে যেন কথা বলল মনে হলো! চোখ তুলে তাকাতেই দেখি উপজাতীয় শকুনটা এখনও তীব্র দৃষ্টিতে ঝাঁঝরা করে চলেছে আমাকে। আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা ঝরছে যেন সেই ক্রূর দৃষ্টিতে।

কিন্তু কেউ নাম নিয়েছে আমার। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। গলাটা চিনতে পেরেছি আমি। হানিফের গলা। ওই একমাত্র পুরো নামে ডাকে আমাকে, অন্যরা সকলেই মিনু বলে ডাকে।

আস্তে আস্তে পা ফেললাম আমি। কুয়োটা যেন একটা অদৃশ্য আকর্ষণে এগিয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে তার দিকে। প্রাণপণ দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ আমি। পারছি না কিছুতেই। এগিয়েই চলেছি।

এসে দাঁড়ালাম কুয়োটার সামনে। কে যেন জোর করে নিচু করে দিল আমার

ঘাড়টা। সম্মোহনী শক্তি? স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যা কিছু ঘটছে সবই আমার অনিচ্ছায়। বাইরের কোন অশুভ শক্তি গ্রাস করেছে আমাকে।

কিন্তু নীচের দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন সন্দেহ হলো আমার। মনে হচ্ছে, কিছু একটা ভাসছে পানির ভিতর। অন্ধকারে সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঝাপসা লাগছে।

মন্থর গতিতে কুয়োর ভিতরে পাশেই ঝুলে থাকা একটা বালতি নামিয়ে দিলাম আমি। পরক্ষণেই যেটা উঠে এল বালতির ভিতর সেটা অন্য কিছু নয়, একটা কাটা রোমশ হাত। বালতিটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে নির্জীব অঙ্গটা। দেখেই আঁতকে উঠলাম আমি। হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইল বাইরে। ব্যাপারটা যদি বাস্তবই হয়ে থাকে তবে ওটা আর কারও নয়, স্বয়ং হানিফের হাত। কনুই থেকে কেটে নেয়া একটা রক্তাক্ত অংশ মাত্র।

সাঁৎ করে ঘুরে তাকালাম আমি। কিন্তু কোথাও চোখে পড়ল না উপজাতীয় কুফুয়াকে। বুঝতে পারলাম, ছেলেকে মারার প্রতিশোধ নিয়েছে বুড়ো। একে একে হানিফের প্রতিটি অঙ্গ কেটে কেটে ফেলে দিয়েছে পানির ভিতর। আর এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করছে ওই বিষাক্ত চোখ দুটো। সম্মোহনী শক্তি আছে তার। হ্যাঁ, ঠিক তাই। প্রতিশোধ নিয়েছে বুড়ো, ছেলেকে মারার চরম প্রতিশোধ।

সুস্ময় আচার্য সুমন

শাহেরজাদী

মাঝরাতে দরজায় খট্‌খট্‌ শুনে ঘুম ভেঙে গেল আলমের। দরজা খুলে দেখল এক অনিন্দ্য সুন্দরী উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী দাঁড়িয়ে। মেয়েটার রূপের দীপ্তিতে একটা ধাক্কা খেয়েছে আলম। ভুল দেখছি না তো। চোখদুটো কচলে আবার তাকাল সে। ভাবল এতরাতে আমার ঘরে তো কোন তরুণী আসার কথা নয়। সে সামলে ওঠার আগেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল তরুণী। মধুঢালা কিন্নরী কণ্ঠে বলে উঠল, 'সার, আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে, আপনার দুটি পায়ে পড়ি,' মেয়েটা সত্যি সত্যি আলমের দিকে এগিয়ে এল। যেন পায়ে ধরবে।

আলম তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল। বলল, 'আরে, কী করছেন।'

আলম ওরফে রফিকুল আলম পেশায় একজন শিক্ষক। বি.সি.এস পাশ করে এবারই একটা সরকারী কলেজে জয়েন করেছে। প্রথম পোস্টিং পেয়েছে একটা মফস্বল শহরের কলেজে। বেশ পুরনো কলেজ। মফস্বল শহরটা বলতে গেলে পরিপূর্ণ একটা শহরই। শহুরে আধুনিক সব সুবিধাই আছে এখানে। প্রথমবারেই এত ভাল একটা জায়গায় সাধারণত পোস্টিং হয় না, লবিং ছাড়া তো নয়ই। কিন্তু মামা চাচা কিংবা টাকা কোনটারই জোর নেই আলমের, তাই এত ভাল জায়গায় পোস্টিং পেয়ে একটু অবাকই হয়েছিল ও। কলেজের পাশেই একটা কোয়ার্টার পেয়েছে। গাছগাছালি ঘেরা এই বাসাটিও অসাধারণ। ওর কলেজে ওই একমাত্র পুরুষ শিক্ষক। বাদবাকি সবাই শিক্ষিকা। কলেজে শিক্ষকদের রেজিস্ট্রি বুকটা ঘাঁটতে গিয়ে একটা অদ্ভুত তথ্য পেয়েছে ও। অনেকদিন এই কলেজে কোন পুরুষ শিক্ষক ছিল না। দেড় বছর আগে প্রথম একজন পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় এখানে। তারপর একে একে আরও পাঁচজন পুরুষ শিক্ষক এখানে ঘুরে গেছেন। কেউই টেকেননি। কোন এক অজ্ঞাত কারণে পোস্টিং নেবার কিছুদিন পর সবাই বদলী নিয়েছেন। এর কারণটা কলেজের শিক্ষিকা ও ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছে আলম। কিন্তু কেউই এর সঠিক কারণ জানে না। শুধু একজন শিক্ষিকা ঠাট্টা করে বলেছেন, হয়তো এখানকার শিক্ষিকাদের সাথে পেরে ওঠে না তাই।

হেসে উড়িয়ে দিলেও আলমের মনে একটা খুঁতখুঁতানি ছিলই। কিন্তু দুমাস চাকরি করার পর ওর সব সন্দেহ কর্পূরের মতই উবে গেল। এত সুন্দর একটা মফস্বল শহর, ছিমছাম পরিচ্ছন্ন। শহুরে সব সুযোগ সুবিধাই পাওয়া যায়, এখানকার লোকজনও বেশ ভাল। সংসারে আপনজন বলতে মা বড় ভাই ভাবী। মা বড় ভাইয়ের সাথে ঢাকায় থাকেন। এখনও বিয়ে থা করেনি আলম, তাই বেশ একা একা ছিমছাম জীবন কাটাচ্ছিল।

একটু ধাতস্থ হয়ে আলম খেয়াল করল, ওর গায়ে কোন জামা নেই। লুঙ্গি পরে খালি গায়েই দরজা খুলেছিল। মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে লজ্জা

পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা জামা পরে নিল। এবার মেয়েটির দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আলম। সুন্দরী, সন্দেহ নেই, কিন্তু মতলবটা আগে জানা দরকার, একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেতে হবে আমাকে?'

মেয়েটি হড়বড় করে বলে উঠল, 'পাশের গ্রামে, আপনাকে যেতেই হবে সার, আপনার ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের প্রাণপ্রিয় শাহেরজাদীর জীবন।'

চমকে উঠল আলম, উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে শাহেরজাদীর?'

শাহেরজাদী আলমের এক ছাত্রী। এই ছাত্রীর সাথে আলমের পরিচয় বেশ অদ্ভুতভাবে। একদিন এক তরুণী আলমের সাথে দেখা করতে আসে। বেশ সসঙ্কোচে ইনিয়ে বিনিয়ে জানায় সে আলমের কাছে পড়তে চায়, আলম সোজা মানা করে দেয়, ও আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে কখনও প্রাইভেট পড়াবে না। মেয়েটাকে বলল, 'তুমি কলেজে আমার ক্লাস কোরো, তাতেই হবে, শুধু শুধু পয়সা নষ্ট করবে কেন?'

মেয়েটা বলে, 'তা সম্ভব নয়, সার, আমি এ বছর পরীক্ষা দিয়েছিলাম। শুধু অঙ্কে ফেল করেছি।'

আলম তখন পরিষ্কার জবাব দিয়ে দেয়, 'আমার পক্ষে তোমাকে পড়ানো সম্ভব নয়।'

এত বড় মেয়ে ওর সামনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, ওকে নাকি এবারে পাশ করতেই হবে, যদি পাশ না করে, তবে ওর নাকি এ বছরই বিয়ে হয়ে যাবে। ও আরও পড়ালেখা করতে চায়।

এবার বেশ ভাবনায় পড়ে আলম। শেষমেশ রাজি হয়, তবে একটা শর্তে, ও কোন টাকাপয়সা নেবে না।

তরুণী অবশ্য টাকাপয়সার অভাবও অন্যভাবে পুষিয়ে দেয়। প্রায়ই আলমের জন্য এটা সেটা রান্না করে নিয়ে আসে। ওর ঘরকন্নার যাবতীয় কাজই করে দিয়ে যায়। প্রথম প্রথম হালকাভাবে তারপর কড়াভাবে মানা করে শেষমেশ হাল ছেড়ে দেয় আলম। তবে মেয়েটা ছাত্রী হিসেবে খুব ভাল। হয়তো পর্যাপ্ত গাইডেন্সের অভাবে ফেল করেছে। মেয়েটার প্রতি কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে আলমের। কোন কোন দিন যদি বিকেলে মেয়েটা পড়তে না আসে তবে দিনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে আলমের। মেয়েটাকে একটু একটু করে ভাল লাগতে শুরু করেছে আলমের। গত চারদিন মেয়েটা পড়তে আসেনি। উদ্বিগ্ন স্বরে মেয়েটাকে আবার জিজ্ঞেস করল আলম, 'কী হয়েছে শাহেরজাদীর?'

মেয়েটা বলল, 'শাহেরজাদীর প্রচণ্ড জ্বর, জ্বরের ঘোরে ও শুধু আপনার নামই বকছে। ডাক্তার বলেছে এই সময় আপনি ওর পাশে থাকলে ভাল হয়, না হলে প্রচণ্ড মানসিক শক থেকে ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে।'

আলম মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, 'শাহেরজাদী আপনার কে হয়?'

মেয়েটা বলল, 'আমি শাহেরজাদীর সখী, শাহেরজাদী আমাদের জমিদার হুজুরের একমাত্র সন্তান।'

'জমিদার, কোন জমিদার?'

'জমিদার আশ্‌রাফ খান, এ এলাকার জমিদার উনি।'

আলম ভাবল, এ নাম তো আগে শুনিনি। তা ছাড়া জমিদারি প্রথা তো অনেক আগেই উঠে গেছে, তবে এখনও অনেকে জমিদারের বংশধরদের জমিদার বলেই সম্বোধন করে। তা ছাড়া পুরুষানুক্রমে কিছু জমি পাওয়ায় সেগুলো থেকে খাজনাও নিয়মিত পেয়ে থাকে একালের নামসর্বস্ব জমিদাররা। আলম ভাবল, এ মেয়েটার সাথে এত রাতে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? মফস্বল শহর, লোকলজ্জার ভয় আছে। তা ছাড়া কে কোন মতলবে মেয়েটাকে পাঠিয়েছে কে জানে!

মেয়েটা ওর মনোভাব কী করে যেন বুঝে গেল। বলল, 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না, সার। আমার সাথে নায়েব চাচা আছেন আর যাতায়াতের সুব্যবস্থা আছে।'

এরপর আর কথা চলে না। প্রস্তুত হয়ে এসে মেয়েটাকে বলল, 'চলুন।' বাইরে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আলম।

এই যাতায়াতের সুব্যবস্থা? একটা সেকেলে দুচাকার ঘোড়ার গাড়ির টমটম দাঁড়িয়ে। দুটো সাদা ঘোড়া অধৈর্যভাবে পা ঠুকছে মাটিতে। টমটমের সামনে যাত্রা দলের লোকদের মত আগেকার আমলের রাজকীয় পোশাক পরা এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে, এ-ই বোধহয় নায়েব। টমটমের চালকের একই রকম পোশাক। হঠাৎ আলমের মনে একটা খট্‌কা লাগল। মেয়েটার পরনেও সেকেলে লম্বা লম্বা ঝুলওয়ালা সাদা সিল্কের লেহেঙ্গা। এদের সবার পোশাক আশাক দেখে মনে হচ্ছে যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে সবাই। আজকাল কেউ এরকম পোশাক পরে নাকি। হঠাৎ মেয়েটা অধৈর্য হয়ে তাড়া দিল, 'উঠুন না, সার।'

আর কিছু চিন্তা না করে টমটমে উঠে বসল আলম। ওর পাশে বসল নায়েব সাহেব আর তরুণীটি।

ওরা বসার সাথে সাথেই ঝড়ের বেগে চলতে শুরু করল টমটম। আগে কখনও টমটমে চড়েনি আলম। টমটম যে এত জোরে ছুটতে পারে এটা ওর ধারণার বাইরে ছিল। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল আলম। চেঁচিয়ে চালককে জোরে চালাতে মানা করতে যাবে, এমন সময় টমটমটা দাঁড়িয়ে পড়ল। আলম দেখল একটা বিশাল রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে টমটম। এই এলাকায় এতবড় একটা রাজবাড়ি আছে জানত না ও। টমটমটার তো পাঁচ মিনিটও সময় লাগেনি এখানে আসতে। তার মানে এ জায়গাটা ওর বাসা থেকে খুব দূরে নয়। তা হলে এতদিন কেন চোখে পড়েনি বাড়িটা? ও তো প্রায় পুরো এলাকাটাই চষে বেড়িয়েছে, কখনও দেখেনি বা কারও কাছ থেকে শোনেওনি এ বাড়ির কথা।

পাশে দাঁড়ানো নায়েবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আলম, 'বলুন তো এটা ঠিক কোন জায়গা?'

কোন জবাব পেল না। বরঞ্চ পলকহীন দৃষ্টিতে আলমের দিকে তাকিয়ে রইল নায়েব। বিনা কারণেই হঠাৎ শিউরে উঠল আলম। লোকটার চোখের দৃষ্টি ঠিক মরা মানুষের মতন। আলম সাহসী মানুষ, সহজে ভয় পায় না। কিন্তু আজ কেন জানি ভয়ের একটা স্রোত ওর বুক থেকে গলা পর্যন্ত উঠে এল। হঠাৎ করেই ওর

মনে হলো এতদিন ধরে ও শাহেরজাদীকে পড়াচ্ছে, কিন্তু কখনও মেয়েটা বলেনি সে জমিদারের সন্তান। তা ছাড়া ওর স্বচ্ছন্দ আচরণে ওকে কোন গ্রাম্য সহজ সরল মেয়ে বলেই মনে হত। ওর পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করলে বলত সংসারে বৃদ্ধ বাবা ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু কেন এই লুকোচুরি? নাকি এই মেয়েটাই মিছে কথা বলে ওকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এসেছে? কিন্তু কেন? হঠাৎ পাশ থেকে কার খ্যানখ্যানে গলা শুনে চমকে তাকাল আলম। বৃদ্ধ নায়েব ওকে ভাঙা গলায় বলছে, 'চলুন, ভেতরে চলুন।'

আলমের ইচ্ছা হলো ঘুরে দৌড় দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, দেখাই যাক না ব্যাপারটা কী।

নায়েবের সাথে রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকল আলম। গ্রামাঞ্চলের গভীর রাত, চারদিকে শুনশান নীরবতা। কী আশ্চর্য, একটা ঝিঁঝির ডাকও শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকেই অনেক মানুষ দেখে একটু স্বস্তি বোধ করল আলম। মানুষগুলোর পরনে সেকেলে পোশাক। সবাই মাথা নিচু করে হাঁটছে, কেউ আলমের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেও না। নায়েব বড় একটা হলঘর পেরিয়ে ছোট্ট একটা সিঁড়ি বেয়ে রাজবাড়ির দোতলায় উঠতে শুরু করল, পিছনে চলছে আলম। ওর গা ঘেঁষে চলছে তরুণীটি। কী মনে হতে তরুণীটির মুখের দিকে তাকাল আলম। সাথে সাথেই ভয়ে শিউরে উঠল। তরুণীটির মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে, কিছুক্ষণ আগের সেই কমনীয়তা আর নেই, তার বদলে মুখের চামড়া মরা মানুষের মত ফ্যাকাসে, চোখের দৃষ্টি মরা মানুষের মত।

আলমের হঠাৎ মনে হলো, ও এদের সাথে এসে বিরাট ভুল করেছে। পালাবার কথা মনে হতেই পিছন ফিরে তাকাল আলম, দেখল সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে টমটমের চালক, সেই একই দৃষ্টি নিয়ে, পলকও পড়ছে না চোখের।

হঠাৎ কী হলো আলমের, সম্মোহিতের মত নায়েবের পিছু পিছু দোতলার শেষপ্রান্তে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ও।

বিরাট একটা ঘর, একটা প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছে ঘরটায়! স্বল্প আলোতে দেখল একটা খাট, তার উপর আপাদমস্তক চাদরে মোড়ানো একজন মানুষ শুয়ে। আলম যেন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সম্মোহিতের মত খাটের দিকে এগুলো। খাটের পাশে গিয়ে হঠাৎ ধাতস্থ হয়ে নিজের মধ্যে ফিরে এল ও। সত্যিই এ শাহেরজাদী। চোখদুটো বোজা, ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। আলম ভাবল, ধুর, শুধু শুধু এতক্ষণ ভয়ে কাবু হয়ে ছিলাম। জ্বরটা বোঝার জন্যে শাহেরজাদীর কপালে একটা হাত রাখল ও, সাথে সাথেই বরফের মূর্তির মত জমে গেল।

শাহেরজাদীর গা মরা মানুষের মত ঠাণ্ডা! শাহেরজাদীর চোখদুটো খুলে গেল, দৃষ্টিটা ঠিক মরা মানুষের চোখের মত। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় শাহেরজাদীর গায়ের চাদরটা সরে গেল। সাথে সাথে একটা আর্তচিৎকার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল আলমের। চাদর সরে যাবার পর দেখা গেল শুধু একটা কঙ্কাল পড়ে রয়েছে বিছানায়। প্রচণ্ড ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ও। জ্ঞান হারাবার আগে শুনতে

পেল চারদিকে বীভৎস অশ্লীল মেয়েলী হাসির শব্দ।

জ্ঞান ফিরলে আলম দেখল ও এক ভাঙাচোরা বাড়ির মধ্যে পড়ে রয়েছে। চারদিকে কড়া রোদ। ঘুম ঘুম চোখে কিছুতেই মনে করতে পারল না ও এখানে কেন। তারপর হঠাৎ সবকিছু মনে পড়াতে তড়িঘড়ি করে উঠে বসল আলম। সাথে সাথে ব্যথায় ককিয়ে উঠল। সারা গায়ে অসম্ভব ব্যথা। কিন্তু তারপরও পাগলের মত ছুটে ওই পোড়োবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, দেখল সামনে শুধু ধু-ধু বিস্তীর্ণ মাঠ। পাগলের মত সেই মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল আলম। ওই পোড়োবাড়ি থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে যেতে চাইছে। কিন্তু ক্লান্ত শরীরে বেশিক্ষণ ছুটতে পারল না ও। বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে ফুসফুস, চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছে ও। হঠাৎই দেখল কিছুদূরে এক চাষী হাল চষছে। সেদিক লক্ষ্য করে প্রাণপণে দৌড়ুতে লাগল। কোনমতে চাষীর কাছে পৌঁছেই আবার জ্ঞান হারাল ও।

জ্ঞান ফিরলে আলম দেখল ও এক মাটির ঘরে পাটির ওপর শুয়ে আছে। ওর মাথার পাশে দুই বুড়োবুড়ি গভীর উদ্বেগে ওর দিকে চেয়ে আছে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এক জোয়ান লোক, সেই চাষীটি। আলম উঠে বসার চেষ্টা করলে বৃদ্ধাটি বলল, 'থাক, বাবা, থাক, তুমি শুইয়া থাকো।' বৃদ্ধা এক গ্লাস গরম দুধ এনে আলমকে খাইয়ে দিল।

শরীরে একটু শক্তি পেল ও। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি এখানে কেন?'

বৃদ্ধা বলল, 'তুমি বাবা মাঠের মইধ্যে অজ্ঞান হয়া পইড়া গেছিলা, আমার পোলায় তুমারে তুইলা আনছে। তা বাবা তুমার বাড়ি কই, থাকো কই?'

আলম জানাল ও থাকে মতিগঞ্জে।

'মতিগঞ্জ,' বৃদ্ধা অবাক হলো, 'সে তো ম্যালা দূর, এইখানে আইছিলা ক্যান?'

আলম একটু চিন্তা করল বলবে কি না। শেষে স্থির করল বলবে, পুরো ঘটনা বৃদ্ধাকে খুলে বলল ও। বৃদ্ধা সব শুনে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল, আলমকে বলল, 'তুমারে একটা কথা কই, বাবা! তুমি মতিগঞ্জ ছাইড়্যা চইলা যাও। নইলে জানে বাঁচবা না।'

আলম জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

তখন বৃদ্ধা এক কাহিনি বলতে শুরু করল, 'আমিও এই ঘটনা আমার আব্বার মুখ থেইক্কা হুনছি। এইটা ইংরেজ আমলের ঘটনা। এই এলাকার জমিদার আছিল ওসমান খান। তার একটা মাত্র মেয়ে ছিল, নাম শাহেরজাদী। এই শাহেরজাদীকে পড়াইত গ্রামের এক বি.এ পাস ছেলে। ছেলেটার কাছে পড়তে গিয়া শাহেরজাদী প্রেমে পইড়া গেল। জমিদারও শাহেরজাদীর সাথে পোলাটার বিয়া দিয়া দিল। জমিদারের কোন ছেলে নাই, তাই হেও এইরকম একটা ঘরজামাই চাইছিল। পোলাটা ছিল খুবই ভালা, কিন্তু একটু পাগলা গোছের। রাইত দিন খালি চিন্তা করত এদেশের লোক, বিশেষ কইরা মুসলমানদের কেমনে শিক্ষিত করা যায়, যাতে হেরা ইংরেজদের হাত থেইকা বাঁচতে পারে। জমিদারী প্রথা হে ঘেন্না করত। জমিদারগো মনে করত ইংরেজদের দালাল। ওর একটা জন্মের শখ ছিল

এই গেরামে একটা স্কুল করবো, তাই জমিদারের কাছে গিয়া টাকা চাইল। জমিদার সোজা মানা কইরা দিল, কারণ তখন ইংরেজ আমলের শেষ দিক, জমিদারী শান-শওকত পড়তির দিকে। ছেলেটা এরপর খুব ক্ষেইপা গেল। এইরমইধ্যে হঠাৎ কইরা জমিদার মইরা গেল। জমিদারের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইলো তার মেয়ে শাহেরজাদী। কিন্তু শাহেরজাদী পোলাটারে খুব ভালবাসত। সমস্ত সম্পত্তি লেইখা দিল পোলাটার নামে। সম্পত্তি হাতে পাইয়া পোলাটা করল কী, সব বেইচা দিল, বাকি রাখল শুধু জমিদারবাড়িটা। ওই টাকা দিয়াই সে ওই স্কুলটা বানাইল, যেটা এখন আপনাগো কলেজ। সে নিজে ওই স্কুলের হেডমাস্টার হইল, শাহেরজাদীর সাথে আর কোন সম্পর্কই সে রাখল না। এদিকে শোকে দুঃখে শাহেরজাদী যে বিছানা নিল আর উঠতে পারলো না। একদিন বিছানাতেই মইরা পইড়া থাকল। ওইদিকে এসব কোন খবরই রাখত না পোলাটা, হে আছিল স্কুল নিয়া খুবই ব্যস্ত। কিন্তু একদিন তারে মরা অবস্থায় পাওয়া যায় ওই জমিদারবাড়ির মইধ্যে। কেমনে মরল কেউ জানে না। কিন্তু ঘটনা এইখানেই শেষ হয় নাই। তারপর থেইকা এই স্কুল পরে যখন কলেজ হইলো, তখনও কোন পুরুষ শিক্ষক থাকতে পারে না। কী কারণে যেন হেরা সবাই এই জমিদারবাড়ি আইয়া বেহুঁশ হইয়া পইড়া থাকে আর কলেজ ছাইড়া পলায়। এই হইলো গিয়া ঘটনা।' বৃদ্ধা থামল।

এতক্ষণ সম্মোহিতের মত কথাগুলো শুনছিল আলম। অন্যসময় হলে ও হেসেই উড়িয়ে দিত কথাগুলো কোন গ্রাম্য বৃদ্ধের কুসংস্কার বলে। কিন্তু আজ পারল না। সিদ্ধান্ত নিল, আজই মতিগঞ্জ ছেড়ে যাবে, তারপর বদলীর ব্যবস্থা করবে। তবে কর্তৃপক্ষের কাছে কী কারণে বদলী চাইবে তা নিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে। আজকের এই ঘটনা যদি দরখাস্তে কারণ হিসেবে উল্লেখ করে, তবে ওর মানসিক সুস্থতা নিয়েই যে চিন্তা-ভাবনা শুরু করবে কর্তৃপক্ষ!!

তোফাজ্জেল হোসেন

কাপালিক

সন্ধ্যা ছটা বেজে ত্রিশ মিনিট। মন্দির পুকুরের শানবাঁধা ঘাটে বসে আছি আমরা। আমরা বলতে আমি আর নবারুণ। খুব ছোটবেলা থেকেই আমরা ক্লাসমেট কাম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অবশ্য আমি মুসলমান, আর ও হিন্দু। দুজনেই শুধু বসে আছি। কারও মুখে কোনও কথা নেই। হঠাৎ নবারুণ তাড়া দিয়ে বলল, 'চল্, এখন উঠে পড়ি। গিয়ে আবার সব গোছগাছ করে, খেয়ে-দেয়ে, রাত এগারোটার মধ্যে বেরুতে হবে।'

হ্যাঁ, তাই তো। আমার তো খেয়ালই ছিল না। আজ আমাদের সবচেয়ে বড় এবং শেষ সাধনা। ভুললে কী চলবে। অনেক কাজই আজ না করে কাল করলে হয়। কিন্তু এ কাজ তো আর কাল হবার নয়। কারণ কাল তো আর আজকের মত অমাবস্যা থাকবে না।

কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললাম, 'চল।' ঘাট থেকে উঠে সোজা আমি আমাদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। নবারুণকে বললাম, 'তুই বাড়িতে বলে আয় রাতে আমার বাড়িতে থাকবি।'

বাড়িতে আসলাম। বাড়িতে আমি একা। হ্যাঁ, শুধু আজকে রাতের কাজটির জন্যই অনেক কষ্ট আর কৌশল করে মা-বাবা আর ছোট ভাইকে নানাবাড়ি পাঠাতে হয়েছে। আজ মঙ্গলবার। গত বৃহস্পতিবার এই বাড়ি ফাঁকা করার উদ্দেশে নানাবাড়ি গেলাম। সেখানে নানী মারা গেছেন। নানা একা। গিয়ে নানার কাছে বসে একথা ওকথা বলতে বলতে একসময় বললাম, 'নানা, আমাদের বাড়িতে চলো। কতদিন আমাদের বাড়িতে যাও না। কতদিন মাকে দেখো না। কতদিন মা তোমাকে দেখে না।'

শুনেই তো আমার নিঃসঙ্গ নানা লাই পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে কোনও রকমে বলল, 'ভাই, কতদিন তোর মাকে দেখি না। আমি একা আর কেমন করে সময় কাটাই, বল। তোর মাও আমাকে আর দেখতে আসে না।'

ভাবলাম মোক্ষম সুযোগ, এটা হাতছাড়া করা যাবে না। বললাম, বাড়িতে মা-বাবা একদম ফ্রি। আমি গিয়েই তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নানা শুধু বললেন, দিস ভাই।

আর কী, রবিবারে বাড়িতে এসে তিলকে তাল, তালকে মহাতাল করে সোমবারে সবাইকে নানা বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। তাই আজ বাড়ি ফাঁকা। কাজের বুয়া দুপুরবেলা রাতের খাবার রান্না করেছে। খাবারটা হটপটে রেখে তাকে বিদায় করে দিয়েছি। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এসেই হাতমুখ ধুয়ে আমার রুমে এসে বসলাম। মাথার ওপরে সিঙ্গার ফ্যান বনবন করে ঘুরছে। ভাবলাম নবারুণ

না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। ও আসলে সবকিছু ঠিকঠাক করা যাবে। ওর আসতে কিছুটা দেরি হবে ভেবে একটা গল্পের বই নিয়ে পড়া শুরু করলাম। বেশ কিছুক্ষণ হলো পড়ছি। রাত আটটা নাগাদ নবারুণ চলে আসল। ওকে বললাম, তুই হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আয়। ও চলে গেলে আমি খাবার ঘরে ঢুকলাম। আজকে আমি ইচ্ছা করেই বুয়াকে গরুর মাংস রাঁধতে বলেছিলাম। কারণ একজন কাপালিক বলেছিল, গরুর মাংস খেয়ে সাধনায় বসলে নাকি খুব তাড়াতাড়ি তারা আসে। নবারুণ হিন্দু হলেও এসব ব্যাপারে ওর কোনও বাছবিচার নেই। নবারুণ হাতমুখ ধুয়ে আসলে দুজনে খেয়ে নিলাম। কারণ সবকিছু গোছগাছ করা হয়ে গেলে উত্তেজনায় আর হয়তো খেতে ভাল লাগবে না।

রাত সোয়া ন'টা। আমার রুমে সবকিছু গোছগাছ করছি আমরা। জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য ছোট একটা ট্রাভেল ব্যাগ নিয়েছি। প্রথমে আমার ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরাটা নিলাম। যাতে আজকের যাবতীয় ঘটনা ভিডিও করে রাখা যায়। এরপর আমাদের দুজনের জন্য তৈরি লাল আলখাল্লা, লুঙ্গি ও পাগড়ী নিলাম। আমরা অনেক কষ্ট করে পোশাকগুলো বানিয়েছিলাম। কেননা সাধনা করতে এই পোশাক ছাড়া চলবে না। আমাদের এলাকা থেকে অনেক দূরের এক দর্জির কাছ থেকে ওগুলো বানিয়ে এনেছি। ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য অবশ্য দর্জিটি পাঁচগুণ মজুরি নিতেও ছাড়েনি।

আরও কিছু ছোটখাট জিনিস, যেমন–চাকু, ধূপ প্রভৃতি নিয়ে সবশেষে নিলাম মড়ার খুলিটি। আমাদের সাধনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এ জিনিসটি জোগাড় করতে যা বেগ পেতে হয়েছে! একে তো দুষ্প্রাপ্য, তার উপর আবার গোপনে জোগাড় করতে হবে। কত জায়গায় যে গোপনে ঢুঁ মেরেছি ওটার জন্য। অবশেষে অবশ্য পেয়েছি ওটা এক কাপালিকের কাছে। ওটা নিতে গিয়েই বুঝেছি যে ওরা, মানে কাপালিকরা যে শুধু ধর্মের ভক্ত তাই নয়, তারা অর্থেরও গুরুতর ভক্ত। ওটা নিয়ে আসার পর বাড়িতে সবার অলক্ষ্যে লুকিয়ে রাখাটাও হয়ে গেল আরেক সমস্যা। অনেক চেষ্টা, তদবিরের পর একটা কাগজের ছোট বাক্সে ভরে আমার পার্সোনাল ট্রাংকে ভরে তালা মেরে রেখেছিলাম। সেখান থেকে আজ প্রথম বের করলাম। এর আগের সাধনাগুলোতে ওটা লাগেনি, তাই বেরও করা হয়নি। অনেক দিন পর বের করাতে কেমন যেন গন্ধ হয়েছে।

সবকিছু গোছগাছ হয়ে গেলে রাত এগারোটা বাজার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। বসে থাকতে থাকতে এ সংক্রান্ত দু'একটা কথা দুজনে বলতে বলতেই রাত এগারোটা বেজে গেল। ট্রাউজার খুলে দুজনেই লুঙ্গি পরে নিলাম। এরপর একটা বড় লাইট ও একটা কালো মোরগ নিয়ে দুজনে শ্মশানের দিকে রওনা দিলাম। মোরগটা যাতে না চেঁচায় সেজন্য ওর মুখ টেপ দিয়ে আটকে দিয়েছি। শুধুমাত্র আমাদের যাওয়াটা যাতে কেউ টের না পায় সেজন্যই বাড়িটা ফাঁকা করেছি।

নেপথ্যে

হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই ধরেছেন। আমরা ব্ল্যাক আর্ট চর্চা করি। সোজা বাংলায়

আমরা প্রেত সাধনা করি। অনেকে সাধনা করে মা-কালীর, আবার অনেকে করে জিনের বা দেওয়ের। কিন্তু আমরা করি প্রেতের সাধনা। সোজা কথায় প্রেতকে কীভাবে বশে আনা যায় সেই সাধনা।

প্রায় তিন বছর হলো আমরা এই ব্ল্যাক আর্ট চর্চা করে আসছি। আমাদের কাপালিকও বলা যায়। তবে এতদিন সাধনা করে আসলেও আমরা কোনও সফলতা পাইনি। এ পর্যন্ত ছয়টি সাধন শেষ করলেও, কোনও ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনও কিছুই ঘটেনি। আজকে সপ্তম ও শেষ সাধন। অবশ্য প্রেত সাধনায় ঠিকমত ছয়টি সাধন করে গেলে সপ্তম সাধনেই সাফল্য আসে। আগের সাধনগুলোতে তেমন কিছু নাও ঘটতে পারে। এরকমই বলেছিলেন আমাদের যতীন সার। হ্যাঁ, আমাদের এ ব্যাপারে হাতেখড়ি যতীন সারের কাছ থেকেই। একদিন আমি আর নবারুণ কী এক কাজে ঠিক রাত দশটায় যতীন সারের বাড়ি যাই।

যতীন সারের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে তিন কি.মি. দূরে। বাড়িতে গিয়ে দেখি দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখি পুরো বাড়িতে সুনসান নীরবতা। অবশ্য এমন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। কারণ যতীন সার চিরকুমার। তাই বউ-বাচ্চা নেই। ছোট ভাইয়েরাও যে যার মত অন্য বাড়িতে থাকে। তা ছাড়া চাকর-বাকরও খুব একটা তিনি রাখেন না। কিন্তু তাই বলে এরকম হওয়ারও কথা না। কারণ আমরা জানি যতীন সার অন্তত রাত বারোটা পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। কারণ এর আগেও আমরা এ সময় কয়েকবার এসেছি এবং তাঁকে বাতি জ্বেলে পড়তেও দেখেছি। আর এখন বাতি জ্বেলে পড়া তো দূরের কথা, গোটা বাড়িতে কোনও আলোও নেই। আমরা রীতিমত অবাকই হয়ে যাই। কয়েকবার ডাকাডাকি করে বাড়ির আবছা অন্ধকার আঙিনায় ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। আর তখনই চোখ পড়ল উত্তর-পুব কোণের ঘরটাতে। আবছা অন্ধকারে দেখলাম ঘরের মধ্যে লালমত কী যেন একটা স্তূপ। আর একটু কাছে যেতেই দেখলাম কে যেন বসে আছে। আমি সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি এটা আর কেউ নয়, আমাদের যতীন সার। আমার পায়ের শব্দ শুনে যখন বুঝলেন আমি সামনে চলে এসেছি তখন শুধু একটা হাত তুলে ইশারা করে আমাকে সরে যেতে বললেন। বুঝলাম এ মুহূর্তে এখানে থাকা ঠিক হবে না। অগত্যা আঙিনায় এসে একটা বেঞ্চি টেনে বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর সার উঠে বাইরে আসলেন। সার যদিও আমাদের চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু এতক্ষণ বসে আছি দেখে একটু অবাকই হলেন। বললেন, 'তোরা এখনও বসে আছিস, আমি তো ভেবেছি চলে গেছিস। তা কী জন্য এসেছিস বল।'

আমরা আমাদের দরকারের কথা জানালাম। আমাদের দরকারি কাজটা শেষ হতেই সারকে বললাম, 'সার, এই রাতে অন্ধকারে বসে কী পূজা করছিলেন?'

সার বললেন, 'ওটা অন্য একটা পূজা।'

আমি কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, 'অন্য একটা কী পূজা, সার?'

সার বললেন, ‘ওটা তোরা বুঝবি না।’

দেখলাম সার কিছু একটা চেপে যাচ্ছেন। এতে আমাদের আগ্রহটা আরও ছয়গুণ হয়ে গেল।

দুজনেই সারকে চেপে ধরলাম। ‘সার, আমাদেরকে বলতেই হবে আপনি কী পূজা করছিলেন। আমাদের কাছে লুকাচ্ছেনই বা কেন!’

আমাদের অনেক পীড়াপীড়িতে সার অবশেষে মুখ খুললেন।

সার বলতে লাগলেন আর আমরা উবু হয়ে বসে শুনতে থাকলাম। দীর্ঘ বক্তৃতায় সার যা বললেন তার মর্মার্থ হলো এই–সার প্রেত সাধনা করেন। যে সমস্ত মানুষ কষ্ট পেয়ে বা নির্যাতিত হয়ে মারা যায় তাদের অতৃপ্ত আত্মা প্রেত হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে একনিষ্ঠভাবে সাধনা করে গেলে কিছু কিছু প্রেতকে বশে আনা যায়। আর প্রেত বশে আনা মানেই বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। যে এই ক্ষমতার অধিকারী হবে তার অসাধ্য আর বিশেষ কিছুই থাকবে না। সে যখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে। যখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে, যেটা ইচ্ছা খেতে পারবে, যেটা ইচ্ছা পেতে পারবে, যেটা ইচ্ছা জানতে পারবে; শুধু বশে আনা প্রেতটাকে হাজির করতে হবে। সব শুনে রাস্তায় বের হয়ে দুজনেরই মাথায় একই চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকল। প্রেত সাধনা। অসীম ক্ষমতা। যা খুশি করতে পারা। নাহ্, পারতেই হবে! আমাদের পারতেই হবে!

অবশেষে সারকে গিয়ে দুজন আবার ধরলাম। আর সেই থেকেই শুরু।

এবং তারপর

আমাদের গ্রাম কাঞ্চনপুর থেকে শ্মশান আড়াই কি.মি. দূরে। আমরা রওনা দিয়েছি রাত এগারোটার দিকে। গ্রামে রাত এগারোটার সময় কেউ জেগে থাকে না। চারদিকে সুনসান নীরবতা।

তা ছাড়া গ্রামের লোকেরা অমাবস্যার রাতে কেউ বাড়ি থেকে বের হয় না। তাই আমরা নির্বিঘ্নেই হেঁটে চলেছি। তবে লাইট জ্বেলে চলতে হচ্ছে। কারণ এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তা ছাড়া সাপ-খোপেরও তো অভাব নেই।

আর পাঁচ মিনিট হাঁটলেই বদু মিয়ার মুদির দোকান, তারপরেই প্রধান রাস্তা। প্রধান রাস্তা ধরে আর পনেরো মিনিট গেলে ডানে শিবপুর গ্রাম আর তার কিছুদূর পরে নদী এবং শ্মশান। আমরা প্রধান রাস্তা ধরে হেঁটে শিবপুরের কাছাকাছি আসতেই কে যেন হাঁক ছাড়ল, ‘লাইট জ্বেলে কে যায়?’

বুঝলাম এ হচ্ছে শিবপুরের অখিল চৌকিদার। রাতে হয়তো টহল দিচ্ছে। আমি বললাম, ‘আমরা নবগ্রামের নদীতে মাছ মারতে যাচ্ছি।’

শুনে অখিল চৌকিদার আর কিছু বলল না। অমাবস্যার রাতে নদীতে বড়শি ফেললে ভাল মাছ পাওয়া যায়। এজন্য অনেকেই এরকম রাতে বড়শি নিয়ে মাছ মারতে যায়। বিষয়টা জানা থাকার কারণে বাঁচা গেল। তা ছাড়া উল্টোপাল্টা উত্তর দিলে সে যদি আমাদের সন্দেহ করে বসত তা হলে হয়তো আজকের কাজই আমাদের মাটি হয়ে যেত।

অখিল চৌকিদারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে আবার আমরা শ্মশানের দিকে

চলছি। আর মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই শ্মশান। হঠাৎ আমার বাম দিকের আকাশে কী যেন আলোর মত যাচ্ছে মনে হলো। পাশ ফিরে দেখি, হ্যাঁ, তাই তো। একটা আলোর গোলা প্রায় মাইল খানেক দূর থেকে আমাদের দিকে আসছে। দেখেই আমি নবারুণকে বললাম, 'দেখ, দেখ, কী ওটা!'

সাথে সাথে আমার ভিডিও ক্যামেরাটা বের করে ভিডিও করা শুরু করলাম। আরও কাছে আসতেই বুঝতে পারলাম ওটা আলো নয়, আগুনের গোলা। আর কিছুদূর এসেই ওটা আমাদের কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে একটা খেজুর গাছের মাথায় এসে পড়ল। সাথে সাথেই খেজুর গাছটি পটপট শব্দে পুড়তে শুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যে খেজুর গাছের পুরো মাথা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পুরো দৃশ্যটার ভিডিও শেষ করে ক্যামেরাটা পকেটে রাখলাম। হঠাৎ এরকম ঘটনায় দুজনেই অনেকটা স্তব্ধ হয়ে গেছি। নবারুণ বলল, 'কী রে, ভয় পেয়েছিস নাকি।'

সামান্য ভয় তো লাগবেই। কিন্তু মুখে বললাম, 'না-না, ভয় কীসের। জলে নেমে কুমিরের ভয় করলে কি চলে?'

দুজনে আবার হাঁটা দিলাম। একটু পরই আমরা শ্মশানে এসে পৌঁছালাম।

রাত বারোটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। দুজনেই তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে আলখাল্লা পরে সমস্ত জিনিসপত্র বের করলাম। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল আগুন জ্বালাতে গিয়ে। আমরা কাঠ নিয়ে আসিনি। মহা চিন্তায় পড়ে গেলাম। আগুন না জ্বাললে তো কোনও কাজই হবে না। অগত্যা দুজন লাইট নিয়ে ভাঙা গাছের ডাল-টাল পাওয়া যায় কি না তাই খুঁজতে লাগলাম। বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না। কয়েকটা ডাল কুড়াতেই দেখি পানির ধারে এক স্তূপ মড়া পোড়ানোর কাঠ পড়ে রয়েছে। সাথে দড়ি নেই, তাই দুজন হাতে করেই কাঠগুলো দু-তিন বারে নিয়ে এসে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। এরপর কিছুটা ছাই আলাদা করে তাতে ধুপ জ্বেলে দিয়ে নবারুণ বসে পড়ল। আমি অবশ্য বসলাম না, কারণ সংস্কৃত ওই মন্ত্রগুলো আমি খুব একটা আয়ত্তে আনতে পারিনি। নবারুণ হিন্দু হওয়ার কারণে সংস্কৃত ওর আগে থেকেই কিছুটা দখলে আছে। সে কারণে ও খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্রগুলো মুখস্থ করে ফেলেছিল। আমি আমার ভিডিও ক্যামেরা, মড়ার খুলি, মোরগ আর চাকু নিয়ে কুকুর বসা হয়ে বসে আছি। নবারুণ একের পর এক মন্ত্র আউড়ে চলেছে। আমি পাশে বসে সবকিছু ভিডিও করে চলেছি। আর মাঝে মাঝে ছাইয়ের মধ্যে কিছুটা ধূপের গুঁড়া ছেড়ে দিচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ পর নবারুণ চোখ খুলে আমাকে ইশারা করতেই মড়ার খুলিটা এগিয়ে দিলাম।

মড়ার খুলিটা আগুনের সামনে রেখে আবার কিছুক্ষণ মন্ত্র আউড়ে চলল সে। কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুলে আমাকে ইঙ্গিত করতেই চাকু আর কালো মুরগিটা এগিয়ে দিলাম। মুরগির মাথাটা মাটিতে রেখে চাকু দিয়ে এক পোঁচে দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেলল নবারুণ। মুরগির কাটা গলা দিয়ে বের হতে থাকা রক্ত প্রথমে কিছুটা আগুনে ছেড়ে দিল। তারপর বাকি অংশ মড়ার খুলির উপর ঢেলে মুরগির মাথাটা আগুনে ফেলে, আবার চোখ বুজে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করল। আমি শুধু ভিডিও করে চলেছি। আরও বেশ কিছুক্ষণ পার হলো। হঠাৎ মনে হলো

আমার বাম পাশে কিছুটা দূর দিয়ে সাদা মত কী যেন সাঁ করে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি, নাহ্, কোথাও কিছু নেই। ভাবলাম হয়তো কোনও নিশাচর পাখি। এদিকে নবারুণের মন্ত্র পড়া প্রায় শেষ। মাথার খুলিটা নিয়ে সাতবার আগুনের চারদিকে পাক দিয়ে সবে বসে পড়েছে। হঠাৎ পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'নমস্কার, কাকাবাবু।'

এইরকম একটা অন্ধকার রাতে এরকম শ্মশানের মত জায়গায় হঠাৎ মানুষের কণ্ঠ পেয়ে হকচকিয়ে উঠলাম।

আবার বিরক্তও হলাম। অযথাই আমাদের কাজে ডিস্টার্ব করতে এসেছে। তবুও মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখে নবারুণ বলল, 'নমস্কার।'

'তা কাকাবাবুরা কী করছেন।'

'তেমন কিছু না। এই আর কী।'

'লুকোচ্ছেন? আমি কিন্তু জানি আপনারা কী করছেন। আপনারা প্রেত সাধনা করছেন। শুধু তাই না, আমি আপনাদের চিনিও বটে।'

দেখলাম লোকটা কাঁচাপাকা মধ্যবয়স্ক। সাদা ধুতি আর সাদা গেঞ্জি পরা।

আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আপনি কাঞ্চনপুরের খায়রুল মোল্লার ছেলে।' আবার নবারুণকে দেখিয়ে বলল, 'আপনি অর্জুনের ছেলে।'

আমরা দেখলাম মহা বিপদ তো। লোকটা আমাদের সবই জানে। খবরটা বাড়িতে ফাঁস করে দিলে তো আমাদের বারোটা বেজে যাবে। ভেবে দেখলাম লোকটা হয়তো অনেক আগে থেকেই আমাদের ফলো করে আসছে। আর এখন এসেছে ভয় দেখিয়ে কিছু ফাও কামানোর জন্য। নবারুণ বলল, 'দেখুন কাকা, আপনি যখন সব জানেনই তখন দয়া করে কিছু ফাঁস করবেন না। আমরা না হয় আপনাকে কিছু টাকা দেব ।'

শুনে লোকটা কিছুটা বিমর্ষই হয়ে গেল। বলল, 'না না, আমি আপনাদের কথা ফাঁস করব কেন! আর কার কাছেই বা ফাঁস করব? আমি তো কারও সাথে কথাই বলতে পারি না। নেহাৎ আপনারা সুযোগ করে দিলেন বলেই আপনাদের সাথে কথা বলতে পারছি। আর টাকার কথা বললেন? টাকার প্রয়োজন তো আমার শেষ হয়ে গেছে, কাকাবাবু। টাকা দিয়ে আমি কী করব?'

লোকটার কথার মধ্যে এতটাই আন্তরিকতা ছিল যে আমরা দুজনেই গলে পড়লাম। একটা কাপড় পেতে দিয়ে বললাম, 'কাকা বসুন, কিছু গল্প করি।' লাই পেয়ে লোকটি টুপ করে বসে পড়ল।

নবারুণ বলল, 'কাকার বাড়ি কই? আর নামই বা কী?'

'আমার বাড়ি কাকাবাবু ওই শিবপুর গ্রামে। আমার নাম নারায়ণ যোগী। শিবপুরের হারান আর পরাণের বাপ আমি। আর এখন তো কাকাবাবু আমার বাসা শ্মশানই হয়ে গেছে। দিন-রাত শুধু শ্মশান পাহারা দিই।'

'কিন্তু এত রাতে এখানে কী করছেন?'

'ওই যে বললাম, কাকাবাবু, শ্মশান পাহারা দিই!'

'আচ্ছা, শ্মশানে লাশ-টাশ চুরি হয় নাকি?'

'হ্যাঁ, হয় বৈকি। ওই তো সেদিন আপনাদের গ্রামেরই দুলাল মুচির বউকে যেখানে পুঁতে রেখেছে সেখানে মাটি খুঁড়ে ওর লাশ তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি এসে পড়াতে আর পারেনি। আরও একটা ব্যাপার হয়তো জানেন না, কাকাবাবু। আপনারা শুনেছেন দুলাল মুচির বউ বিষ খেয়ে মরেছে। কিন্তু ও বিষ খেয়ে মরেনি। দুলাল মুচিই ওকে মেরে মুখে বিষ দিয়ে রেখেছিল।'

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?'

'জানতে হয়, বাবু। শ্মশানে থাকলে আরও অনেক কিছুই জানতে হয়।'

'আরও অনেক কিছু মানে?'

'আরও অনেক কিছু মানে জগতের অনেক খবরই আমার কাছে থাকে। এই যেমন, গতবার ইলেকশানে আপনার বাবা কিন্তু সত্যি সত্যিই হারেনি। ভোটে অনেক কারচুপি হয়েছে। আপনাদের বন্ধু পিন্টু আপনাদের মারার জন্য লোক ঠিক করছে। তা ছাড়া সামনে পরীক্ষায় আপনারা দুজনই ফেল করবেন। তাই দুজনেই ভাল করে পড়া শুরু করেন।'

ভিডিও করতে করতে এবার আমার মেজাজটা বিগড়ে গেল। বললাম, 'আপনি সবজান্তা নাকি?'

'কাকাবাবু, দয়া করে চটবেন না। আমি যা সত্যি তাই বলেছি। এগুলো জানা থাকলে আপনাদেরই ভাল হবে। আচ্ছা, আমি এখন চলি, কাকাবাবু। আর যে-কোনও সময় যে-কোনও বিপদে বা প্রয়োজনে এই শ্মশানে রাতে এসে আমাকে শুধু কাকা বলে ডাকলেই আমি চলে আসব। আর যে-কোনও সাহায্য করতে পারব,' বলেই লোকটা চট করে উঠে আমাদের কোনও কথার অপেক্ষা না করেই হনহন করে হেঁটে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অদ্ভুত লোকটা চলে যেতেই আমরা সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে বাড়িতে চলে আসলাম। পরদিন সকালে উঠে নাস্তা করে আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে বসলাম। কিন্তু একি, কাল রাতে যে আগুনের গোলা পড়ে খেজুর গাছটা পটপট শব্দে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তার তো কোনও চিহ্নই নেই। ভিডিওতে খেজুরের গাছটা দিব্যি জ্যান্ত রয়েছে। তাড়াতাড়ি ভিডিওটা ফরোয়ার্ডে টেনে যেখানে প্রবীণ লোকটার সাথে গল্প হয়েছিল সেখানে নিয়ে গেলাম। দেখলাম একই অবস্থা। বুড়োর কোনও নামগন্ধই নেই। নবারুণ শুধু একাই হাত নেড়ে নেড়ে বকে চলেছে।

দুজনেই তাড়াতাড়ি সাইকেল নিয়ে ওই খেজুর গাছের কাছে গেলাম। দেখলাম খেজুর গাছটা তখনও জ্যান্ত অবস্থায় বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর শিবপুর গ্রামে খোঁজ নিয়ে দেখি, হারান ও পরাণের বাপ নারায়ণ যোগী সপ্তাখানেক আগে ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা গেছে। আর তাকে পোড়ানো হয়েছে ওই শ্মশানেই।

সি কে নাজমুল

পঞ্চম ধাপ

১৯০০ সালের এক সকালে গাই ভ্যান্স নামের এক ফ্রী-ল্যান্স সাংবাদিক কেনসিংটনের পেল অ্যাণ্ড কোম্পানি নামের এক এস্টেট এজেন্টের অফিসে এলেন। লণ্ডনের সাউথ ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে অল্প ভাড়ায় ছোট বাড়ি খুঁজছেন তিনি।

'রিকেট রোডে আপনার চাহিদামত একটা বাড়ি আছে,' গাই ভ্যান্সের প্রশ্নের জবাবে বললেন মিস্টার পেল। 'দোতলা। ভাড়াও খুব অল্প, বছরে মাত্র পঞ্চাশ পাউণ্ড, স্যর।'

সস্তায় খুঁজলেও এতটা আশা করেননি গাই ভ্যান্স, তাই খুশিই হলেন। কিছুটা সন্দিহানও। 'কিন্তু ভাড়া এত কম কেন? কোন সমস্যা আছে–ড্রেনেজ, পানি সাপ্লাই বা আর কোন?'

মাথা নাড়ালেন পেল। 'না, স্যর, কোন সমস্যা নেই। আগের ভাড়াটে তো অনেকদিনই ছিলেন, তেমন কিছু থাকলে নিশ্চয়ই অভিযোগ করতেন।'

'বাড়িটা একবার দেখতে পারি?' ভ্যান্স বললেন।

'অবশ্যই! যখন ইচ্ছে দেখতে পারেন।'

তখনই কোম্পানির এক কর্মচারীর সাথে বেরিয়ে পড়লেন তিনি ১৩ নম্বর রিকেট রোড, কেনসিংটনের উদ্দেশে। বাড়ি পছন্দ হলো, একসাথে তিন বছরের জন্যে ভাড়া নিয়ে নিলেন ওইদিনই। চুক্তি থাকল, পরে আরও তিন বছরের জন্যে মেয়াদ বাড়াতে পারবেন তিনি ইচ্ছে করলে।

হাউসকীপার হিসেবে পেল অ্যাণ্ড কোম্পানির মাধ্যমেই মিসেস ক্যাম্প নামে এক মাঝবয়সী মহিলাকে নিয়োগ করলেন ভ্যান্স। গৃহস্থালীর আর সব কাজে এমা লারকিন নামে একটু অল্পবয়সী আরেকজনকেও। দিনরাত ও বাড়িতেই থাকে তারা। বছর বিশেক বয়সের আরও এক যুবতীকে নিয়োগ করা হলো টুকিটাকি কাজের জন্যে–সকাল সন্ধ্যা। এ ছাড়া একটা বুল টেরিয়ার পপ এবং বেড়াল ইভ, এই নিয়ে সংসার অবিবাহিত গাই ভ্যান্সের।

নতুন বাড়িতে কয়েক সপ্তাহ নির্বিঘ্নে কেটে গেল তাঁর, এরপরই ঘটতে শুরু করল অস্বাভাবিক সব ঘটনা। একদিন সন্ধের পর সিটিংরুমে বসে লিখছেন ভ্যান্স, হঠাৎ চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলল পপ। বিরক্ত হয়ে চোখ তুললেন তিনি, দেখলেন দরজার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় হাঁক ছাড়ছে ওটা। গায়ের সমস্ত পশম খাড়া। হঠাৎ তেড়ে গেল ওটা দরজার দিকে।

উঠে পড়লেন বিস্মিত ভ্যান্স, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। চোখে পড়ল ওপরে যাওয়ার সিঁড়ির নীচের কাবার্ড থেকে কালো পোশাক পরা অদ্ভুত এক মহিলা বেরিয়ে এসেছে, কিচেনের দিকে যাচ্ছে। কোনদিকে খেয়াল নেই।

তার মুখের একটা পাশ দেখতে পেয়েছেন ভ্যান্স, তাতেই হতভম্ব হয়ে

পড়লেন—একেবারে কাগজের মত সাদা সে মুখ।

মহিলা কে হতে পারে ভাবতে ভাবতে কিচেনের দিকে এগোলেন তিনি। এমা লারকিনের সেদিন সাপ্তাহিক ছুটি বলে মিসেস ক্যাম্প একা আছে সেখানে। মনিবের প্রশ্নে অবাক হলো সে। 'মহিলা! কোন মহিলা!'

'এই যে, এইমাত্র কিচেনে ঢুকল?' ভ্যান্স বললেন।

এদিক-সেদিক তাকাল মিসেস ক্যাম্প। 'কই, কেউ তো আসেনি এখানে!'

'সে কী! আমি নিজের চোখে দেখলাম সিঁড়ির নীচ থেকে বেরিয়ে এদিকেই এল সে।'

'আপনি নিশ্চয়ই ভুল দেখেছেন, মিস্টার ভ্যান্স,' মহিলা বলল। 'কেউ আসেনি কিচেনে।'

'অসম্ভব!' বললাম তো আমি দেখেছি তাকে। কালো ড্রেস পরা, মুখটা একদম সাদা। সিঁড়ির নীচের কাবার্ড থেকে বেরিয়েছে মহিলা। পপের অস্বাভাবিক আচরণের কথাও বললেন তিনি। শুনে মিসেস ক্যাম্প চিন্তায় পড়ে গেল। তখনও কারও ধারণাই ছিল না যে ঘটনা সবে ঘটতে শুরু করেছে।

পরদিনের কথা, মিসেস ক্যাম্প ওপরতলায় যাওয়ার জন্যে সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উঠেছে, হঠাৎ কেন যেন দাঁড়িয়ে পড়ল পঞ্চম ধাপে। ওটার নীচেই সেই কাবার্ড। গা ছমছম করে উঠল মহিলার, কিছু দেখেনি, তবু মনে হলো ভয়ঙ্কর একটা কিছু রয়েছে নীচে।

এমনিতেই শক্ত মনের, বাস্তববাদী সে, তা ছাড়া ভৌতিক ব্যাপার স্যাপারে একেবারেই বিশ্বাস নেই, তাই পরিস্থিতি কোনমতে সামলে নিল। তারপরও ওপরে ওঠার মত শক্তি অর্জন করতে বেশ বেগ পেতে হলো তাকে। এ নিয়ে কাউকে কিছু বলল না মহিলা, বরং নিজেকে জোর করে বিশ্বাস করাতে চাইল ব্যাপারটা তার কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

যদিও পপ ও ইভের আচরণ তাকে স্বস্তিতে থাকতে দিল না। একবার ওপরে উঠলে আর নামতে চায় না, নীচে নামলে আর উঠতে চায় না, দুটোই। এবং একা কখনও সিঁড়ি অতিক্রম করে না, হয় কর্তা নয়তো তাদের কারও না কারও সাথে ওঠে-নামে। সবচেয়ে বড় কথা, সিঁড়ির পঞ্চম ধাপে ভুলেও পা রাখে না, লাফ দিয়ে পেরিয়ে যায়।

এ ঘটনার ক'দিন পর এক সকালে হঠাৎ চিৎকার করতে করতে কিচেনে এসে ঢুকল এমা লারকিন, হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত আচরণ করতে লাগল। অনেক কষ্টে তাকে স্বাভাবিক করে তুলল মিসেস ক্যাম্প, জানতে চাইল কী হয়েছে।

এমা বলল, 'মিস্টার ভ্যান্সের বিছানা গোছগাছ করতে ওপরে যাচ্ছিল সে, সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় থাকতে হঠাৎ কী যেন একটা সাঁ করে তার কান ঘেঁষে নীচের দিকে ছুটে গেছে। কিছু দেখতে পায়নি, তবে জিনিসটার আছড়ে পড়ার ধুপ! শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে সে। ওটা যে ভয়ঙ্কর কিছু, তাতে কোন সন্দেহ নেই এমার।

ওসব তার মনের ভুল, কল্পনা ইত্যাদি প্রবোধ দিয়ে মেয়েটাকে শান্ত করল

মহিলা, কিন্তু এমার ওই এক কথা। শেষ পর্যন্ত সোজা জানিয়ে দিল, আর এক মুহূর্তও ও বাড়িতে থাকতে রাজি নয় সে। এরপর সত্যিই চলে গেল মেয়েটা।

সেদিনই রাত ন'টার দিকে, সিটিংরুমে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে বই পড়ছিলেন গাই ভ্যান্স। তিনি ছাড়া কেউ নেই বাড়িতে। মিসেস ক্যাম্প কাছেই এক আত্মীয়ের বাড়ি গেছে, ফিরতে আরও দেরি হবে। নিস্তব্ধ বাড়ি। দেয়াল ঘড়ির টিক্ টিক্, ফায়ারপ্লেসে কাঠ পোড়ার চড়চড় ও বাইরে বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

মাঝে মাঝে বাতাসের ধাক্কায় জানালার কাঁচে এসে আছড়ে পড়ছে বড় বড় ফোঁটা। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে রাত। আচমকা হাড় জমানো ভয়াবহ, তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি, হতভম্ব হয়ে গেলেন ভ্যান্স। এমনভাবে চমকে উঠেছেন যে আরেকটু হলে বইটা পড়েই যাচ্ছিল হাত থেকে। ওদিকে পপ ও ইভও আড়ষ্ট হয়ে আছে।

একটু পর সাহস সঞ্চয় করে উঠলেন ভদ্রলোক। দরজা খুলে উঁকি দিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। কোথাও কিছু নেই। সব স্বাভাবিক। দরজা লাগিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসলেন। তার একটু পর ফিরে এল মিসেস ক্যাম্প, এবার পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে কাজে মন দিলেন তিনি। এরমধ্যে তাঁর বোঝা হয়ে গেছে এ বাড়ি অভিশপ্ত। বিশেষ করে সিঁড়ি। এতদিন যে সমস্ত ভৌতিক ঘটনা ঘটেছে, তার সব ডাইরিতে টুকে রেখেছেন ভ্যান্স। ওসবের সাথে সেদিনের চিৎকারটাও যোগ করলেন।

পরদিন এমা লারকিনের জায়গায় মেরি প্রিং নামে আরেক মেয়ে এল। পরের সপ্তাহখানেক ভালই কাটল, তারপর আবার ঘটতে শুরু করল ঘটনা। ঠিকা কাজের মেয়ে জেন বোল্ট মিসেস ক্যাম্পকে একদিন জানাল সিঁড়িতে কোন গণ্ডগোল আছে।

'সে কী রকম?'

'সিঁড়ির একটা রড বেরিয়ে আছে দেখে ঠিক করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু যতবারই ওটা জায়গামত ঢোকাবার চেষ্টা করি, ততবারই আমার আঙুল অসাড় হয়ে আসে।'

ব্যাপার যাচাই করতে এল মিসেস ক্যাম্প, দেখল কথাটা সত্যি। সিঁড়ির কাঠের ধাপ জায়গামত ধরে রাখার জন্যে গোঁজ হিসেব যে রডগুলো রয়েছে, তার একটার মাথা অনেকটা বেরিয়ে আছে। এবং সেটা পঞ্চম ধাপের। সে-ও চেষ্টা করল রডটা জায়গামত বসাতে, কিন্তু কাজ হলো না। যতবার রডটা ধরে, ততবারই আঙুল অসাড় হয়ে আসে।

এই সময় বাইরে দুই নারীকণ্ঠ শুনে সিটিংরুম থেকে মুখ বাড়ালেন ভ্যান্স, অমনি আঙুলের শক্তি ফিরে পেল মিসেস ক্যাম্প, রডটা দ্রুত সকেটে ভরে দিল। এর ক'দিন পর মেরি প্রিং প্রশ্ন করল, কালো পোশাকের অদ্ভুত মহিলাটি কে।

'কোন অদ্ভুত মহিলা?' পাল্টা প্রশ্ন করল মিসেস ক্যাম্প। 'কোথায় দেখলে তাকে?'

'সিঁড়িতে। বেশ লম্বা, মুখটা একদম সাদা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল।'

মহিলা বুঝল গাই•ভ্যান্স তা হলে একেই দেখেছেন সেদিন। অর্থাৎ ব্যাপারটা মিথ্যে নয়! এবার একটু ভয় পেল সে, কিন্তু মেয়েটার সামনে মনের ভাব চেপে রাখল। নইলে এ-ও হয়তো এখনই ভেগে যাবে। ভয়ে ভয়ে দিন পার করতে লাগল সে, মনের জোর আগের চেয়ে কমে গেছে অনেক।

দু'সপ্তাহ পর, সন্ধের পর সিটিংরুমে মেরি ও মিসেস ক্যাম্পের সাথে কথা বলছেন গাই ভ্যান্স, দরজা পুরো মেলা। খানিকপর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠল, মনে হলো কেউ নেমে আসছে। বাড়িতে তারা ছাড়া আর কেউ নেই, কাজেই এ হতে পারে না ভেবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল সবাই। তারপর একযোগে বাইরে তাকাল।

ভ্যান্স ও মেরির দেখা সেই মহিলা-দীর্ঘদেহী, কালো পোশাক পরা। নেমে আসছে এক পা এক পা করে। এক হাতে মুঠো করে ধরা একগোছা ধূসর, লম্বা চুলের গোড়ায় ঝুলছে একটা ছিন্ন মাথা। দেখে মনে হয় এইমাত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, কানে সোনার ড্রপ ইয়ারিং। বীভৎস এক দৃশ্য! গা ঘুলিয়ে উঠল সবার। ভয়ে পলক ফেলতেও ভুলে গেছে।

নেমে এসে সিঁড়ির নীচের কাবার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওটা, ধীরে ধীরে ঘুরে তাকাল, তারপর মুহূর্তের মধ্যে কাবার্ডের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। দৃশ্যটা এতই ভয়ঙ্কর, এতই অকল্পনীয় যে তার ধাক্কা কাটিয়ে সহজ হতে তিনজনেরই প্রচুর সময় লাগল।

মেয়ে দু'জন তো বটেই, গাই ভ্যান্সও পরদিনই পালালেন ও বাড়ি ছেড়ে। এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন তিনি, জানতে পারলেন প্রায় ষাট বছর আগে একটা খুন হয় ও বাড়িতে–মিস ডালিয়া ব্রাউন নামের বয়স্ক মনিবানীকে খুন করেছিল তার হাউসকীপার, কেট মারফি।

পুলিস তার দেহ উদ্ধার করেছিল, কিন্তু মাথাটা পায়নি বহু খোঁজাখুঁজি করেও।

গাই ভ্যান্সের মুখে সে রাতের ঘটনা শুনে আবার এল পুলিশ, কাবার্ড সরিয়ে বাড়ির মেঝে খুঁজে বের করল ওটা। লম্বা, ধূসর চুল লেপটে আছে খুলির সাথে।

ডাক্তার পরীক্ষা করে রায় দিলেন ওটাই মিস ডালিয়ার মাথা।

মূল : এলিয়ট ও'ডোনেল
রূপান্তর : ফারহান সিদ্দিক

বড়মামা

হঠাৎ বড়মামার আগমনে আমাদের মফস্বলের সীমাবদ্ধ জীবনের নিস্তরঙ্গ পুকুরে যেন তরঙ্গের ছোঁয়া লাগে। বিশেষ করে আনন্দটা যেন আমারই জন্য। কারণ আমার কলেজ ফাইনাল শেষ। বড়মামা আসা মানেই আমাকে কয়েকদিনের জন্য হলেও নানাবাড়িতে নিয়ে যাওয়া। আর নানাবাড়ি মানেই ঘন সবুজ ঘেরা মায়াময় বিস্তৃতিতে মাতামাতি করে সময় কাটানো। যাদের গ্রামে নানাবাড়ি বা দাদাবাড়ি আছে, তারা সবাই জানে এর মজাটা কী। গ্রামের বাড়ির ঘ্রাণই আলাদা। একদিন মাত্র আমাদের বাসায় অবস্থানের পরই এবার বড়মামা আম্মার কাছে প্রস্তাব দিলেন আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবার। আম্মা জোরাজুরি করলেন আরও দুটো দিন থেকে যেতে। কিন্তু বড়মামা পরদিনই চলে যাবেন। বাড়িতে নাকি বিশেষ কাজ ফেলে এসেছেন। মহানন্দে আমি কাপড় গুছিয়ে নিলাম ব্যাগে। সাথে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। আম্মা একটা পাঞ্জ সুরার বই দিয়ে দিলেন সাথে। বললেন, প্রতিদিন ইয়াসীন সুরা পাঠ করি যেন নিয়মিত।

যথাসময়ে মামার সাথে রওনা দিলাম। ট্রেনের চমৎকার জার্নি শেষ করে নামলাম এসে গফরগাঁও স্টেশনে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে ততক্ষণে। বড়মামা সারারাস্তা কিছুই খাননি। তাঁকে ফ্যাকাসে লাগছিল।

বড়মামা রিকশা ডাকেন। পায়ের কাছে ব্যাগ রেখে রিকশায় চেপে বসলাম দু'জন। ঘণ্টাখানেকের এবড়োখেবড়ো রিকশা পথ। রিকশা একবার ডানে কাত হয় তো পরমুহূর্তেই বামে হেলে পড়ে। এই সব রাস্তা ঠিক করার কর্তৃপক্ষ থেকেও নেই।

হঠাৎই পাকা রাস্তা শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় চিকন মাটির রাস্তা। রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে আমরা হাঁটতে থাকি। চাঁদ তার জ্যোৎস্নার ফিন্‌ফিনে চাদর দিয়ে পৃথিবীকে জড়িয়ে রেখেছে।

চারদিকে আর কোন মানুষজন নেই। শুধু আমি ও বড়মামা এগিয়ে চলি। টুকটাক কথাবার্তা হয় আমাদের মধ্যে। কিছুক্ষণের ভিতরেই বিশাল বালুচরে এসে পড়ি। ধু-ধু এই চর পাড়ি দিলেই নদী। নদী পার হয়ে গ্রামের হাঁটাপথে আধঘণ্টা গেলে নানাবাড়ি। বালুতে জুতোসহ পা আটকে যাচ্ছিল আমার। কিছু বালু জুতোর ভিতর ঢুকে কচ্‌ কচ্‌ করতে থাকে।

আমি হঠাৎ লক্ষ করলাম, বালুতে হাঁটতে বড়মামার কোন সমস্যাই হচ্ছে না। তাঁর পা বালুতে ডেবে যাওয়া তো দূরের কথা, তিনি দিব্যি মসৃণ পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে বালুতে তার পা ঠেকছেই না। কথাবার্তা বলাও অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। আমার কথার জবাবে শুধু হুঁ-হ্যাঁ করছেন। দেখতে দেখতে নদীর খাড়া পাড়ে এসে দাঁড়াই আমরা। শীর্ণ নদী। দু'পাশেই পাহাড়ের মত খাড়া

পাড়। চাঁদের আলোয় নদীর উঁচু পাড়সহ পুরো দৃশ্যটাকে চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবির মতই দেখাতে থাকে।

বড়মামা আমার হাত ধরেন এবং আমরা প্রায় গড়িয়েই নদীর পাড় ধরে নামতে থাকি। নিঃসঙ্গ নভোচারীর মত লাগতে থাকে আমার নিজেকে। বড়মামাকে আর এখন বড়মামার মত লাগছে না। অচেনা আর অন্যরকম ঠেকছে। তবু ভয়ে ভয়ে নদীর কাছে এসে দাঁড়ালাম। গুদারা ঘাট। মানে নদী পারাপারের ঘাট। আর এই ঘাটে নঈমুদ্দীর গুদারা, মানে পারাপারের নৌকা বিখ্যাত। নঈমুদ্দীকে সেই পিচ্চিবেলা, অর্থাৎ আমার নিজের পিচ্চিকাল থেকেই এক রকম দেখে আসছি। বুড়ো মানুষ। তবে গত বছর দেখেছিলাম আরও বুড়ো হয়ে গেছে। মোটকথা হাড়জিরজিরে শরীর নিয়ে এখনও বেঁচে আছে, প্রাগৈতিহাসিক চরিত্রের মত। এবার নিশ্চয়ই আরও বুড়ো হয়েছে বেচারা বয়সের ভারে, অভাবে অনটনে নিশ্চয়ই ফসিলের আকার নিয়েছে। আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খেয়াল করলাম, নৌকাতে মাঝি নেই। তবু বড়মামা তাতেই উঠে বসলেন। আমাকেও হাত ধরে উঠালেন। নিজে নিজেই নৌকা চলতে থাকে। কোথা থেকে দমকা বাতাস এসে নৌকাকে মাঝ নদীতে নিয়ে ফেলে। আমার বুকের গভীরের আতঙ্ক যেন বড়মামার চোখ দুটো পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে। বড়মামা হেঁড়ে গলায় বলেন, কিরে, ভয় পাচ্ছিস কেন? নঈমুদ্দী তো গতমাসে মারা গেছে। এত অভাবের সংসারে, এতদিন যে বেঁচেছিল, এই তো ঢের। বড়মামা হাসেন। তার মুখের ভিতরে ঘন অন্ধকার! আমি আড়ষ্ট হয়ে যাই পুরোপুরি। বড়মামা তখন প্রচণ্ড বেগে নৌকা দোলাতে থাকেন। বলেন, আয়, তোরে চুবিয়ে মারি। বহুদিন কাউরে চুবাই না। এতদিনে মক্কেল পাইছি। বে-আক্কেল ভাগ্নে কোথাকার। পুরোপুরি জ্ঞান হারাবার আগে আম্মার দেয়া সুরার বই-এর কথা মনে পড়ে। মনে মনে দোয়া পড়ার চেষ্টা করতে থাকি। চাঁদের আলোয় দেখি আর একটি নৌকাতে আমার আসল বড়মামা, সাথে মামাতো ভাই অশ্রু। আমাদের ভৌতিক নৌকার একেবারে কাছাকাছি এসে আমাকে চিনতে পেরে অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে এগিয়ে আসে। নকল বড়মামাকে দেখলাম, আস্তে আস্তে ধোঁয়ার মত মিশে যাচ্ছে বাতাসে। তারপর নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারালাম।

রেশমা রেজিনা ঊর্মি

বিষধর

বিশাল সুন্দর একটি বাগা[illegible]ড়ি। ফল, ফুলের গাছ শোভিত চমৎকার বাড়িটি যে দেখবে, সেই মুগ্ধ হবে। বাড়ির মালিক সেলিম আহমেদ। শহরে থাকে, বছরে একবার স্ত্রী কেয়া, দশ বছরের একমাত্র ছেলে জসিম এবং বন্ধু-বান্ধব সহ আসে এখানে বিনোদনের জন্য, আনন্দ ফুর্তিতে কয়েকদিন কাটিয়ে চলে যায়। বাড়িটি দেখাশোনার জন্য কেয়ারকেটার আলম, মালী এসব লোকজন আছে।

বাগানটি বেশ বড়, কত রকমের ফলের গাছ আছে, কয়েকটা গাছ বেশ প্রাচীন। এরই একটার নীচে গভীর গর্তে বাস করে দুটি বাস্তু সাপ। বহু বছর ধরেই আছে ওরা। আলমরা জানে। দেখেওছে কয়েকবার কিন্তু যেহেতু ওগুলো কখনও কারও ক্ষতি করেনি–দূর থেকেই সরে গেছে, সেজন্য তারাও আর মাথা ঘামায়নি, তা ছাড়া বাস্তু সাপ মারা ভাল নয়। শুধু শুধু ওদেরকে না ঘাঁটিয়ে ওদের মত থাকতে দেওয়াই মঙ্গল।

প্রতিবারের মত সেলিমরা আসছে বেড়াতে, খবর পাঠিয়েছে–দশ-পনেরোজনের বিরাট দল। আত্মীয় স্বজন, বাচ্চা কাচ্চা তো আছেই, বন্ধু বান্ধবরাও সপরিবারে থাকবে। বাগান বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বাড়ির ঘর দুয়ার, বাগান, পুকুর সব সময় ঝকঝকে পরিষ্কারই থাকে, তবু আলম বাড়তি লোক লাগিয়ে সব জায়গা আরও ফিটফাট করতে শুরু করল। দিন রাত লোকদের ওপর হম্বি-তম্বি–বাগানে একটা আগাছাও যেন না থাকে, পর্দাগুলো পরিষ্কার করে ধোয়া হয়নি, পুকুরে কচুরিপানা ভাসছে কেন–ইত্যাদি শোরগোলে বাড়ি সরগরম। সম্প্রতি সাপিনীর ডিম ফুটে অনেকগুলো বাচ্চা বেরিয়েছে। ছোট, এতটুকু টুকু তেল চকচকে কালো কালো বাচ্চা, কখনও মায়ের গায়ের ওপর কিলবিল করে খেলে, কখনও সবগুলো এক সাথে তালগোল পাকিয়ে মার কুণ্ডলী পাকানো শরীরের মাঝে নিরাপদে, নির্ভয়ে ঘুমিয়ে থাকে। কিছুদিন হলো লোকজনের আনাগোনায় বাচ্চাগুলো নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছে না। বাগান পরিষ্কার করার সময় লোকজনের দাপাদাপিতে মাটি কাঁপতে থাকে, বাচ্চাগুলো বার বার জেগে যায়। মা সাপিনী মহা বিরক্ত, কী জ্বালাতন, বাছারা আমার ক'দিন ধরে একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারছে না, এত হৈ চৈ কীসের, হচ্ছেটা কী? পুরুষ সাপটা তার বিশাল চকচকে মোটা শরীরটা গুটিয়ে, চওড়া ফণাটা সামনে বাড়িয়ে বাচ্চাদের একটু আদর করে বলে–'ক'দিন এরকমই হবে, বাড়ির মালিক মেহমান নিয়ে বেড়াতে আসছে, সব জায়গা পরিষ্কার করা হচ্ছে।'

সাপিনী আরও বিরক্তির সুরে হিসহিস করে ওঠে–'বেশ, তবেই তো হয়েছে, নিরিবিলি শান্তিতে আর থাকা হচ্ছে না, তা তুমি জানলে কীভাবে?'

ফণাটা নিজের প্রকাণ্ড শরীরের ওপর নামিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করতে করতে

পুরুষ সাপ জবাব দেয়। 'তুমি তো আর বাইরে যাও না, খবর জানবে কী করে, কবে থেকে দেখছি, লোকজনের আনাগোনা, এসময়ই তো তারা বেড়াতে আসে, বুঝলাম তারই প্রস্তুতি চলছে।'

বাচ্চাদের জন্য মা সাপ বাইরে যায় না, ওরা একটু বড় না হলে সে বের হতে পারবে না–সারাক্ষণই বাচ্চাদের বুক দিয়ে আগলে রাখে, পুরুষ সাপ খাবার জোগাড় করে আনে। স্বামীর কথা শুনে সভয়ে সাপিনী বলে, 'তুমি সাবধানে থেকো, তোমাকে দেখতে পায়নি তো?'–

'আরে না, আমাকে অত অসাবধান ভেবো না, আর দেখলেই বা কী, মানুষগুলো তো জানেই আমাদের কথা, ওরা কখনোই আঘাত করার কথা ভাবেনি, আমরাও নিজেদের মত সরে থাকি, সেটা তুমি জান।'

গজগজ করতে থাকে সাপিনী । 'হ্যাঁ, আমাদের ঘাঁটালে ভাল হবে না, বিশেষ করে বাচ্চাদের যদি কোন ক্ষতি করার মতলব থাকে, সবগুলোকে শেষ করে ফেলব।'

ফোঁস করে উঠল পুরুষ সাপ–'খবরদার, ও কথা মনেও এনো না। আজ বহু বছর আমরা পাশাপাশি যে যার মত আছি, নিজেদের ভিটাই মনে করি এ জায়গাকে। মানুষ আমাদের হিংস্র শত্রু মনে করতে পারে, কিন্তু আমি তা ভাবি না, আমরা শান্তিপ্রিয়, সেধে কেন যাব মানুষের সাথে শত্রুতা করতে–ওরা ওদের মত থাকুক, আমরা আমাদের মত। আর হ্যাঁ, বাচ্চাদের সামলে রেখো, বাইরে যেন না যায়, এই গর্তের মধ্যে আমরা নিরাপদ–সাবধান, যা বললাম, মনে রেখো।' ঘুমিয়ে পড়ল পুরুষ সাপ কিন্তু সাপিনী আরও কিছুক্ষণ রাগের চোটে ফোঁস ফোঁস করে কিলবিলে বাচ্চাগুলোকে সযত্নে গুছিয়ে নিয়ে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

কয়েকদিন পর সেলিমরা সদলে এসে পড়ল। নিস্তব্ধ বাগানবাড়ির নির্জনতা কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। ছোটরা এই হুড়মুড় করে ছাদে উঠে যাচ্ছে, পরক্ষণে বাগানের ফলের গাছ তছনছ। হাসি হুল্লোড়ে বাড়ি জমজমাট। বড়রাও কম যায় না, ছোটদের পুকুরে নামা নিষেধ, কিন্তু বড়রা সমানে যতক্ষণ খুশি সাঁতরে এপার ওপার করছে, নইলে মাছ ধরতে বসে যাচ্ছে। বাগানে ইঁটের চুলায় বনভোজন হলো। চাঁদনী রাতে খোলা আকাশের নীচে, ঘাসের ওপর চাদর পেতে গরম চা কফি সহ তুমুল আড্ডা। মোটকথা, মানুষদের আনন্দ খুশির দৌরাত্ম্যে সাপ পরিবারটির শান্তি উধাও।

সাপের বাচ্চাগুলো এখন অনেকটাই বড় হয়েছে–ছেলের সংখ্যা বেশি, মেয়ে কম। বাপের মতই আকার আকৃতি হবে ছেলেদের, এখনি বোঝা যায়। ঘুমের এখন খুব একটা ব্যাঘাত হয় না ছেলেপুলেদের। তবু সাপিনীর তর্জন গর্জনের শেষ নেই, স্বামীর মত সবকিছুকে অত সহজ ভাবে মেনে নেওয়ার সাপ সে নয়–মানুষকে শত্রু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে চায় না, অবশ্য তার চিন্তা ও ভয়ের কারণ কিছু আছে–যতদিন বাচ্চারা ছোট ছিল, সবগুলোকে গুটিয়ে এক করে বুকের মধ্যে নিয়ে রাখত, এখন ওরা বড় হওয়াতে কিছুতেই আর এক জায়গায়

থাকতে চায় না, কেবলই কিলবিলিয়ে গর্তের মুখের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চায় বাইরের জগৎটাকে, এত চেঁচামেচি, দৌড়াদৌড়িই বা কারা করে, সেটা জানার জন্য ছটফট করতে থাকে।

সবচেয়ে কৌতূহল ছোট ছেলেটার–অন্যগুলোও কম দুরন্ত, দুষ্ট নয়, কিন্তু এটা একেবারে দুর্দান্ত। মাকে তো পাত্তাই দেয় না। বাপকেই যা ভয় পায়–বাবা বাসায় থাকলে ভদ্র, সভ্য হয়ে থাকে। যেই সে বেরিয়ে যায়, ব্যস শুরু হয়ে যায় তার দস্যিপনা। ভাই-বোনগুলোর সাথে মারামারি করতে করতে সবগুলো একেবারে গুঁটলি পাকিয়ে যায়। মায়ের ফোঁসফোঁসানি, লেজের ঝাপটা কিছুই পরোয়া করে না। অনেক কষ্টে সবগুলোকে ছাড়িয়ে শাসায় সাপিনী, 'আজ আসুক তোদের বাপ, দেখবি মজা–' তখন বাছাধনেরা শান্ত হয়। সেদিন, ছোট বাচ্চাটা মায়ের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে গর্তের বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখছিল, এমন সময় ঠিক সেই জায়গাতেই ছোট্ট, গোলগাল ননী ননী শরীরের একটি বাচ্চা মেয়ে এসে দাঁড়াল, ছোটটার ফণা থেকে কয়েক ইঞ্চি মাত্র দূরে। মেয়েটির টুকটুকে রসালো পায়ের গোছ দেখে জিভে পানি এসে গেল ছোটর–সাপের বাচ্চার আর স্বভাব যাবে কোথায়, ছোবল দেবার জন্য মাত্র উদ্যত হয়েছে, এই সময়ে সাপিনী দেখতে পেয়ে বিদ্যুৎবেগে বাচ্চাকে সরিয়ে আনল।

স্বামীকে জানাতে বাধ্য হলো সাপিনী, শুনে ভীষণ রেগে গেল সে, স্ত্রীকেই ধমক দিল আচ্ছা রকম। 'বুঝতে পেরেছি, মরণ ঘনিয়েছে তোমাদের, একজন মানুষ মেরে দেখো, সবগুলো হামলে পড়ে আমাদের নির্বংশ করে ছাড়বে। মানা করেছিলাম না, যে ওদের ঘাঁটাতে যেও না? বাচ্চাদের সামলে রাখো না কেন? আমার কথা না শুনলে পরে পস্তাতে হবে। এই বলে রাখছি।'

সাপিনীও ফুঁসে উঠল, 'আমাকে বলছ কেন? বাচ্চারা বড় হয়েছে, শোনে আমার কথা? বাইরে না যেয়ে তুমিই পাহারা দাও ওদের, আর শোনো, আমাদের মারা এত সহজ নয়, বাস্তু সাপ আমরা, আমাদের লেজে পা দিলে এমন অভিশাপ দেব যে মানুষগুলোই ঝাড়ে বংশে শেষ হবে।'

ফোঁস করে জবাব দিল সাপ–'আরে অভিশাপ দেবে তো পরে, আগে যে আমরাই বাচ্চাকাচ্চা সহ মারা পড়ব।' স্ত্রীকে ধমক মেরে ছেলেমেয়েদেরও শাসাল, 'খবরদার, এই শেষবারের মত তোদের সাবধান করছি। বাসা থেকে একদম বের হবি না, ফের যদি শুনি মার কথা না শুনে বাঁদরামি করেছিস, এক একটাকে ধরে আছাড় মেরে আমিই শেষ করব।'

রাগারাগি করে সাপটা বের হয়ে যায়, মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে–সে নিজেই কত সাবধানে চলাফেরা করে, যেদিকে মানুষগুলো থাকে তার ত্রিসীমানায় সে যায় না। স্ত্রী, বাচ্চাদের জন্য দুশ্চিন্তায় শান্তি উধাও হয়েছে তার।

এত সতর্কতা, এত বোঝানো সত্ত্বেও একদিন অঘটন ঘটে গেল। জসিম ও অন্যান্য ছেলেমেয়েরা বাগানে খেলছিল। ছোট বাচ্চা সাপটা বাপ-মার নিষেধ ভুলে গর্তের বাইরে এসে এক মনে ওদের হৈ চৈ দেখছিল, লম্বায় সে বেশ বড় হয়েছে। ফণা তুলে দুলতে দুলতে বাচ্চাদের বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে যাচ্ছে।

জসিমই আগে দেখতে পেল সাপের বাচ্চাকে, দেখামাত্রই লাফিয়ে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলল সে–'সাপ, সাপ, কে কোথায় আছ, জলদি এসো।' অন্য বাচ্চারাও চিৎকার জুড়ে দিল।

বড়রা দৌড়ে এল লাঠি নিয়ে–'কোথায় সাপ, কোথায় সাপ' বলে তারাও চেঁচিয়ে অস্থির। বেগতিক দেখে বাচ্চাটা ততক্ষণে সুড় সুড় করে গর্তে ঢুকে পড়েছে। জসিম গর্তটা দেখিয়ে দিল। গোলমাল শুনে আলম, মালী ওরাও এল। সব শুনে বলল–'সাহেব, এরা হচ্ছে বাস্তু সাপ। অনেকদিন ধরেই আছে, কখনও কারও ক্ষতি করে না। আমরাও দেখেছি, নিজেরা সাবধানে থাকলেই হবে, বাচ্চাদের মানা করে দিন, এদিকে যেন খেলতে না আসে।'

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সেলিম বলল, 'হ্যাঁ, বাস্তু সাপ না কচু, সাপকে দয়া মায়া করি আর আমাদের ছোবল দিয়ে শেষ করুক, বিষাক্ত, হিংস্র সাপ–বিবেক বুদ্ধির বালাই আছে নাকি ওদের? ছেলেপুলে নিয়ে এসেছি, কখন কাকে কামড়ায়, না, না, ওসব হবে না, যাও–আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া দাও, গর্ত থেকে বের করতে হবে আগে–কতগুলো শয়তান আছে, কে জানে!'

আলমরা হুকুমের দাস, মালিকের কথা শুনতেই হবে, তবু শেষবারের মত মিনতি করল ওদের না মারতে। বাস্তু সাপ কখনও ক্ষতি করে না বরং ওদের মারলে নিজেদেরই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। সেলিম কোন কথাই শুনতে নারাজ, অন্যরাও নিষেধ করল মারতে–সত্যিই তো, বেশ ক'দিন হলো এসেছে সবাই, কাউকে কামড়ায়নি, দেখাই দেয়নি, কী দরকার নিরীহ প্রাণীদের জানে মারার।

'সাপ? নিরীহ প্রাণী?' ক্রূর হাসল সেলিম–'আমার বাড়িতে জাঁকিয়ে আস্তানা গেড়েছে, সহজে যাবে? কোন বিশ্বাস নেই জঘন্য এই নীচ প্রাণীদের। সবগুলোকে শেষ করে তবে অন্য কাজ।' কারও নিষেধ না শুনে সেলিম সাপ মারার প্রস্তুতি নিতে লাগল। মহিলা ও বাচ্চাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হলো। পুরুষ কয়েকজন হাতের কাছে যা পেল, নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। গর্তের মুখে শুকনো কাঠ জড় করে আগুন দেওয়া হলো। ধোঁয়া ও আগুনের তাপে বাচ্চাগুলো আগে কিলবিল করে বেরিয়ে এল। সেলিমের উৎসাহ সবার চাইতে বেশি, সেই আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে আগুনে ফেলে দিতে লাগল অসহায় বাচ্চাগুলোকে–মাংস পোড়ার দুর্গন্ধে বাতাস দূষিত হয়ে উঠল। সবাই বিস্মিত হলো, বাপরে, এতগুলো সাপের বাচ্চা ছিল? কিন্তু এদের বাবা, মা কোথায়? ও দুটোকে শেষ না করলে রক্ষা আছে? সাপের প্রতিহিংসা বড় মারাত্মক, একটাকেও ছাড়া যাবে না।

পুরুষ সাপটা তখন বাইরে। সাপিনী বাচ্চাদের সাথে গর্তেই ছিল, আগুনের তাপ ও ধোঁয়া গর্তে প্রবেশ করতেই আতঙ্কিত হয়ে সে বুঝতে পারল আর রক্ষা নেই। নিষ্ঠুর মানুষের হাতে প্রাণ দিতে হবে বাচ্চাসহ, পালাবার কোন পথ নেই। গর্তের একেবারে ভিতরের দিকে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল সাপিনী, কিন্তু সে সহ্য করতে পারলেও বাচ্চারা আগুনের তাপ সইতে না পেরে

দিশেহারার মত গর্তের বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল।

বেরনো মাত্রই মৃত্যু ফাঁদে পড়তে শুরু করল, একটাও বাঁচতে পারল না। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মানুষগুলোর দিকে চেয়ে যেন বলতে চাইল–'আমরা তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি, কোন্ অপরাধে আমাদেরকে নির্মম ভাবে মেরে ফেলছ?'

বাচ্চাদের বেরিয়ে যেতে দেখে সাপিনীও দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে বের হয়ে এল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে, বেদনায় নিস্পলক চেয়ে দেখল আদরের সন্তানদের করুণ পরিণতি। রাগে, তীব্র স্বরে ফোঁস করে বিশাল ফণা মেলে শরীরটা মাটি থেকে অনেকটা তুলে রুখে দাঁড়াল।

সাপটাকে দেখে সবাই বিস্ময়ে ভয়ে পিছু হটে গেল, আকার আকৃতি, ভয়াবহ সৌন্দর্য সবার বুকে আতঙ্কের কাঁপন ধরিয়ে দিল। বাচ্চাগুলো প্রায় সবই শেষ হয়ে গেছে–তাদের মরণ আর্তনাদ ও মৃত্যু যন্ত্রণা–অন্তিম মুহূর্তের মা, মা ডাক সাপিনীকে উন্মাদ করে ফেলল। নিষ্ফল আক্রোশে তীব্র ভীতিকর আওয়াজ করে ছোবল দিতে উদ্যত হলো, অন্তত কয়েকটাকে মেরে সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নেবে সে।

হঠাৎ সাপিনীর দৃষ্টি পড়ল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে, যেখানে বেশির ভাগ বাচ্চাই তার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কষ্টে বুকটা ফেটে গেল হতভাগিনী মায়ের, যখন দেখল তার ছোট্ট দুরন্ত দুষ্ট বাচ্চাটা মায়ের দিকে যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অনেক কষ্টে বলল, 'মা, মা, আমি আর তোমার অবাধ্য হব না, মাগো,' তারপরই আগুনে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল ছোট্ট শরীরটা–দুরন্ত বলেই হয়তো আগুনে পড়েও সড়সড়িয়ে খানিকটা বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, মাকে দেখে হয়তো ভেবেছিল ওকে বাঁচাতে পারবে।

সাপদের কি কোন অনুভূতি আছে? স্নেহ, মায়া, মমতা? দুঃখ কষ্ট পেলে কি তাদের চোখ থেকেও অশ্রু ঝরে? ভয়াল বিষধর সাপ হলেও, সে যে মা, বুকে করে রেখেছিল এত দিন যে সন্তানদের–আজ তাদের মর্মান্তিক পরিণতি দেখে, সভ্য, শিক্ষিত মানুষের নিষ্ঠুরতায় বিষাক্ত সাপও স্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে রইল। এই সুযোগটাই নিল সেলিম, হাতের মোটা লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি মারল সাপিনীকে, অন্য কেউ কাছে যেতে সাহসই করল না, কিন্তু সেলিম রাগে, ঘৃণায় মারতেই থাকল যতক্ষণ না অতবড় সাপটা থেঁতলে পিষে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সাপিনী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে বেদনামাখা দৃষ্টি সেলিমের ওপর রেখে বলতে চাইল, 'আজ আমি অনায়াসে তোমাদের দু'চারজনকে শেষ করে পালিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি মা, বুকের ধনদের নিষ্ঠুর ভাবে আমার চোখের সামনে মেরে ফেলেছ, পৃথিবীর কোন মাই এই অবস্থায় নিজের জান বাঁচাবার জন্য পালিয়ে যায় না–আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাহাদুরি দেখিয়েছ, নইলে বুঝতে পারতে আমি কী ভয়াবহ জিনিস।' সাপিনীর আরও মনে পড়ল স্বামীর বলা কথাগুলো–'অভিশাপ দেবে তো পরে, আগে যে আমরাই বাচ্চাকাচ্চা সহ মারা পড়ব।'

সব শেষ। উল্লাসে সেলিম আগুনটাকে আরও উসকে দিয়ে দেখতে লাগল। সবগুলো আপদ মরেছে কিনা। বিষণ্ন সুরে আলম বলল, 'সাহেব, আমার কথাটা শুনলেই ভাল করতেন, কাজটা ঠিক হলো না–আমাদের সবাইকে এখন খুব সাবধানে থাকতে হবে, বিপদ শেষ হয়নি এখনও।'

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল সেলিম। 'বিপদ? কীসের বিপদ? সব ক'টাকে তো শেষ করেছি।'

'না, সাহেব, এর জোড়া আর একটা আছে, সেটা আরও ভয়াবহ, ওকে মারতে না পারলে আমাদের কপালে খারাবি আছে। নিশ্চয় সেটা আশপাশে কোথাও আছে। দেখেছে ওর সঙ্গিনী আর বাচ্চাদের মারতে।' সবাই তখন সন্ত্রস্ত হয়ে ঝোপ-ঝাড় আনাচে কানাচে দলবেঁধে খুঁজতে লাগল।

সত্যিই, এই হত্যাকাণ্ড যখন শুরু হয় তখন পুরুষ সাপ গর্তে ছিল না, একটুপর, বাইরে থেকে এসেই দূর থেকে দেখতে পেল কী নির্মম ভাবে তার স্ত্রী ও সন্তানদের মারা হচ্ছে।

যে মানুষকে কখনও শত্রু মনে করেনি, স্ত্রীকে বুঝিয়েছে, ঝগড়া করেছে মানুষের পক্ষ নিয়ে এখন তারাই কী পৈশাচিক উল্লাসে অসহায় ভাবে আগুনে পুড়িয়ে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে আনন্দ প্রকাশ করছে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার বিশাল শরীর মোচড় খেতে লাগল। নিরুপায় অবলা প্রাণীটি কঠিন মাটির বুকে ফণা আছড়াতে আছড়াতে মুখ রক্তাক্ত করে ফেলল, কিন্তু প্রিয়জনদের কোন সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারল না।

অসহ্য ক্রোধে সাপটি দ্রুত এগিয়ে এল, তার তো সবই শেষ হয়ে গেছে। প্রতিশোধ নিতে হবে, সবগুলো মানুষরূপী পশুকে শেষ করে তবে সে শান্তি পাবে। সাপটাকে দেখেই সবাই চিৎকার করে উঠল, 'বাবারে! এই আজরাইলকে খতম না করলে খবর আছে।' মানুষের মত কোমল অনুভূতি ঘৃণিত সরীসৃপের আছে কিনা, কেউ জানে না, হয়তো আছে নইলে প্রিয়জনের নির্মম মৃত্যুতে কাতর ও শোকে পাথর হয়ে ছিল বলেই সাপটাকে সহজেই কাবু করতে পারল সবাই।

একের পর এক আঘাতে বিশাল সাপটিকে নিস্তেজ করে জ্বলন্ত গনগনে আগুনে ফেলে দেওয়া হলো এবং বলাই বাহুল্য, সেলিমই নৃশংস হত্যার প্রধান ভূমিকা পালন করল। সাপটা ঠিকই জানতে পারল এই অমানুষিক হত্যাযজ্ঞের জন্য কে দায়ী। মৃত্যুর আগে সে নিঃশব্দ ভাষায় বলে গেল–'সৃষ্টির সেরা প্রাণী বলে তোমরা বড়াই করো, আর আমরা? বিষাক্ত, বিবেচনাহীন, অনুভূতিশূন্য সরীসৃপ মাত্র–অকারণে তুমি আজকে যা করলে, তার তুলনা হয় না। আমার স্ত্রীকে হিংসা করতে, তোমাদের মারতে নিষেধ করেছিলাম, অহেতুক হিংস্রতা আমাদের নীতি নয়–তুমি যা করেছ, এর ফল অবশ্যই ভোগ করবে, আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, আমার চাইতে দ্বিগুণ কষ্ট ও বেদনায় তুমি তড়পাবে–যতদিন তোমার আয়ু থাকবে, জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকবে।'

আলমরা থর থর করে কাঁপছিল–এত ভয়াবহ অমঙ্গলজনক ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় তারা কিছুতেই সুস্থির হতে পারছিল না। এরপর আর আসর জমল না,

সবারই মন খারাপ হয়ে গেল। সেলিম গল্পগুজব হাসি ঠাট্টায় উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হলো–কেউ আর থাকতে রাজি হলো না। সেলিমরা ছাড়া সবাই চলে গেল।

ভীষণ রাগ হলো সেলিমের, গজ গজ করতে লাগল–'কতগুলো বিষধর সাপ মেরেছি, তাতে কী এমন মহা ভারত অশুদ্ধ হলো? আমরা না মারলে তো ওগুলোই ছোবল দিয়ে শেষ করত আমাদের। যাকগে, আমি এখন যাচ্ছি না, মজাসে ঘুরব, খাব দাব তারপর যাব।'

কেয়ার কাছেও ব্যাপারটা খুব ভাল লাগেনি। স্বামীকে অনুযোগের সুরে বলল, 'আলমরা অত করে মানা করল, বাস্তু সাপ, কোন ক্ষতি করে না, নিজেরা সাবধানে থাকলেই তো হত, মারার কী দরকার ছিল?'

স্ত্রীর কথায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সেলিম, 'তুমিও এই গান গাইছ? সাপের গুষ্টি নিয়ে এক জায়গায় থাকলে বুঝি খুব আনন্দ লাগত, তাই না? যত্তোসব, বেশ করেছি, মেরেছি–এ নিয়ে আমি আর একটা কথাও শুনতে চাই না।' স্বামীর ধমকে চুপ করে গেল কেয়া কিন্তু মনের অস্থিরতা ও বিষণ্ন ভাব কাটল না, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে চুপচাপ বসে থাকল।

দুপুরে খাওয়ার পর সবাই যে যার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। কেয়া, জসিমকে নিজের কাছেই শোওয়াল, জানে, দুষ্টু ছেলে, কাছে নিয়ে না শুলে দুপুরের রোদে টো টো করে বাগানে ঘুরবে কি পুকুরের ধারেই যাবে। মা ঘুমিয়ে যেতেই জসিম আস্তে আস্তে উঠে বাগানে চলে এল, এতক্ষণ সে ঘুমের ভান করে পড়েছিল। বাগানে একা এসে তার একটুও ভয় করল না, সব সাপ তো বাবা মেরেই ফেলেছে–বাবার খুব সাহস, কত বড় বড় বিষাক্ত সাপ মারল, ভয়ই পেল না।

ইতস্তত ঘুরতে লাগল সে, যেখানে আগুন জ্বেলে সাপগুলোকে মারা হয়েছিল, এখনও সে জায়গায় পোড়া দাগ রয়ে গেছে, ছাইটাই সব পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। একটু থমকে দাঁড়াল সেখানে জসিম–চোখের সামনে ভেসে উঠল আগুনে পোড়া সাপগুলোর ছটফটানি–শরীরটা কেমন শিরশির করে উঠল তার–সরে এল সে ওখান থেকে। একটা গাছে কী পাখি যেন মধুর কণ্ঠে ডাকছে, মুখ তুলে দেখার চেষ্টা করল জসিম–ওই তো, একদম মগডালে বসে সুন্দর ছোট্ট পাখিটা। শিস দিয়ে পাখিটাকে ডাকতে লাগল, কিন্তু শিসের বদলে মুখ দিয়ে কেমন হিস হিস শব্দ বেরিয়ে এল। চমকে উঠল জসিম–আবারও শিস দিল, এবারও সেই একই হিস্‌স্‌ শব্দ বের হয়ে এল–হঠাৎ ওর যেন মনে হলো মাটির নীচের গর্তে ওর মা শুয়ে আছে, মায়ের কুণ্ডলী পাকানো বুকের ওমে শুতে কী আরাম, কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে ওর, গর্তে ঢুকে শুয়ে পড়তে, সমস্ত শরীর আপনা থেকেই টানটান হয়ে যেতে লাগল–কী হচ্ছে এসব? ছেলেমানুষ, বুঝতে পারল না কিছু, ভয় পেয়ে এক দৌড়ে ও ঘরে চলে এল।

মাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুলল–'মা, আ-আ-আ-মাকে দু-দু-ধ দা-দা-ও।' ধড়মড় করে উঠে বসে কেয়া বিস্মিত স্বরে বলল, 'কী হয়েছে, জসিম? তোমার কথা অমন আটকে যাচ্ছে কেন? মুখে কী হয়েছে?'

তেমনি ভাবেই জবাব দিল জসিম–'জানি না, আমাকে দুধ দাও, ভীষণ দুধ

খেতে ইচ্ছে করছে।' অবাক ব্যাপার, যে ছেলেকে দুধ খাওয়াতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয় সেধে দুধ খেতে চাইছে সে।

'হাতমুখ ধুয়ে এসে দিচ্ছি দুধ,' বলেই বাথরুমে চলে গেল কেয়া, সদ্য ঘুম ভাঙায় মস্তিষ্ক ততটা সক্রিয় নয়, তাই ছেলের বিচিত্র ভঙ্গিতে বলা কথা ও আচরণকে গুরুত্ব দিল না মা।

রাতে কী রান্না হবে কেয়া তাই বলতে গিয়েছিল রান্নাঘরে, কাজ সেরে ড্রয়িংরুমে এসে দেখে সোফার ওপর গুটিয়ে বসে জসিম টিভি দেখছে। কার্টুন দেখতে সবচেয়ে পছন্দ করে ও। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে কেয়া দেখল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে সাপের ওপর প্রামাণ্য চিত্র দেখাচ্ছে, সেটাই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে জসিম। সাপের ছবি দেখেই কেয়ার শরীরটা শিউরে উঠল, মনে পড়ে গেল বাগানে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার কথা–ছেলেকে ধমকে উঠল। 'কার্টুন না দেখে এগুলো কী দেখছ, দেখতে হবে না আর, যাও খেলো গিয়ে।' টিভি বন্ধ করে দিল কেয়া।

এমন আর্তনাদ করে উঠল জসিম, যে চমকে উঠল কেয়া–'বন্ধ কোরো না, বন্ধ কোরো না, আমার দেখতে খুব ভাল লাগছে,' ঠিক তেমনি জড়ানো উচ্চারণে কথাগুলো বলল সে, শব্দগুলো যেন অনেক কষ্টে বলছে জসিম। কেয়া কিছুই বুঝতে পারছে না, ছেলেটার হয়েছেটা কী? পাশে এসে বসল তারপর সস্নেহে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তোমার, বাবা? তুমি এমন ভাবে কথা বলছ কেন?'

বসে বসে দুলছে জসিম, ফিসফিস করে বলল, 'আমি জানি না, আমার কিছু ভাল লাগছে না, তুমি দেখতে দিলে না কেন ওদেরকে,' বলেই সোফা থেকে উঠে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চলে গেল জসিম। ওর গমনপথের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কেয়া। সেলিম তখন বাসায় ছিল না তাই সে এসবের কিছুই জানতে পারল না।

রাতে খেতে বসেছে ওরা। ভাত, মাছ, মাংস, নানা পদের ভাজি ভর্তা দিয়ে টেবিল ভরা। তৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে সেলিম হঠাৎ খেয়াল করল জসিম কিছু খাচ্ছে না, জিজ্ঞেস করায় বলল খিদে নেই। ছেলের কথা শুনে বিস্মিত সেলিম জানল যে বিকেল থেকেই সে এভাবে কথা বলছে, চিন্তিত হলো, এই রাতে ডাক্তার পাবে কোথায়–জসিমকে কাছে ডাকল, 'এদিকে এসো তো, বাবা, মুখে বা গলায় ব্যথা করছে?' মাথা নেড়ে বাপের কাছে এসে দাঁড়াল। সেলিম ওকে হাঁ করতে বলে মুখের ভিতরটা ভাল করে লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেল–জসিমের জিভের মাঝখানে লম্বা একটা লাল দাগ, যেন জিভটাকে দাগটা দু'ভাগ করে রেখেছে শুধু তাই নয় মুখ ও শরীরের জায়গায় জায়গায় কী রকম যেন চাকা চাকা দাগ এবং গায়ের রঙ হালকা কালচে সবুজ লাগছে। ভয় পেলেও প্রকাশ করল না সেলিম। স্ত্রীর ওপরই রাগ করল ছেলেটার দিকে খেয়াল রাখে না। বিষাক্ত কোন পোকামাকড় কামড়েছে মনে হয়। কেয়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। 'তোমার ছেলে না ঘুমিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়ালে আমি কী করব? কথা শোনে আমার?'

আর কিছু না বলে ছেলেকে বোঝাল অল্প কিছু খেতে, খালি পেটে থাকতে হয়

না। পা টেনে টেনে নিজের চেয়ারে বসে অল্প অল্প দুলতে লাগল জসিম—জিভটা মুখ থেকে বের হয়ে ঢুকে যাচ্ছে আবার। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ভীত হয়ে পড়েছে জসিমের উদ্ভট আচরণে, দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য দু'জনেই অন্য বিষয়ে কথা বলা শুরু করল।

দুধ সেমাই রান্না হয়েছিল রাতে। চকচক একটা শব্দ শুনে সেলিমরা তাকাল এবং পরমুহূর্তে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখল, প্লেটে সেমাই নিয়ে জসিম মুখ নামিয়ে জিভ বের করে চেটে চেটে খাচ্ছে। বিমূঢ় স্বামী-স্ত্রী আঁতকে উঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—'এ কী, জসিম, এভাবে খাচ্ছ কেন? চামচ দিয়ে খাও।'

'চামচ দিয়ে মানুষরা খায়, আমরা এভাবেই খাই।' নির্বিকার জবাব জসিমের।

ভয়ের শীতল স্রোত নামছে মেরুদণ্ড বেয়ে, টের পেল সেলিম, কেয়াও নিশ্চুপ—কেউ ভেবে পেল না কী বলবে—শেষে সেলিমই বলল—'ঠিক আছে, তুমি যেয়ে শুয়ে পড়ো, শরীরটা মনে হয় বেশিই খারাপ লাগছে তোমার। ভাল করে ঘুম দাও, ঠিক হয়ে যাবে। সকালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব তোমাকে।' বিনা বাক্য ব্যয়ে উঠে দাঁড়াল জসিম, তাকাল বাবার দিকে, সেলিমের সমস্ত শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে গেল, গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল—ছেলের দৃষ্টিকে অপরিচিত মনে হচ্ছে; ওর দিকে পলকহীন চেয়ে আছে যেন সেই যন্ত্রণাকাতর সাপটি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে জসিম কেমন ভাবে যেন সামান্য এঁকেবেঁকে চলে গেল। ওরা দু'জন পাথরের মত বসে রইল, মনটা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল। জসিম আলাদা ঘরে শোয়, নিজের ঘরে যাওয়ার আগে সেলিম ছেলের কাছে এল। অঘোরে ঘুমাচ্ছে ও, কিন্তু এ কীভাবে শুয়েছে জসিম? প্রায় গোল হয়ে, হাঁটু মাথা ছুঁয়েছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে পরম আরামে ঘুমাচ্ছে। ঠিক করে শোওয়াতে গেল ছেলেকে সেলিম, ওর শরীরে হাত দিয়েই দারুণ চমকে উঠল—কী অসম্ভব ঠাণ্ডা দেহ জসিমের! যেন বরফ দিয়ে তৈরি—ঠিক করে শুইয়ে দিতেই আবারও আগের ভঙ্গিতে শুয়ে রইল। মনের ভিতর আবার অজানা আতঙ্ক চাড়া দিয়ে উঠল—কী যেন বুঝতে পারছে না সে, ধরতে পারছে না কোন একটা ব্যাপার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল সেলিম।

কেয়ার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল সেলিমের—জসিমকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। দৌড়ে আগে ওর ঘরে এল, রাত পোশাক বিছানায় পড়ে আছে, চাদর এমন ভাবে কুঁচকে আছে, যেন কিছু একটা বুক ঘষটে, ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে বিছানা থেকে নেমেছে। মেঝেতেও ঘষটানির দাগ স্পষ্ট—সোজা জানালার কাছে চলে গেছে।

জসিমকে আর কোনদিনই পাওয়া যায়নি। একমাত্র ছেলের শোকে কেয়াও বেশিদিন বাঁচেনি। সেলিম এখন বাগান বাড়িতেই থাকে। পুরানো লোকজন কেউ নেই। নতুন লোক রাখা হয়েছে। সারাদিনই প্রায় সেলিম বারান্দায় বসে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকে—ওর দৃষ্টি কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়। নতুন মালী এসে একদিন জানাল, 'সাহেব ওই ওদিককার একটা গাছের নীচে গর্ত দেখলাম একটা, সাপটাপ আছে কিনা, তা হলে তো মুশকিল, কখন কাকে কামড়ে দেবে, লোকজন ডেকে

আনব? সাপ থাকলে তো মারার ব্যবস্থা করতে হয়।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সেলিম, চিৎকার করে ধাক্কা দিয়ে মালীকে সরিয়ে দিয়ে পাগলের মত বলে উঠল, 'না, না, খবরদার, কেউ মারবে না তোমরা ওকে, ও কারও ক্ষতি করবে না–ওর মত ওকে থাকতে দাও।'

অবাক মালী জলদি সরে পড়ল, বিড় বিড় করে বলতে বলতে গেল–'মালিকের মাথা খারাপ হইলো নাকি?'

এক বাটি দুধ নিয়ে সেলিম গর্তটার কাছে এসে স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকতে লাগল–'আয়, আয়রে বাবা, আয়, দেখ দুধ এনেছি তোর জন্যে, আয়রে, মানিক।' ধীরে, খুব ধীরে গর্ত থেকে মাথা বের করল একটি সাপ। সেলিমের দিকে পলকহীন তাকিয়ে দুধের বাটিতে ফণা নামিয়ে চকচক করে খেতে লাগল। রোজই দুধ নিয়ে এসে ডাকে সেলিম–সাপটা বের হয়ে তাকায়, চেরা জিভ বের করে কিছু বলতে চেষ্টা করে, পারে না–সেলিমের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে–সাপটার পলকহীন দৃষ্টি ঠিক যেন জসিমের মত।

নাজনীন রহমান



বিষ্ণুদিয়া ঘাটের রহস্য

যা ভেবেছিলাম ঠিক তা-ই হলো। বিষ্ণুদিয়া ঘাটে নৌকা নেই। লক্ষ্মীপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে এতক্ষণ খুব দ্রুত পা চালিয়ে এসেছিলাম, যাতে খেয়ার মাঝি চলে যাবার আগেই ঘাটে পৌঁছাতে পারি। কিন্তু মাঝি আজ এত তাড়াতাড়ি চলে গেল? অবশ্য তাড়াতাড়িই বা কোথায়! হেমন্তের রাত নটা তো বেশ রাত। শুনেছি নৌকা নিয়ে যাতে কেউ মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করতে না পারে, সেজন্য মাঝি নৌকাটা লুকিয়ে রেখে যায়। আজও নিশ্চয় তা-ই করেছে। কার্তিক মাসের শেষ পক্ষ এখন। এসময় রাতে প্রচুর শিশির পড়ে। বাস স্ট্যান্ড থেকে এ পর্যন্ত হেঁটে এসে আমার মাথা শিশিরে বেশ ভিজে গেছে। একটু একটু ঠাণ্ডাও পড়ছে। সাথে ঘোলাটে কুয়াশা।

কুষ্টিয়া গিয়েছিলাম আমার রেডিও মেরামত করতে। রেডিও মেকার বারবার বলেছিল বাড়ি চলে গিয়ে পরদিন রেডিওটা আনার কথা। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে থাকি; রেডিও ছাড়া আমার চলেই না। টেবিলে রেডিও অল্প ভল্যুমে চালু করে অংক করা কিংবা নোট তৈরি করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমি তখন এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। রেডিও ছাড়া যে আমার রাতই কাটবে না। তখনও গ্রামে টেলিভিশন আসেনি।

মাঝির বাড়ি আমি চিনি। বিষ্ণুদিয়া গাঁয়ের উত্তরের শেষ মাথায়। সেও কম পথ নয়। দেখা হলে মাঝি ও তার ছেলেরা বেশ সম্মান করে। আমার আব্বা এ অঞ্চলের বৃটিশ আমলের স্কুল টিচার। তাঁর শিক্ষকতার সুখ্যাতির কারণে আমরা সন্তানরাও সম্মান পাই। মাঝি আমাদের পরিবারের সবাইকে চেনে। গেলে নিশ্চয় আমাকে পার করে দিতে ঘাটে আসবে। কিন্তু বাসস্ট্যান্ড থেকে হেঁটে আসা পরিশ্রান্ত পা দুটো মাঝির বাড়ি যেতে আপত্তি জানাতে থাকল।

আমার রেডিওটা কতবার যে নষ্ট হয়েছে তার ঠিক নেই। চারটে বড় ড্রাইসেল ব্যাটারিতে আমার রেডিওটা চলত। ক্লাস এইটে বৃত্তি পাওয়ার পরে আমি দীর্ঘদিনের লালিত একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন করেছিলাম। বড়ভাইয়া অবশ্য রেডিও কেনাটা পছন্দ করেনি। কিন্তু বড় ভাবীর ওকালতিতে বড় ভাইয়া আমাকে এ বিষয়ে তেমন কিছু বলারও সুযোগ পায়নি।

আমার নিজের ওস্তাদির কারণেই রেডিওটা প্রায়ই নষ্ট হত। এক ব্যান্ডের রেডিওতে বাড়তি তারের এন্টেনা সংযুক্ত করে শর্টওয়েভ স্টেশনের হিন্দি গান এমনকী বিবিসি-আমেরিকার খবরও শোনার ব্যবস্থা করতাম। এসব করতে গিয়েই বারবার রেডিওর বারোটা বাজাতাম। প্রতিবারই রেডিও মেরামতের পরে আমার মধ্যে নতুন রেডিও কেনার আনন্দ জেগে উঠত। রেডিও মেকার কীভাবে যে সাউন্ড বাড়িয়ে স্টেশনগুলো ক্লিয়ার করে ভাবতেই অবাক লাগত। আশপাশে

কুষ্টিয়া ছাড়া রেডিও মেরামত করার ব্যবস্থা তখন ছিল না। নৌকার চিন্তার মাঝেও আমি রেডিওটা অন করলাম। না, ঠিকই আছে। ইচ্ছে করল নদীর পাড়ে শুয়ে রেডিওর গান শুনে রাত কাটিয়ে দিই। খুবই রেডিওর ভক্ত ছিলাম আমি।

অনেক সময় জেলেরা তাদের মাছধরা তালের নৌকা বা ডুঙা নদীর কূলে অল্প পানিতে ডুবিয়ে রাখে। এই অবস্থায় কতদিন জেলেদের ডুঙা খুঁজে ওপারে যেয়ে ডুঙাটা ডাঙায় তুলে রেখে বাড়ি চলে গেছি। কিন্তু আমার পরনে প্যান্ট শার্ট থাকায় ডুঙার খোঁজই বা কী করে করি। আগে যখন এ অবস্থায় পড়েছি তখন লুঙ্গি কাছা দিয়ে পরে ডুঙার সন্ধান করে পার হয়েছি। স্কুলে তখনও লুঙ্গি চালু ছিল। আমরা লুঙ্গি পরেই স্কুলে যেতাম। তখন গ্রামের হাইস্কুলে পড়তও বড় বড় ছেলেরা। এখনকার মত স্কুলড্রেস-ফ্রেসের বালাই ছিল না। কারও কারও প্যান্ট থাকলে সেটা ছিল গৌরবের বিষয়। স্কুলে লুঙ্গি পরে গেলেও শহরে যাবার সময় প্যান্ট পরতাম।

অবশেষে পায়ের স্যান্ডেল খুলে রেখে প্যান্ট গুটিয়ে ডুঙার সন্ধানে নদীর নীচে নামার উদ্যোগ করছি এমন সময় শব্দটা আমার কানে এল। 'বাঁচাও! বাঁচাও...মা'রে ফেলল...। দু'বার শোনার পরে শব্দটা আর কানে এল না। রেডিওটা পরীক্ষা করলাম। শব্দটা কি আমার রেডিওর কোন নাটকের ডায়ালগ? নাহ্, রেডিও তো অফ করা! এর আগে অবশ্য রেডিও মেরামত করে বাড়ি গিয়ে দেখি শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। তারপর ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেল ভলিউম কন্ট্রোলের সুইচ ডাইরেক্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ আমি বন্ধ করলেও রেডিওটা ডিউটি করেই চলে। আজও কি তা-ই হলো? নাহ্, রেডিও মেরামতের কোন ত্রুটি খুঁজে পেলাম না। তবে শব্দটা কোথা থেকে এল? আকাশে জোছনা বেড়েছে। নদীর কূলে আমার ব্যাগ ও রেডিওটা রেখে ডুঙার খোঁজে নদীর কিনারায় নীচে নেমে এলাম।

একটা ডুঙা পাওয়া গেল। গলুই পানির গভীরে। তুলতে হলে পানিতে নেমে ভিজতে হবে। আর একটা ডুঙার খোঁজে সামনে এগুলেই বেশ কিছুটা দূরে ঘাটের খেয়া নৌকাটা বাঁধা রয়েছে বলে মনে হলো, কাছে এগিয়ে গেলাম। একজন লোক নৌকার পেট বরাবর আড়াআড়ি মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম তার মাথা যেন কিছুটা পানির দিকে ঝুলে রয়েছে। মাছ ধরছেন নাকি? নীচে পানিতে কি জাল পাতা? জালে মাছ আটকালে যাতে তাড়াতাড়ি টেনে তোলা যায় সে জন্যই কি তিনি এভাবে শুয়ে আছেন?

তবে মাছ ধরার জন্য এভাবে খেয়া নৌকা আড়ালে এনে উনি ভাল কাজ করেননি। তাঁর এ গর্হিত কাজের জন্য আমি তাঁকে কিছু বলতে যেয়েও বললাম না। বিদেশ বিভূঁইয়ে কী দরকার? যদি আমার কথা শুনে উনি রেগে যান? অগত্যা নিজেকে কন্ট্রোল করে খুব ভদ্রভাষায় লোকটাকে জানালাম যে, নৌকাটা ঘাটে আনা দরকার। আমি পার হব। লোকটি কি ঘুমিয়ে গেছেন? দু'তিনবার ডাকার পরেও কোন সাড়া না পেয়ে আমিই নৌকায় উঠে গেলাম। এবার লোকটা উঠে বসলেন। তবে কোনও কথা বললেন না। লোকটার গায়ের জামার বুকের কাছে

কেমন ভেজা মনে হলো। রক্ত নাকি? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। ধুর! তা হবে কী করে? উপুড় হয়ে শুয়ে থাকাতে বুকের কাছে নৌকার কাদাপানিও লাগতে পারে। যা হয় হোকগে, বাজে চিন্তা মন থেকে ভাগাতে চেষ্টা করলাম।

নৌকার পাটাতন থেকে বৈঠা নিয়ে মাঝির ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়ে আর পারলাম না। যদিও ভেবেছিলাম হয়তো লোকটা নিজেও হাতে বৈঠা নিতে পারেন। কারণ প্যান্ট-শার্ট পরা মানুষ দেখলে গ্রামের অনেকেই তখন সমীহ করত। কিন্তু লোকটার মধ্যে কোন সম্মান দেখানোর গরজ দেখলাম না। তাঁর মাছ ধরার কাজে বিঘ্ন ঘটালাম বলেই কি উনি প্যান্ট শার্ট পরা আমাকে সরাসরি ভর্ৎসনা না করতে পেরে ওভাবে মুড নিয়ে বসে আছেন? কিন্তু আমি নৌকার আশপাশে ভালভাবে তাকিয়েও কোনও মাছ ধরার জাল দেখলাম না। তবে কেন লোকটা ওভাবে শুয়ে ছিলেন? উনি কি কোনও আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির সদস্য? সতীর্থদের পার করার জন্য এভাবে নৌকা আড়ালে নিয়ে বসেছিলেন নাকি? তাঁর কাছে কি কোন আগ্নেয়াস্ত্র আছে? ইত্যকার বিবিধ ভাবনা আমার মগজে ভীড় জমাল। আমি যথাসম্ভব লোকটার দিকে না তাকিয়ে নৌকা ঘাটে এনে তীরে রাখা আমার ব্যাগ ও রেডিও সেট নিয়ে আবার নৌকা চালাতে শুরু করলাম।

হেমন্তের শুষ্ক-শীর্ণ স্রোতস্বিনী। স্রোত না থাকায় খুব সহজেই আমি নৌকা চালাতে পারছিলাম। পরিষ্কার আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদে তখন বেশ জেল্লা ফিরে এসেছে। আমার ভেতরটা তখন নানা কারণে অস্থির হয়ে আছে। আর এ অস্থিরতা দূর করার জন্য আমি নৌকা চালাতে চালাতে চাঁদের দিকে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে থাকলাম–যদি মনটা স্থির হয়।

তখন নৌকাটার অবস্থান মাঝনদীতে। হঠাৎ খেয়াল করলাম লোকটা নৌকায় নেই। চারপাশে তখন জোছনার অভাব নেই। একজন মানুষকে বেশ দূর থেকেও দেখার মত পর্যাপ্ত আলো জোছনা বিলোচ্ছিল। জোছনার আলোয় নদীতীরে যতদূর চোখ যায় কোথাও লোকটার টিকিটি মাত্র দেখা গেল না। গেলেন কোথায়? নিস্তব্ধ নদীতীরের ওপার থেকে এবার আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, 'কিডা কনে আছো–বাঁচাও! বাঁচাও!!...মারে ফেললো...'

শরিফুল ইসলাম

তন্দ্রা

এক

বেশ আনন্দের সাথেই খামটা খুলেছিল লামিসা হাসান। কিন্তু চিঠিটা শেষ করতে সে আনন্দ আর রইল না। সবটুকু আনন্দ যেন কোনও অশুভ শক্তির প্রভাবে বাষ্প হয়ে চোখের পাতা ভিজিয়ে দিল। সেই সাথে রাজ্যের উৎকণ্ঠা ভর করল দু'চোখের তারায়। একছুটে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়াল সে। এগিয়ে দিল চিঠিটা স্বামীর দিকে।

লামিসার স্বামী আরাফাত হাসান দুপুরের খাবার সেরে বিছানায় আরাম করছিল। স্ত্রীকে এভাবে দৌড়ে আসতে দেখে হতবিহ্বল হয়ে বিছানার উপর উঠে বসল সে। তারপর চিঠিটা হাত বাড়িয়ে লামিসার কাছ থেকে নিল। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল। মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে।

'এ কী করে সম্ভব? তন্দ্রা তো আমাদের এখানে আসেইনি! তবে গেল কোথায়?' বেশ জোরের সাথেই বলল হাসান।

লামিসা কাঁদছে। বলল, 'আমি তোমাকে বলেছিলাম না ও আসবেই। কোনওদিন আমার কথা ও ফেলেনি, ফেলতে পারে না। ওর নিশ্চয় বড় কোনও বিপদ হয়েছে।'

'তা তো অবশ্যই। তা না হলে এতদিনে ওর পৌঁছে যাবার কথা ছিল এখানে। দিনও তো কম হলো না, সা-ত দিন।'

'দাঁড়াও, আন্টির কাছে ফোন করে সব ভাল করে জেনে নিই।'

'হ্যাঁ, সেটাই ভাল।'

লামিসা এগিয়ে গিয়ে টেলিফোন ডায়েরি থেকে নম্বর বের করে ডায়াল করল। অপর পাশ থেকে ভেসে এল মহিলা কণ্ঠ, 'হ্যালো।'

'হ্যালো আন্টি, আমি লামিসা বলছি, কেমন আছেন?'

'ভাল নেই। তন্দ্রাকে বাইরে কোথাও পাঠালে আমি ভাল থাকি না। তন্দ্রা কোথায়? একটু ডেকে দাও। ও কবে আসবে? বুড়ো হয়ে গেছি তো, তাই ওকে না দেখলে কেমন যেন সব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আচ্ছা, মোবাইল ফোনটা বন্ধ রেখেছে কেন? কতবার চেষ্টা করলাম, একবারও লাইন পেলাম না। তোমার নম্বরটাও আমি জানি না, কী যে চিন্তায় পড়েছিলাম। ও হ্যাঁ, তুর্য কি তোমার ওখানে? চিঠিটা কি পেয়েছ?'

'আসলে আন্টি, ওই চিঠিটার জন্যেই ফোন করেছিলাম।'

'কেন?'

'ইয়ে...আন্টি, তন্দ্রা আমার বাসায় আসেইনি।'

'কী বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ, আন্টি, আমি সত্যি বলছি। আর এ জন্যে ওর ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল। আমার প্রথম বিয়ে বার্ষিকী, অথচ ও আমার বেস্টফ্রেন্ড হয়েও এল না। কিন্তু দু'দিন পর যখন রাগ কমল তখন ওর নাম্বারে ফোন দিলাম, কিন্তু দেখলাম সেট বন্ধ। বাসার নম্বরেও কয়েকবার ফোন দিয়েছি, কিন্তু কেউ ফোন ধরলই না। বুঝলাম আপনারা হয়তো কোথাও গেছেন, ফিরে এলেই জানাবেন।'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম তন্দ্রার মামার বাসায়। ওর মামীর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না, তাই দেখতে গেছিলাম। কিন্তু ও তো যায়নি। তোমাদের অনুষ্ঠানের দিন ওর একটা ইমপোর্টেন্ট ক্লাস ছিল, সেটা অ্যাটেন্ড করে সময় মতই চলে যাবার কথা ছিল তোমার ওখানে। রীমা বলল তন্দ্রা নাকি সময় মত বেরিয়েও গেছে।'

'কিন্তু আন্টি, ও এসে এখানে পৌঁছায়নি।'

'তা হলে ওর নিশ্চয় কোনও বিপদ হয়েছে। ও সব কিছু ছেড়ে থাকতে পারবে, কিন্তু মাকে এভাবে ফেলে রেখে কোথাও থাকতে পারবে না।'

'আপনি চিন্তা করবেন না, আন্টি। আমি ওর খোঁজ করছি।'

কথা শেষ করে ফোনটা নীচে নামিয়ে রাখল লামিসা, ঘুরে তাকাল স্বামীর দিকে।

হাসান বলল, 'আমি নিশ্চিত তন্দ্রার বিপদ হয়েছে। তুমি চিন্তা কোরো না। আজ রাত হয়ে গেছে, কাল সকাল থেকে আমি ওর খোঁজে নামব।'

তন্দ্রার চিন্তায় একটা দানাও গলা দিয়ে নামল না লামিসার। বারেবারেই বিভিন্ন আজেবাজে চিন্তা এসে তার মন গ্রাস করে নিতে চাইল। সেই সাথে একটাই প্রশ্ন মনটাকে আচ্ছন্ন করে রাখল, 'তন্দ্রা এখন কোথায়?'

লামিসার মনের অবস্থা হাসানও বুঝতে পারল। তাই তাকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিল সে। নিজেও শুয়ে পড়ল পাশে।

অনেক চেষ্টার পর মধ্যরাতের দিকে ঘুম এসে গেল লামিসার। হঠাৎ সে নিজেকে প্রচণ্ড ধোঁয়ার মধ্যে আবিষ্কার করল। ধোঁয়া, ধোঁয়া আর শুধু ধোঁয়া চারদিকে। এভাবে ধোঁয়ার আচ্ছাদনে সে যখন দিশেহারা, তখন দূরে হঠাৎ কোনও মানুষের অবয়ব দেখতে পেল। সে এগোতে লাগল সেই অবয়বটার দিকে। অবয়বটাও তার দিকে এগোচ্ছে। এক সময় দুজনে সামনাসামনি এসে দাঁড়াল। ধোঁয়ার কারণে মুখটা স্পষ্ট দেখতে না পেলেও আবছা দেখা যাচ্ছিল। আর ছায়াটার ঠোঁট অসংখ্যবার নড়েচড়ে ঠিকই বুঝিয়ে দিচ্ছিল কিছু একটা সে লামিসাকে বলতে চাচ্ছে। হঠাৎ ছায়াটা লামিসার দিকে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল।

বিছানার উপর প্রায় লাফিয়ে উঠে বসল লামিসা। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকল সে। এমন ভয়ঙ্কর হাত সে কখনও আগে দেখেনি। বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করল সে। তারপর চোখ খুলে তাকাল।

এমন সময় দূরে কোথাও থেকে নারী কণ্ঠের ক্রমাগত বিলাপ শুনতে পেল সে। কান্নার শব্দটি ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকল। যেন শব্দের উৎস তার বাড়ির

দিকেই আসছে। হঠাৎ দরজায় কেউ ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ করল।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল লামিসা। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল দরজার দিকে। তখনও শব্দটা হচ্ছে। ধীরে ধীরে পাল্লাটা খুলে ফেলল সে। আর খুলেই আতঙ্কে জমে গেল; রক্তাক্ত শরীরে তন্দ্রা তার দরজার সামনে পড়ে আছে। ছুটে গিয়ে সে তন্দ্রার মাথাটা কোলে তুলে নিল।

বিছানায় পাশ ফিরতেই হাসান দেখল লামিসা পাশে নেই। বার কয়েক স্ত্রীকে ডাকল সে, কিন্তু কোনও সাড়া পেল না। বাধ্য হয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। এমন সময় সদর দরজা খোলার শব্দ। ছুটে দরজার কাছে চলে এল হাসান। এসে যা দেখল তাতে তার আক্কেল গুড়ুম। লামিসা দরজার বাইরে বসে যেন বাতাসের সাথে কথা বলছে। পাশে এসে আলতো করে স্ত্রীকে স্পর্শ করে সে বলল, 'এত রাত্রে এখানে কী করছ?'

'কী করছি মানে! দেখছ না তন্দ্রা কেমন আহত হয়েছে। ওকে ঘরে নিয়ে যেতে হবে। আর তুমি একটু ডা. আকরামকে ফোন দাও। উনি যেন জলদি একবার এসে তন্দ্রাকে দেখে যান।'

স্ত্রীর কথা শুনে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেল হাসান। এদিক ওদিক ভাল করে দেখল সে। কিন্তু তন্দ্রা তো নয়ই, অন্য কোনও মানুষের ছায়াও দেখতে পেল না। তাই স্ত্রীকে আবার প্রশ্ন করল, 'কোথায় তন্দ্রা?'

'এই তো আমার কোলে।'

স্ত্রীকে কয়েকটা ঝাঁকি দিল হাসান।

চমকে উঠে যেন বাস্তবে ফিরে এল লামিসা। তারপরই গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

দুই

যখন জ্ঞান ফিরল লামিসার তখন সকাল হয়ে গেছে। স্বামীকে মাথার কাছে বসে ঘুমাতে দেখে মনে মনে বেশ খানিকক্ষণ হাসল সে। নিজেকে খুব সুখী আর ভাগ্যবতী মনে হলো ওর। হাসান ওকে সত্যিই খুব ভালবাসে।

উঠে স্বামীর মাথায় আলতো পরশ বুলিয়ে দিল সে।

লামিসার পরশ পেতেই চোখ মেলল হাসান। স্ত্রীকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে আপন মনেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক চিরে। নিজেকে অনেকটা হালকা লাগল। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। কিন্তু বুঝতে পারছিল না প্রশ্নগুলো তখনই করা ঠিক হবে কি না।

লামিসা বলল, 'আমি বুঝতে পারছি আমার অবস্থা দেখে তুমি বেশ চিন্তায় পড়ে গেছ। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি তন্দ্রাকে দেখেছি। ওর সাথে কথা বলেছি। ওর মাথা দু'হাতে আমার কোলে তুলে নিয়েছিলাম। ও প্রচণ্ড আহত হয়। প্রচুর

রক্তক্ষরণ হচ্ছিল ক্ষতস্থান থেকে। ও আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

'কিন্তু তা কেমন করে হয়?'

'কী কেমন করে হয়?'

'মানে আমি বলতে চাচ্ছি, তুমি বললে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে, কিন্তু আমি তো কোথাও এক ফোঁটাও রক্ত দেখলাম না।'

'তুমি ভাল করে দেখো, অবশ্যই দেখতে পাবে।'

'ঠিক আছে, তুমিও আমার সাথে চলো।'

হাসান আর লামিসা এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। লামিসাকে সামনের রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে হাসান বলল, 'দেখো, কোথাও এক ফোঁটাও রক্ত চোখে পড়ে কি না।'

লামিসা ভাল করে মাটি পরীক্ষা করে দেখল কিন্তু রক্ত দূরের কথা, এক ফোঁটা লাল রংও চোখে পড়ল না তার। অবশেষে অবসন্ন, ক্লান্তদেহ নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল সে।

হাসান এগিয়ে এল স্ত্রীর দিকে। তার কাঁধ আলতোভাবে ছুঁয়ে বলল, 'বলেছিলাম না রক্ত কোথাও নেই। আর তন্দ্রাও এখানে আসেনি। সব তোমার মনের ভুল।'

লামিসা হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'হতেও পারে আমার ভুল। কিন্তু নিজের চোখকেই বা অবিশ্বাস করি কীভাবে?'

'যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তুমি এখন ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমাকে জলদি অফিসে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, চলো, ভেতরে চলো। মনে হয় বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হাসান লামিসাকে নিয়ে বেডরুমে ঢুকল। তাকে শুইয়ে দিয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সে।

শুয়ে শুয়ে ঘুমানোর অনেক চেষ্টা করে লামিসা, কিন্তু ঘুম আসে না দু'চোখের পাতায়। বারবারই শুধু তন্দ্রার কথা মনে পড়ে যায়। আর ঠিক তখনই ভেসে ওঠে তন্দ্রার রক্তাক্ত মুখ।

কখন ঘুমিয়েছিল, কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল বলতে পারবে না লামিসা। হঠাৎ কান্নার শব্দে বিছানায় উঠে বসল। ভাল করে লক্ষ করতেই বুঝতে পারে শব্দটা দূর থেকে নয়, বরং তারই বাড়ির কোনও ঘর থেকে আসছে। বিছানা থেকে নেমে ধীরে ধীরে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে এগুতে থাকে। ড্রইং রুমের যতই কাছাকাছি হতে থাকে, ততই শব্দের মাত্রা বাড়তে থাকে, ভেতরে প্রবেশ করতেই সে দেখতে পায় দুই সোফার মাঝে যে ফাঁকা জায়গা আছে সেখানে সাদা কাপড় পরিহিতা এক নারী দুই হাঁটু এক করে তার মধ্যে মাথা গুঁজে বসে কাঁদছে, লামিসা এগিয়ে যায় সেই মহিলার দিকে, তারপর প্রশ্ন করে, 'আপনি কাঁদছেন কেন?'

মহিলাটা লামিসার কথার কোনও জবাব দিল না, শুধু কেঁদেই চলল। হঠাৎ

সে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয় লামিসার দিকে।

চমকে ওঠে লামিসা, হাতটা তার কেমন যেন চেনা চেনা লাগে। তখনই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায় তার। বুঝতে পারে এটা তার স্বপ্নে দেখা সে-ই হাত। কথা বলতে যাবে এমন সময় অদৃশ্য হয়ে যায় মহিলাটা।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাটির কোলে ঢলে পড়ে সে, জ্ঞান হারায়।

তিন

জ্ঞান ফিরতেই লামিসা দেখল উদ্বিগ্ন মুখে তারই দিকে চেয়ে আছে হাসান। স্বামীকে দেখে কিছুটা স্বস্তি পেল সে। আপনা থেকেই তার মুখে ফুটে উঠল অনাবিল হাসি।

হাসান জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি করে বলো তো, তোমার কী হয়েছে?'

স্বামীর কথায় একটুও আশ্চর্য হলো না লামিসা। সত্যিই তার কিছু একটা হয়েছে। তবে কী হয়েছে, সেটা সে নিজেই বুঝতে পারছে না, হাসানকে কী বলবে। তাই কোনও মতে বলল, 'কই, কিছু না তো।'

'না বললে আজ ছাড়ছি না। আমি জানি তোমার কিছু না কিছু হয়েছে। আজ এতদিন ধরে তোমাকে দেখছি, কখনও এমনটা দেখিনি। সত্যি করে বলো তোমার সমস্যাটা কী?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লামিসা তার স্বপ্নের কথা পুরোটাই খুলে বলল হাসানকে। শেষে ড্রইং রুমের কথাটাও যোগ করল।

লামিসার কথা শুনতে শুনতে হাসানের মুখ কালো হয়ে গেল। যেন কেউ কালি গুলে তার মুখে ঢেলে দিয়েছে। স্ত্রীকে প্রশ্ন করল, 'কতদিন থেকে এ-সব হচ্ছে?'

'চার-পাঁচ দিন থেকে।'

'তারমানে?'

'তারমানে আমাদের বিবাহ বার্ষিকী যেদিন ছিল, তার পরদিন থেকে।'

'তুমি আমাকে এ-সব কথা আগে বলোনি কেন?'

'ভেবেছি স্বপ্ন তো স্বপ্নই, এতে ভয়েরই বা কী আছে, আর অন্যকে বলারই বা কী দরকার। সময় মত সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই তোমাকে কিছু জানাইনি।'

'ঠিক বলেছ, এ-সব তোমার মনের ভুল। সত্যি বলতে, বাড়িতে একা থাকতে থাকতে তুমি টায়ার্ড হয়ে গেছ এজন্যই এমন হচ্ছে। চলো, কাল কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি, তা হলেই সব অবসাদ দূর হবে। আর দেখবে মাথাটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন আর এ-সব চিন্তা মাথাতেও আসবে না।'

লামিসা মনে মনে খুব খুশি হয়। হাসান তাকে খুব ভালবাসে জানে সে। তাই সে নিজেকে গর্বিত ও খুব সুখী মানুষ মনে করে। নিজের ভাগ্য আর সৃষ্টিকর্তাকে

শুকরিয়া জানাতে ভুল করে না সে। আর হাসানের প্রস্তাবে সম্মতি জানাতেও দেরি করে না।

দুজনে বসে ঠিক করে, পরের দিন হাসান তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে আসবে। আসার সময় সাথে গাড়িও আনবে। তারপর দুজনে মিলে ওদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গাতে যাবে, যেখানে দুজনের প্রথম দেখা হয়েছিল।

এক অনাবিল আনন্দ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল লামিসা।

চার

ডোরবেলটা বাজতেই দরজা খুলে দিল লামিসা। ওর ধারণাই ঠিক, হাসান ফিরে এসেছে। সাথে গাড়িও এনেছে।

ভিতরে এসেই তাড়া দিল হাসান। 'কই, তোমার হলো? তাড়াতাড়ি এসো।'

লামিসা তৈরিই ছিল। হাসান ডাকতেই ব্যাগটা নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ পর হাসান এসে বসল তার পাশে। চলতে লাগল গাড়ি।

গাড়ি একটু একটু করে এগোয়, পিছনে পড়ে থাকে গাছপালা, বাড়ি-ঘর। লামিসাও চেষ্টা করে তার সকল যন্ত্রণা, সকল টেনশন পিছনে ফেলে যেতে। চেষ্টা করে সকল কিছুকেই পিছনে ফেলে একান্তে শুধু দুজনে মিলে সময় কাটাতে।

গাড়ি ক্রমাগত চলার কারণে কিছুটা ঘুম এসে গিয়েছিল লামিসার। হঠাৎ মোবাইল ফোনটা বেজে উঠতেই ঘুমঘুম ভাবটা চলে গেল, ফোন কল রিসিভ করেই চমকে উঠল সে। এ কী করে সম্ভব...

অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল হাসানের গলা, 'কী করছ তুমি? আমি একটা কাজে আটকে গেছি, তুমি তৈরি থেকো, আমি খুব তাড়াতাড়ি আসবার চেষ্টা করছি। তুমি কথা বলছ না কেন?'

লামিসার মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বের হয় না। মাথার মধ্যে যেন শত শত হাতুড়ির বাড়ি পড়তে থাকে। শুধু একটাই প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, 'যদি হাসান তাকে বেড়াতে না নিয়ে এসে থাকে, তা হলে এই মুহূর্তে গাড়িতে তার পাশেই যে বসে আছে সে কে?'

চালক হঠাৎ তার ডান হাত লামিসার দিকে বাড়িয়ে দেয়।

ভয়ে দু'হাতে চোখ বন্ধ করে লামিসা। এ যে স্বপ্নে দেখা পোড়া বীভৎস সেই হাত। তার স্বপ্ন আজ ভয়ঙ্কর সত্যি হয়ে সামনে উপস্থিত হয়েছে। হঠাৎ মাথা সহ সমস্ত শরীর কেমন যেন হালকা মনে হতে থাকে তার, বুঝতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে। চোখের উপর থেকে হাত সরাতেই সে দেখল, গাড়ি সমান গতিতে ছুটে চললেও, চালকের আসন ফাঁকা। তারপর আর কিছুই বলতে পারবে না, হঠাৎ করেই আঁধার কালো কোনও কিছু যেন তাকে গ্রাস করল।

পাঁচ

চেতনা ফিরতেই লামিসা নিজেকে মাটির উপর আবিষ্কার করল। অল্প কিছুদূরে কেউ একজন আগের মত মাথা গুঁজে বসে অনবরত কেঁদেই চলেছে। লামিসা কিছুই বুঝতে পারছে না, কেন শুধু তার সাথেই এমন হচ্ছে! কেন শুধু সে-ই এসব দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে? হাসান কেন পাচ্ছে না?

নিজের হাতে ভর দিয়ে উঠে বসে লামিসা। সাথে সাথে ক্রন্দনরতা মহিলাও তার দিকে তাকায়।

দ্বিতীয়বারের মত চমকে ওঠে লামিসা। আপনাআপনি বেরিয়ে আসে মুখ থেকে, 'তন্দ্রা, তুই! তুই এখানে কী করছিস?'

তন্দ্রা কোনও জবাব দেয় না, কাঁদতেই থাকে।

লামিসা আবার প্রশ্ন করে, 'তোর না আমার বিবাহ বার্ষিকীর দিন আমার ওখানে যাবার কথা ছিল? গেলি না কেন?'

এবার কথা বলে তন্দ্রা, 'আমি তো তোর ওখানেই যাবার জন্য এসেছিলাম। কিন্তু আমাকে যেতে দিলি না।'

'কে যেতে দিল না?'

'দেখ লামিসা, তুই তো আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ, আমার প্রিয় বান্ধবী, তাই না?'

'সে তো তুই-ই ভাল বলতে পারবি।'

'তুই যেমন তোর সবকথা আমাকে বলতি, আমিও তো আমার ছোট বড় সব ঘটনা তোর সাথে শেয়ার করতাম। করতাম কিনা তুই-ই বল?'

'হ্যাঁ, তা করতিস। কিন্তু এর সাথে তোর না আসার সম্বন্ধ কী?'

'আছে রে, আছে। আমি তোকে সব কিছু বললেও আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তোকে বলিনি। সত্যি বলতে কী, এই পৃথিবীর কেউই জানে না সেই ঘটনা। আর জানবেও না।'

'কী সেই ঘটনা?'

'তা হলে শোন। গত বছর যখন প্যাকেজ ট্যুরে দার্জিলিং গিয়েছিলাম তখন আব্বু কিংবা আম্মু কেউই আমার সাথে যেতে পারেননি তাদের কাজের চাপের কারণে, তাই আমাকে একাই যেতে হয়েছিল। কিন্তু দেখলাম একা শুধু আমি যাইনি, এরকম আরও অনেক ছেলেমেয়ে আছে সেখানে। কাজেই যাত্রাটা খুব একটা খারাপ হলো না। পৌঁছানোর কয়েকদিনের মধ্যে এরকম কয়েকজনের সাথে আমার পরিচয় হলো। হলো বন্ধুত্ব। এদের মধ্যে স্পেশাল ছিল একজন। কিরণ। ও যেমন সুন্দর দেখতে, তেমন ওর ব্যক্তিত্ব। আকর্ষণীয়। অল্প দিনেই এই দুর্বলতা কখন যে ভালবাসায় পরিণত হলো বলতেই পারব না। অপর পক্ষ

থেকেও এর প্রতি সমর্থন ছিল, ফলে খুব তাড়াতাড়ি শুরু হলো আমাদের নতুন পথে পথচলা। এমনই চলার পথে কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে আমি আমার সব কিছু হারালাম ওর কাছে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী, হঠাৎ একদিন আমি আমার মধ্যে এক নতুনের উপস্থিতি অনুভব করলাম। কিন্তু ওকে যখন সব কথা খুলে বললাম মুহূর্তেই ও কেমন যেন পাল্টে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন লাপাত্তা হয়ে গেল। এদিক ওদিক কত খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও ওর কোনও খবর পেলাম না।'

'তারপর।'

'আমি ওকে খুঁজে বের করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, কিন্তু যখন কোনও ভাবেই কিছু হলো না, তখন বাধ্য হয়েই নিজের মনের বিরুদ্ধে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম নতুন কুঁড়িটাকে, ফুল হয়ে ফোটার আগেই।'

'এটুকু বুঝলাম, কিন্তু এখনও তোর না আসার কারণ বুঝতে পারিনি।'

'বাকিটুকু শুনলেই বুঝতে পারবি। তোর কি মনে আছে তোর বিয়ের আসর থেকে কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ চলে এসেছিলাম?'

'মনে আছে।'

'তোর কি কখনও মনে হয়নি, যে আমি তোর বিয়ে নিয়ে এত আনন্দিত ছিলাম, সেই আমিই কেন বিয়ের মাঝপথেই চলে এলাম।'

'তাই তো। আমি কখনও এভাবে চিন্তা করিনি। বল না; তুই কেন চলে এসেছিলি?'

'আসলে আমি নিজের ইচ্ছায় আসিনি। আমাকে ফিরতে বাধ্য করেছিল।'

'বাধ্য করেছিল! কে?'

'কিরণ।'

'কিরণ! সে কেন তোকে বাধ্য করবে? আর আমাদের বাড়িতে ও আসবে কোথা থেকে? ওই নামে কাউকে তো আমরা চিনি না।'

'তুই শুনলে হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবি না, কিরণ আর কেউ নয়, তোর স্বামী। যার বর্তমান নাম আরাফাত হাসান।'

'কি বলছিস্ তুই!'

'বললাম না, তুই বিশ্বাস করতে চাইবি না। কিন্তু এটাই সত্যি, এটাই বাস্তব। কিরণ আর হাসান একই মানুষ। বিয়ের আসরেই ওকে দেখে আমি চিনে ফেলেছিলাম, মনে হয় সে-ও আমাকে দেখেছিল। আমি ভেবে কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। কী করব ভাবতে গিয়েই মাথার মধ্যে বারবার তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল, কারণ যা-ই করি না কেন, তাতে ক্ষতি হত তোর। আর আমি কেমন করে তোর ক্ষতি করব, বল? তুই হলে কি পারতিস আমার ক্ষতি করতে? তাই চলে গিয়েছিলাম।'

'তাই বলে তুই ওকে ছেড়ে দিলি?'

'না রে, শুধু ছেড়েই দিইনি, মাফও করে দিয়েছি। কারণ ওর ওপর প্রতিশোধ

নিয়ে আমি আমার বন্ধুকে দুঃখী দেখতে পারব না।'

'না, তা হয় না। ও দোষী। শাস্তি ওকে পেতেই হবে। চল, আমরা দু'জন মিলে ওকে শাস্তি দেব।'

'এখন আর তা হয় না, রে। আমার আর সে ক্ষমতা নেই।'

'কেন নেই?'

'সেদিন যখন তোর ওখানে যাবার জন্যে ট্রেন থেকে নেমে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি, হঠাৎ দেখি হাসান সেখানে উপস্থিত। আমি ওকে দেখেও না দেখার ভান করে রইলাম। কিন্তু ও সরাসরি আমার কাছে এসে বলল, তুই নাকি আমাকে নিয়ে যাবার জন্য ওকে পাঠিয়েছিস। তোরা নাকি হঠাৎ করে স্থান পরিবর্তন করে কোনও হোটেলে তোদের বিবাহ বার্ষিকী পালন করবি। ওর সাথে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, কথা বলতেও ঘৃণা লাগছিল। কিন্তু কী করব, তোর কথা ভেবে তারপরেও গাড়িতে চড়তে বাধ্য হলাম।'

'কিন্তু আমাদের মধ্যে তো জায়গা বদল করার ব্যাপারে কোনও আলোচনা হয়নি কখনও।'

'হ্যাঁ, সেটা আমি পরে জেনেছি। গাড়ি স্টেশন থেকে সরাসরি এখানে এসে থামল।'

'এখানে!'

'হ্যাঁ, এখানে। তখনও বুঝিনি ওর মনে কী ছিল। গাড়ি থেকে নামতেই সামনে একটা বড় গর্ত দেখতে পেলাম। এবার বুঝতে বাকি রইল না ওর মনের কথা। আমি কত বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আমার আর ওর ব্যাপারে কোন কিছুই তোকে জানাব না, তবুও সে আমার কথা শুনল না। অশ্রাব্য ভাষায় মুখে যা আসল তাই-ই বলল আমাকে। এক পর্যায়ে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল আসল কথা, বিয়ে করা তার নাকি ব্যবসা। জৈবিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি টাকাও আসে। তার কাছে নারী মানে খেলনা বৈ অন্য কিছু না।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী, কথাগুলো শুনে আমার মাথার মধ্যে যেন কয়েক হাজার আগ্নেয়গিরি জ্বলে উঠল। প্রতিবাদ করলাম ওর কথায়, হুমকিও দিলাম তোকে সব বলে দেব, সেই সাথে জীবনের শেষ ভুলটাও করে বসলাম। আচমকা লোহার মোটা রড দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করল হাসান। তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে গেলে আমাকে গর্তে ফেলে দিল। আর পেট্রোলে গোসল করিয়ে ধরিয়ে দিল আগুন।'

'কী বলছিস তুই?'

'হ্যাঁ রে, এটাই সত্যি, এটাই বাস্তবতা। আ-মি জীবিত নেই রে। এখন আমি আত্মা। দেহ ছাড়লেও যার এ পৃথিবী থেকে মুক্তি মেলেনি।'

'এ হতে পারে না। তুই মরতে পারিস না।'

'না রে, দুঃখ করিস না। বাস্তবতা মেনে নে। আমার পায়ের নীচে যে ঢিবি রয়েছে তার মধ্যেই আমার আধপোড়া দেহাংশ রয়েছে এখনও।'

'তুই চিন্তা করিস না। তোর সাথে যে অন্যায় হয়েছে তার শাস্তি অন্যায়কারী পাবেই পাবে। আমি ব্যবস্থা করব সেই শাস্তির।'

'লামিসা? তুমি এখানে...'

চমকে ওঠে লামিসা। সামনে তাকায় সে, দেখে তন্দ্রা নেই, বরং ফাঁকা জায়গায় কিছুটা ঢিবির মত রয়েছে। এবার শব্দের উৎসের দিক, অর্থাৎ পেছনের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় সে। দেখতে পায় হাসান দাঁড়িয়ে আছে। ওর দৃষ্টিতে এমন কিছু একটা আছে, যা অস্বস্তিতে ফেলে দেয় লামিসাকে।

লামিসা হাসবার চেষ্টা করে, তারপর বলে, 'তু-মি, তুমি এখানে?'

'এ প্রশ্ন তো আমারও। আমি না তোমাকে বাসায় থাকতে বলেছিলাম, এক সাথে দুজনে এখানে আসব বলে?'

'আসলে তোমার ফোন যখন এল ততক্ষণে আমি তৈরি হয়েই ছিলাম। ভাবলাম তোমার যখন দেরিই আছে, তখন আমি না হয় একাই চলে আসি। কিছুক্ষণ একা, আর কিছুক্ষণ দুজনে মিলে সময় কাটানো যাবে। এতে আমার মন আরও ভাল হয়ে যাবে। দেখ না, আমি এখন কতটা ফ্রেশ।'

লামিসার কথায় হাসান খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারল না, তবুও হেসে বলল, 'ঠিক আছে, চলো ওই গাছটার নীচে গিয়ে বসি।'

'না, এখন আর বসতে ভাল লাগছে না। অনেকক্ষণ এসেছি তো। চলো বাসায় ফিরে যাই।'

'কিন্তু আমি যে কত কষ্টে সময় বের করে এলাম, তোমার সাথে একান্তে কিছু সময় কাটাব বলে...'

'দেখো, এমন সময় আবার পাওয়া যাবে, অন্য আরেকদিন না হয় আবার আসব। আজ আর থাকতে মন চাইছে না, বোরিং লাগছে। আজ চলো, প্লিজ।'

স্ত্রীর অনুরোধ ফেলতে পারল না হাসান। অবশেষে ফিরে চলল। তবে স্ত্রীকে দেখে বেশ খুশিই হলো সে, আজ কয়েক দিন পর আবার আগের মত উচ্ছল দেখাচ্ছে তাকে। ব্যস, লামিসা যেন সবসময় এমনই থাকে এটাই তার এক মাত্র চাওয়া।

ছয়

খুব সকালে মাটি খোঁড়ার মত সরঞ্জাম নিয়ে ঢিবিটার কাছে চলে এল লামিসা। প্রথমে কাউকে আনতে চেয়েছিল সঙ্গে, কিন্তু লোক জানাজানির ভয়ে ছিল, তাই সে কাউকেই সাথে আনেনি, যত কষ্টই হোক, একাই সে তন্দ্রার লাশ তুলবে, তারপর পুলিশকে ফোন করে হাসানকে ধরিয়ে দেবে। আর হাসান যেন তার প্রাপ্য সাজা পায়, আর কোনও ভাবেই মুক্তি না মেলে, তার ব্যবস্থা করবে।

অল্প একটু মাটি কুপিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ল লামিসা। বসে পড়ল গর্তটার

পাশে। কিন্তু ওর মন গ্রাহ্য করল না শারীরিক এই অবসাদ। বরং ভেতর থেকে কেউ বলল, আর একটু, আর একটু, পারতেই হবে তোকে।

অবশেষে গর্তে তন্দ্রার অর্ধপোড়া লাশ দেখতে পেল লামিসা। সাথে সাথে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

ঘাড়ের উপর পরিচিত স্পর্শ পেয়ে ঘুরে তাকাল লামিসা। এবং জমে গেল। হাসান এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছে। চোখজোড়া লোভী কুকুরের মত জ্বলজ্বল করছে।

হাসান চিৎকার করে বলল, 'আমি জানতাম তুমি ঠিকই জেনে ফেলবে তন্দ্রার কথা। আর সেই সাথে ডেকে আনবে নিজের মৃত্যু। তোমার মত মেয়েদের আমি এজন্যেই সহ্য করতে পারি না, কারণ তোমরা কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে ঠিক বিপদের কাছে চলে আসো।'

'তুমি যে এতবড় ধোঁকাবাজ, আগে জানলে কখনোই তোমার সাথে সম্পর্ক করতাম না।'

'তোমার তা হলে অজানা কিছুই নেই? গুড, ভেরি গুড। এবার এও জেনে নাও, রোড অ্যাক্সিডেন্টে তোমার বাবার মৃত্যুটাও আমারই সাজানো ঘটনা ছিল, বুড়ো আমার সত্যিকারের পরিচয় জেনে ফেলেছিল, তাই বাধ্য হয়েই...'

হাসানের কথা শেষ না হতেই লামিসা মাটি কাটার যন্ত্রটা নিয়ে হামলা চালাল হাসানকে। কিন্তু তার কাছে পৌছানোর আগেই কপালে ছোট্ট একটা গর্ত নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

পিস্তলটা পকেটে রেখে ঘুরে দাঁড়াল হাসান। লামিসাকে টানতে টানতে গর্তের ভেতরে ফেলে দিল। তারপর লাশ পেট্রোলে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল তাতে।

লাশ ভস্মীভূত না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখল হাসান। তারপর মাটি চাপা দিয়ে ফিরে এল বাড়ি।

সাত

বিছানার উপর লাফিয়ে উঠে বসল হাসান। স্বপ্নটা আবার দেখেছে সে। গত সাতদিন ধরে স্বপ্নটা তাকে জ্বালিয়ে মারছে, চোখ বন্ধ করলেই সে দেখতে পায়, ঘন কুয়াশার ওপার থেকে কে যেন ডাকতে ডাকতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু কাছে আসতেই চমকে ওঠে সে। কারও অবয়ব যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করবে না কেউ। সারা মুখ শরীর যেন এইমাত্র উনুনে ঝলসে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

স্বপ্ন থেকে বাঁচতে যদিও বা চোখ খোলে সে, তখনই শুরু হয় আরেক অত্যাচার। চারপাশ থেকে ভেসে আসে একাধিক কণ্ঠের অনবরত ক্রন্দন ধ্বনি, যা চারপাশের পরিবেশকে অসহ্য করে তোলে।

এভাবেই গত সাত দিন ধরে সে না পারছে জেগে থাকতে, না পারছে ঘুমাতে। এমনকী ঠিকমত খেতেও পারছে না, যতবার খাবার খেতে গেছে ততবারই তার মধ্যে গুয়ের পোকা, গুবরে পোকা আর আবর্জনা পেয়েছে। খেতে না পেরে আজ সে মৃতপ্রায়।

কায়মনোবাক্যে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে হাসান। গত সাত দিনে অন্তত ত্রিশবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু মৃত্যুও যেন তার কাছে না আসার প্রতিজ্ঞা করেছে। তা না হলে যতবারই সে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে চেয়েছে ততবারই দেহ বাইরে না এসে ভেতরের দিকেই আছড়ে পড়েছে। পিস্তল থেকে বুলেট বেরিয়েও আবার যথাস্থানে ফিরে গেছে, আর ছুরি শরীর স্পর্শ করা মাত্র শোলার মত ভেঙে গেছে।

অবশেষে সকল প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছে সে। এখন ইজি চেয়ারেই সারাদিন বসে থাকে। জীবন্মৃতের মাঝামাঝি তার অবস্থান। তবুও মৃত্যু আসে না।

একটাই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে তার মনে, 'কবে শেষ হবে এই নরক যন্ত্রণা?'

তার সামনে বসে থাকা লামিসা আর তন্দ্রা হেসে ওঠে উচ্চ স্বরে।

অমিত কুমার চক্রবর্ত্তী

জাদুকর

আরে, এখানে এই দোকানটা এল কোত্থেকে! তাজ্জব ব্যাপার তো। পুরানো এয়ারপোর্ট রোডের র‍্যাঙ্গস কর্পোরেশনের শো-রুম আর কারুপণ্যের মাঝখানে কি কোনকালে কোন ম্যাজিকের দোকান ছিল! ভুল দেখছি না তো? ডান হাত দিয়ে চোখ রগড়ালাম। কারণ বাঁ হাত ধরে আছে সুসময়। তাও তো না। ওই তো 'জাদুবিপণী' লেখা সাইন বোর্ডটি জ্বলজ্বল করছে। ভোজবাজির মত উদয় হয়েছে যেন। বাইরে থেকেও দেখা যাচ্ছে কাঁচের শোকেসে সাজানো হরেক রকমের জাদু সামগ্রী। একটা বোর্ডের ওপর লেখা রয়েছে–'যে কোন একটা জিনিস কিনে বন্ধুদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দাও'। ঢাকা শহরে ম্যাজিকের, মানে জাদুর দোকান জনমেও শুনিনি। আমার মাথায় গোলমাল দেখা দেয়নি তো? হঠাৎ বাঁ হাতে মৃদু টান পড়তে সংবিৎ ফিরে পেলাম।

'বাবা, ওই জাদু দোকানটায় চলো না,' অনুরোধ করল সুসময়।

অদ্ভুত দোকানটা সম্পর্কে আমারও ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। তাই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম ওটার কাছে। কাঁচের ওপর আঙুল রেখে সুসময় বলল, 'জাদুর ডিম ওটা বুঝেছ বাবা, অদৃশ্য হয়ে যায় যখন তখন। আমরা বড়লোক হলে ওটা কিনে নিতাম।' আরেকটা পুতুল দেখিয়ে বলল, 'এটা কাঁদুনে পুতুল। একেবারে জীবন্ত মনে হচ্ছে, তাই না বাবা? ওটাও কিনতাম।'

'এতসব তুই কোত্থেকে জানলি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'বইতে পড়েছি,' বলেই সে আবার কথার তুবড়ি ছোটাল। 'ওই যে সাদা চাকতি, ওটার নীচে কিছু রাখলেই অদৃশ্য হয়ে যায়। আর ওই তোমার পয়সাটা ফুঁ দিলেই মিলিয়ে যায় বাতাসে।'

ছেলেটার স্বভাব হয়েছে একেবারে ওর মায়ের মত। কোন কিছুর জন্য বায়না ধরে, খাবার দাবার নিয়ে লোভীপনা করে কিংবা জিদ করে আমাকে জ্বালায়নি কখনও। এসব করলে মা মরা ছেলেটিকে নিয়ে হয়তো ভীষণ ফ্যাসাদে পড়ে যেতাম। দশ বছর বয়স হলেও আমার আর্থিক অবস্থাটাও ভালই বোঝে। এই যে এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে এতসব দেখছে তবু কোন কিছুর জন্য বায়না তো দূরে থাক দোকানের ভেতর ঢোকার জন্যও অনুরোধ করেনি। ওর প্রতি অদ্ভুত এক স্নেহে ভরে গেল আমার মন। ভাবলাম, যাকগে কিছু কিনে দিতে না পারি দোকানের ভেতরটা দেখিয়ে আনি।

ভেতরে ঢুকতেই স্নিগ্ধ হাওয়ায় জুড়িয়ে গেল শরীর। তবে হাওয়া বাতাসের কোন উৎস চোখে পড়ল না। ছোট্ট দোকানের ভেতরটা খুবই সুন্দর। হালকা নীলচে আলোয় সব কিছু স্বপ্নীল মনে হলো। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই মিষ্টি

টুং-টাং আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দরজা। কিন্তু টুং-টাং বাজনাটা রয়েই গেল। কাউন্টারে কাউকে না দেখে এক জায়গায় দাঁড়িয়েই আজব জিনিসগুলো দেখতে লাগলাম বাপবেটা।

কাউন্টারের একপাশে গম্ভীর মুখে বসে রয়েছে একটি কাগুজে বাঘ। জুলজুলে চোখ মেলে সে অনবরত নাড়িয়ে যাচ্ছে মাথাটা। তাকে সাজানো রয়েছে অসংখ্য কৃষ্টাল দ্রব্য। চীনেমাটির একটা হাতে ধরে রয়েছে কতগুলো ম্যাজিক তাস। বিভিন্ন সাইজের ম্যাজিকমাছের অ্যাকুইরিয়াম, ম্যাজিক টুপি। আরও যে কত কী তা বলে শেষ করা যাবে না।

এতসব জিনিস দেখেও কেনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল না সুসময়। একটা জাদুর বোতল দেখিয়ে বলল, 'বড় হয়ে অনেক টাকা হলে এটাও কিনব। জিনিসগুলোর গায়ে মূল্য তালিকা লেখা দেখে আশ্বস্ত হলাম। দু'একটা জিনিস কিনে দেবার মত পয়সা আমার পকেটে আছে। তাই বললাম ওকে, 'ধর, এখুনি যদি কিনে ফেলিস তা হলে কী করবি?'

খুশির ঝিলিক খেলে গেল ওর চোখেমুখে, 'চান্দাকে দেখাব।'

'কিন্তু তোর জন্মদিনের তো এখনও সোয়াশো দিন বাকি,' মজা করার জন্য কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বললাম আমি।

জবাব দিল না। তবে আমার আঙুলে ওর মুঠোর চাপটা একটু বেড়ে গেল। হঠাৎ মেঝেতে চোখ পড়তেই হা-হা করে হেসে উঠলাম আমি। খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সুসময়ও। মেঝেয় আটকানো জাদুর আয়নায় কিম্ভূত সব প্রতিবিম্ব পড়েছে দুজনের। একটু নড়াচড়া করতেই বেঁটে, মোটা, লম্বা, রোগা নানাধরনের চেহারা হতে লাগল। আমাদের দমফাটা হাসির মধ্যেই কাউন্টারের পেছন থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। ওকে দেখেই আমার হাসি থেমে গেল। অদ্ভুত হাস্যকর চেহারা লোকটার। গায়ের রঙ তামাটে। একটা কান আরেকটার চেয়ে বড়। অস্বাভাবিক চোখা থুতনি, মাথায় অদ্ভুত একটা রোমশ টুপি। সে যে এই দোকানের মালিক তাতে কোন সন্দেহ রইল না আমার।

লম্বা লম্বা সরু দশটি আঙুল কাউন্টারের কাঁচের ওপর মেলে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, কী দেখাব?'

'ব্যাটা ভাঁড় এতক্ষণ ছিল কোথায়? যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে।' তবে একথাটা মনে মনে বলে মুখে বললাম, 'সহজ টাইপের কিছু ম্যাজিকের জিনিস দেখান।'

'সহজ মানে? হাত সাফাইয়ের ম্যাজিক, না কলের? ঘরোয়া না মঞ্চের?'

'মজা পাওয়ার মত কিছু হলেই চলবে,' মাঝপথেই তার কথার ফুলঝুরি থামিয়ে দিয়ে বললাম আমি।

'হুম-ম!' বলে মাথা চুলকাতে শুরু করল সে। যেন ভারি ভাবনায় পড়ে গেছে। চুলকাতে চুলকাতেই তার মাথা থেকে বেরিয়ে এল একটা কাঁচের বল। তারপর ভিজে বেড়ালের মত মুখ করে মিনমিনিয়ে বলল, 'এমন হলে চলবে?'

এ ধরনের হাত সাফাইয়ের ম্যাজিক বহু দেখেছি। তবে এরটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ওর ভঙ্গি দেখে হাসতে হাসতে বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ চলবে।'

আমার সম্মতি নিয়ে ওটা হাতে নিতে হাসি মুখে হাত বাড়িয়েই থমকে গেল সুসময়। কোথায় বল। লোকটার হাত তো খালি!

মুচকি হেসে দোকান্দার বলল, 'বাবু, তোমার পকেটটা চেক করো তো।'

কাছের বলটা সুসময়ের পকেট থেকে বেরুনোয় লজ্জিত ভঙ্গিতে সে হাসল।

'এটার দাম কত?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ছি-ছি, কাঁচের বলের আবার দাম কী,' বিনয়ে বিগলিত কণ্ঠে বলল সে। 'ওটা ফ্রী। দেখুন না, পাচ্ছিও তো মাগনাই,' বলেই কনুই, গলা, ঘাড় থেকে আরও তিনটা বল বের করে সাজিয়ে রাখল কাউন্টারে। সুসময় মুগ্ধ চোখে ওগুলোর দিকে তাকাতেই সে একগাল হেসে বলল, 'নেবে? নিয়ে নাও? তা হলে এটাই বা বাদ যায় কেন?' বলে মুখের ভেতর থেকেও বের করে আনল আরেকটি বল। কিছু দেখে লোভীর মত হামলে পড়তে নেই–মায়ের উপদেশটা মনে রেখেছে সুসময়। তাই বলগুলোর দিকে হাত না বাড়িয়ে আরও জাদু দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে তাকাল লোকটার দিকে।

'টুপিটা দেখছেন না?' নিজের মাথার টুপিটি দেখিয়ে বলল সে। 'খাবার-দাবার থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সবই এটার ভেতর থেকে পাই। বুঝলেন স্যর, একেবারে খাঁটি জিনিস। ভেজাল আমার মোটেই সয় না। ওসব লোক ঠকানোর কারবার আমি করি না।' তারপর সুসময়কে বলল, 'ভারি ভাল ছেলে তুমি। শুধু ভাল ছেলে মেয়েরাই এই দোকানে ঢুকতে পারে।'

বাহ্, সুসময় যে ভাল ছেলে লোকটা তা-ও জানে দেখছি। তার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হলো না আমার ছেলেটি। শুধু মিষ্টি হেসে বলল, 'থ্যাঙ্কু, আঙ্কল!'

সহসা ঘ্যানঘেনে নাকি কান্না শুনে বাইরে তাকালাম। কাঁচের ভেতর দিয়েই দেখলাম, হাবলু-গাবলু এক মোটকু ছেলে ঢুকতে চাইছে দোকানের ভেতর। 'আহ্ শুভ, দেখতে পাচ্ছ না দোকানটা বন্ধ,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল ছেলেটির মা।

'দরজা তো খোলাই,' দোকানদারকে বললাম আমি। 'ওরা ঢুকতে পারছে না কেন?'

'বললামই তো, ভাল ছেলেমেয়েরা ছাড়া ঢুকতে পারে না,' ঝাঁঝাল স্বরে বলল সে। 'লোভী ছেলেটি সারাক্ষণ মাকে জ্বালায়। বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি করে। ঠিকমত লেখাপড়াও করতে চায় না। নাম শুভ হলে কী, স্বভাবটা একেবারেই অশুভ!'

'এত কিছু জানলেন কী করে?' অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'ওকে চেনেন নাকি?'

'আমি যে জাদুকর তা ভুলে যাচ্ছেন কেন?' চোখ মটকে বলল লোকটা।

তার কথায় পাত্তা না দিয়ে দরজা খুলতে গেলাম আমি। টানাটানি করে দেখি সত্যি বন্ধ। 'আশ্চর্য তো! বন্ধ হলো কী করে?'

'জাদুর জোরে,' দু'আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে বলল সে। তার আঙুলে আঙুলে ঘষা খেয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ল রঙ বেরঙের আলো। ঠিক যেন তারাবাজি।

হতবাক আমাকে পাত্তা না দিয়ে সুসময়ের দিকে ঝুঁকে সে বলল, 'বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দেবার মত ম্যাজিক বড় হয়ে কিনতে চেয়েছিলে না? সেগুলো এখনই তোমার পকেটে পাবে। বলেই শরীরটাকে রাবারের মত বাঁকিয়ে টেবিল টপকে গিয়ে সুসময়ের পকেট থেকে অনায়াসে বের করে আনল সে জাদুর বাক্স।

এতক্ষণ খেয়ালই করিনি লোকটার শারীরিক গঠন। ঢ্যাঙা আর লিকলিকে শরীরটা নমনীয় রাবারের মত। যেন যা ইচ্ছা তাই করা যায়। আমার চক্ষু চড়কগাছ হতে তখনও অনেক বাকি। ম্যাজিক বক্স হাতে নিয়ে 'কাগজ' বলে হাঁক পারতেই তার টুপি থেকে বেরিয়ে এল প্যাকিঙ কাগজ। 'দড়ি' বলে মুখ হাঁ করতেই মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দড়ির আগা। সেটা ধরে টানতে শুরু করল সে। টানছে তো টানছেই। দড়ির যেন শেষ নেই। বাক্স বাঁধা শেষ হতেই কোঁৎ করে গিলে ফেলল যেন দড়ির কুণ্ডলীটা। তারপর করল কী, এক পুতুলের নাকে নিজের নাক দিয়ে দিল এক ঘষা। অমনি জ্বলে উঠল তার নাকটা। সেই জ্বলন্ত নাকের শিখায় নিজের আঙুল ধরতেই দড়ির গিঁটে টপ টপ করে লাল গালা পড়তে লাগল। যেন ভয় পেতেও ভুলে গেছি আমি। প্যাক করা শেষ হতেই সেটা সুসময়ের হাতে দিয়ে সে বলল, 'ম্যাজিক ডিমগুলোও সুন্দর তাই না? তা-ও পাবে।' বলেই আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল কয়েকটা ডিম। কাঁদুনে পুতুলও বেরুল আমার পকেট থেকেই। সেগুলোও সে একইভাবে প্যাক করে তুলে দিল সুসময়ের হাতে। আর সুসময়ও সেগুলো নির্বিকারভাবে নিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে রইল। ভয় তো নয়ই, বরং ভীষণ মজা পাচ্ছে, তা ওর মুখ দেখেই টের পেলাম আমি। জাদুকর বলেই কি তার ভুতুড়ে কাজকারবারেও ভয় পেতে নেই? ছেলেটার ওপর রাগই হলো আমার।

আমার পাঞ্জাবির ভেতর তুলতুলে কিছুর নড়াচড়ায় চমকে উঠে ঝাড়া দিতেই এক পায়রা বেরুল ফড়ফড়িয়ে। সেটা উড়ে গিয়ে ঢুকল জাদুর টুপির ভেতর।

'অ্যাই উল্লুক, ডিম পাড়ার আর জায়গা পেলি না,' বলে টুপিটা ঝাড়া দিতেই তার হাতে টপাটপ তিনটা ডিম পড়ল। আবার ঝাড়া দিল। বেরোল মার্বেল। ঝাড়তেই লাগল সে আর অনবরত বেরোতেই থাকল ঘড়ি, কাঁচের বল, আর আরও বিচিত্র সব জিনিস। ক্রমশ সে হারিয়ে গেল ওসব জিনিসের আড়ালে।

এরপর তার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আরে ভাই, আপনার টুপির ম্যাজিক কি শেষ হলো?' উত্তর না পেয়ে আবার বললাম, 'ক্যাশমেমোটা দেন না। বিদায় হই।' তবু নিরুত্তর দেখে সুসময়কে বললাম, 'চলো তো দেখি কাউন্টারের পেছনে গিয়ে।'

পেছনে গিয়ে দেখি কোথায় জাদুকর দোকানি! তার জায়গায় বসে রয়েছে এক ট্যারা খরগোশ। তার ভাবখানা দেখে মনে হলো, কঠিন সমস্যায় পড়েছে, ভেবে আর কূল-কিনারা পাচ্ছে না। আমি ধরতে যেতেই তিনলাফে সরে গেল আমার আয়ত্তের বাইরে।

'বাবা,' ফিসফিসিয়ে বলল সুসময়, 'খুব সুন্দর দোকান। জাদুকরও ভীষণ ভাল। আমার খুউব ভাল লাগছে।'

ওর খুশিতে আমার মনের ভার গেল। যাক, ছেলেটা তা হলে মজা পাচ্ছে। ওকে খুশি করার জন্য কিছুই করতে পারি না। সামান্য বেতনে চাকরি করি। নয়-দশ ঘণ্টা খাটতে হয় অফিসে। ক্লান্ত শরীরে বাসায় ফিরে আর কিছু করার মত মানসিক অবস্থা থাকে না। তবু ছেলেটা আম্যকে কখনও কোন অভিযোগ করেনি। সে দিনটি ছিল ওর মায়ের মৃত্যু দিন। বাসায় ঢুকতেই দেখি উদাস চোখে বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছেলেটা। বুকের ভেতর হু-হু করে উঠল। তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম ওকে নিয়ে। হাঁটতে চাইল আমার হাত ধরে। ভাবলাম, তা হলে সংসদ ভবনেই যাই। হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসেই চোখে পড়ল এই অদ্ভুত দোকানটা।

খুট করে একটা শব্দ হতেই চমকে তাকালাম। দেখি কাউন্টার থেকে লম্বা একটা হাত বেরিয়ে ভেতরের একটা দরজা খুলে ফেলল। আমি শিওর, দরজাটা এখানে ছিল না। ভয়ে গা শিরশির করে উঠল। ভাগ্যিস সুসময় দেখেনি। ওর নজর তখন খরগোশটার দিকে। 'খরগোশ সোনা, তুমি আমাকে একটা জাদু দেখাবে না,' সুসময়ের কথার জবাবে সে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। পরক্ষণেই উঁকি দিল জাদুকরের হাসি হাসি মুখ।

'স্যর, শো-রুমটা দেখবেন না?' কৌতুকের স্বরে জিজ্ঞেস করল সে।

এত নির্ভেজাল জাদু আমি ঠিক উপভোগ করতে পারছিলাম না। তাই বললাম, 'আর তো সময় নেই আমার।'

অনুনয়ভরা চোখে আমার দিকে তাকাল সুসময়। দেখতে চায় ও। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখি কোথায় দরজা। আমরা দাঁড়িয়ে আছি শো রুমের ভেতরেই। আমার হতবাক মুখশ্রী দেখে জাদুকর যেন মজা পেল। বলল, 'সব স্যর, আসল জাদু। নকল বলে এখানে কিছু পাবেন না।'

'ব্যাটা চালবাজ!' গালিটা অবশ্য মনেমনেই দিয়েছিলাম। হঠাৎ পাঞ্জাবির খুঁটে টান পড়তে তাকিয়ে দেখি একটা নেড়ি কুত্তা, কামড়ে ধরেছে আমার পাঞ্জাবি। ভয়ে নড়াচড়া করতে ভুলে গেলাম আমি। ওটার লেজ ধরে টান লাগাল দোকানি, তবু কামড় ছাড়ে না দেখে মুখ চেপে ধরে খুলল সে। তারপর লেজ ধরে এক ঘুরনি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল কাউন্টারের পেছনে। কাণ্ড দেখে জোরে হেসে উঠল সুসময়। রেগে গিয়ে আমি বললাম দোকানিকে, 'এ ধরনের কৌতুক আমি পছন্দ করি না।'

আমার রাগ দেখে লজ্জা পাওয়া দূরে থাক খিক্‌খিক্ করে সে হেসে বলল, 'স্যর ও আমার দোকানের কেউ না। আপনার সঙ্গেই ঢুকেছে বিটকেলটা।' এরপর সুসময়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'গুড বয়, তুমি কি আরও জাদু দেখতে চাও?'

'ওটা কি ম্যাজিক সোর্ড?' জিজ্ঞেস করল সুসময়।

'হ্যাঁ, ভাঙে না, বাঁকা হয় না। আঙুলও কাটে না। এটা সঙ্গে থাকলে দুষ্টু ছেলেরা কিছুই করতে পারে না। নেবে?'

আমার দিকে তাকাল সুসময়। আমি দাম জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু আমার কথায় কান না দিয়ে লোকটা ওকে পটাতে শুরু করল। পটিয়ে অবশ্য ফেলেছেও।

কারণ অজান্তেই ছেলে আমার হাত ছেড়ে দোকানির হাত ধরে ফেলেছে। এত সহজেই ওই বিটলে জাদুকরের সঙ্গে ওর ভাব হতে দেখে একটু হিংসেও হলো আমার। নেহাৎ মজা পাচ্ছে দেখে আমি ওদের পেছন পেছন চলতে লাগলাম। শো রুমটার যেন আর শেষ নেই। দুপাশ দিয়ে টানা লম্বা তাক। আজব আজব সব জিনিসে ভরা সেগুলো। অদ্ভুত চেহারার সব সেলস্ ম্যানদেরও দেখলাম। তারা জুলজুলে চোখে দেখতে লাগল আমাদের।

'যেমন মালিক তেমন তার কর্মচারী,' মনে মনে বললাম আমি।

সারি সারি আয়নাগুলোতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেও চমকে চমকে উঠছি। বিস্ময়কর সব কাণ্ডকারখানা দেখে ধাঁধা লেগে গেল আমার। বুঝতেই পারলাম না, ঢুকলাম কোনদিক দিয়ে, আর বেরুবই বা কোন পথ দিয়ে।

ইঞ্জিন নেই, চালক নেই এমন এক ট্রেনে সুসময়কে বসিয়ে দিতেই ঝিক্ ঝিক্ করে চলতে শুরু করল। এরপর এক আশ্চর্য সুন্দর প্লাস্টিকের বাক্স বের করল জাদুকর। অংবং করে কী এক মন্ত্র পড়তেই খুলে গেল বাক্সের ডালা, স্প্রিঙের মত লাফিয়ে বেরোল এক ঝাঁক সশস্ত্র সৈনিক, মার্চ করে হাঁটতে শুরু করল। চোখের পলকে চলন্ত সৈন্যগুলোকে এক জায়গায় করে বাক্সে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিল বাক্সের ডালা।

'মন্ত্র পড়ে জ্যান্ত করতে পারলে ওরা তোমার হয়ে যাবে,' সুসময়কে বলল জাদুকর।

অসম্ভব! ভাবলাম আমি। কিন্তু আমাকে হতবাক করে সুসময় সেই মন্ত্র আওড়ে গেল গড়গড় করে। প্রশংসার চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'গুড, ভেরি গুড। এটা এখন তোমার!' বলেই বাক্সটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল। শূন্যেই সেটা প্যাক হয়ে ফিতা দিয়ে বাঁধাও হয়ে গেল। এমনকী লেবেলের ওপর সুময়ের নাম ঠিকানা পর্যন্ত লেখা হয়ে গেল।

ভয় পাওয়া দূরে থাক সবেতেই যেন মজা পাচ্ছে ছেলেটা। অবশ্য মজা এখানে সর্বত্র। মেঝে, দেয়াল, কড়িকাঠ, পর্দা, আসবাবপত্র সবকিছুর মধ্যেই শুধু মজা আর মজা। কার্নিস থেকে ঝুলে থাকা মুখোশগুলো দেখে পিলে চমকে গেল আমার। এক হনুমানের কাণ্ড দেখে থমকে দাঁড়ালাম। উল্লুকটা নিজের বোঁচা নাক দুই হাতে টেনে টেনে দেড় হাত লম্বা করে সপাঙ সপাঙ করে বাড়ি দিচ্ছে শূন্যে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। আর তা দেখে হাসতে হাসতে অস্থির সুসময়। কোত্থেকে বিশাল এক কাগুজে ড্রাম এনে জাদুকর বলল, 'লুকোচুরি খেলবে?'

আমি কিছু বলার আগেই ড্রামটা দিয়ে সে ঢেকে ফেলল সুসময়কে।

'আরে করছেন কী?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'ভয় পাবে তো। শিগগির বের করেন ওকে।'

দ্বিরুক্তি না করে সে ড্রামটা তুলে ফেলল। কিন্তু কোথায় সুসময়! শূন্য ড্রাম। অশুভ আতঙ্কে কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেললাম আমি। বদমাশটার টুঁটি টিপে ধরতে গেলাম। সাঁৎ করে পিছলে নাগালের বাইরে চলে গেল। ওকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলাম আমি। বিদ্যুৎগতিতে দরজা খুলে ধরল ইবলিশটা। আছড়ে পড়লাম

মেঝেতে। উঠে দেখি দাঁড়িয়ে আছি ফুটপাতে। জাদু দোকানের চিহ্নও আশপাশে নেই। শুধু র‍্যাঙ্গস আর কারুপণ্যের আলোকিত সাইনবোর্ডটি চোখে পড়ল।

'ওহ্ আল্লাহ!' বলে কপালের রগ টিপে ধরে বসে পড়লাম। মাথায় আলতো হাতের স্পর্শে মুখ তুলে দেখি সুসময়। পাগলের মত জড়িয়ে ধরলাম ওকে। পাশ দিয়ে এক খালি মিশুক যেতেই ঝট করে উঠে বসে বললাম, 'পশ্চিম নাখালপাড়া।' এই ভয়ঙ্কর জায়গায় আর এক মুহূর্তও নয়।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভড়কে গেছে সুসময়ও। পথে সে একটা কথাও বলেনি। বাসায় পৌঁছে জাদুকরের বাঁধা সেই প্যাকেটগুলো ওর বগলে। রাগত চোখে সেগুলোর দিকে তাকাতেই সামনের দুই দাঁত বের করে ওর সেই বিখ্যাত হাসিটি ছুঁড়ল। পানি হয়ে গেল আমার রাগ। জড়িয়ে ধরে ঠিক ওর মায়ের মত করে ওর কপালে, গালে, চিবুকে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিলাম।

'তুমি মজা পাওনি বাবা? ভীষণ মজার দোকান। ঠিক এরকম এক গল্প পড়েছিলাম, এইচ. জি. ওয়েলসের লেখা। গল্পটা সত্যি, তাই না বাবা?'

প্যাকেটগুলো খুলে দেখি খুবই সাধারণ খেলনাগুলো। তবে সুন্দর নিঃসন্দেহে। খেলনাগুলোর সঙ্গে নাদুসনুদুস একটা জ্যান্ত বিড়াল ছানাও রয়েছে। বিড়ালের শখ সুসময়ের বহুদিনের। তাই ওটাকে দেখে ঝিকিয়ে উঠল ওর চোখের তারা।

এরপর কেটে গেছে অনেক দিন। অবসরে সুসময় ওই খেলনা আর বিড়াল নিয়ে খেলে। ম্যাজিকের নাম গন্ধও নেই ওগুলোতে। একদিন সৈন্যগুলো নিয়ে খেলতে দেখে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাপি ধর–তোর সৈন্যগুলো জ্যান্ত হয়ে কুচকাওয়াজ শুরু করে দিল। তখন তুই কী করবি?'

'ডালা খুলবার আগে ফুসমন্তর না দিলে ওরা জ্যান্তই হয় না।'

'মানে?' অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি আমি।

'জ্যান্ত করে নিয়েই তো খেলি,' স্বাভাবিকভাবে বলল সুসময়। 'তাই তো ওদের এত ভালবাসি।'

ভীষণ ভয় পেলাম ওর কথা শুনে। নজর রাখতে লাগলাম। হঠাৎ একদিন শুনি, ওর শোবার ঘরে ফিসফাস শব্দ। দরজার পাল্লা সামান্য ফাঁক। উঁকি দিয়ে দেখে চমকে গেলাম, ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতরটা। কুইক মার্চ করছে খেলনা সৈন্যগুলো। আর ওই ভয়ঙ্কর মুখটা কার! ও তো আমার ছেলের নয়, ভয়াবহ সেই জাদুকর!

তবে কী, তবে কী!...আর ভাবতে পারলাম না। চোখ খোলার চেষ্টা করেও পারলাম না।

কপাল টিপে ধরে ধপ করে বসে পড়লাম ওখানেই।

ফারহানা চৌধুরী

মুক্তি

হঠাৎ করেই ঘুমটা ভেঙে গেল আনুর। চোখের সামনে কালিগোলা অন্ধকার। কেমন অস্বাভাবিক লাগছে ঘরের পরিবেশ। ঘুটঘুটে অন্ধকারের সাথে অতিপ্রাকৃত কিছু মিশে আছে যেন। এমন তো হয় না কোনদিন। আনুর ভয় ভয় লাগতে শুরু করল। বুকটাও জমে বরফ। অন্ধকারে যেমন ভয় লাগছে তেমনি ভয় পাচ্ছে বাতি জ্বালতেও। আচমকা সুইচটা টিপে দিল সে।

আলোটা চোখে সয়ে আসতেই আনু ঘরে বোলাতে লাগল ভীত দৃষ্টি। শফিক আমানের খাটের দিকে দৃষ্টি যেতেই অসম্ভব আতঙ্কে একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার বুক চিরে। শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল হিস্ট্রিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত। ভয়ঙ্কর দৃশ্যটাকে সহ্য করতে না পেরে আনুর চোখ দুটো আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে গেল। এটা কি স্বপ্ন? নাকি চোখের ভুল? মাথায় প্রশ্ন খেলে যেতেই সে সাহস সঞ্চয় করে তাকাল আবারও।

হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের সাথে বাড়ি খেল দমাদম। বীভৎস কঙ্কালটা আগের মতই ঝুলে আছে শফিক আমানের খাটের পাশে। লিকলিকে হাত-পাগুলো ছড়িয়ে এখনি তেড়ে আসবে যেন—এমনই কঙ্কালটার ভাবভঙ্গি। চোখহীন কোটরে নারকীয় উল্লাস তার। দুই সারি দাঁতে অশুভ হাসির রেখা। আনু আবারও একটি আর্তচিৎকার দিয়ে বন্ধ করে ফেলল চোখ দুটো।

দুই

'আনু, এই আনু, চোখ খোল।' শফিক আমানের কণ্ঠ শুনে আনু স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাকাল।

'তুই এত ভীতু?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল শফিক আমানের কণ্ঠ থেকে।

'ওটা তো একটা সাধারণ কঙ্কালরে!'

আনুর ভয় এখনও কাটেনি বিন্দুমাত্র। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'সা-সাধারণ কঙ্কাল? কি-কিন্তু ওটা এ-এখানে কি-কিভাবে এল?'

'পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য আমিই এনেছি। পুরুষ মানুষের পরিচয় দিয়ে তুই এবার ঘুমা তো। সকালে সব খুলে বলব।' বলে শফিক আমান বাতি নিভিয়ে নিজের বিছানায় চলে গেল।

বিজ্ঞানের ছাত্র শফিক আমান। আনুর এক বছরের সিনিয়র। আনু কমার্সের।

একই কলেজে পড়ে ওরা। এই মেসটাতে আছে অনেক দিন ধরেই। সাথে শফিক আমানের দুজন ক্লাসমেট। দিনতিনেক আগে ওরা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেছে।

আজই সকালে শফিক আমান এবং আনু কবরখানার দিকে হাঁটতে গিয়েছিল। ভাঙা কবরটা আনুর নজরেই পড়ে প্রথমে। সে দেখায় শফিক আমানকে। দুই-তৃতীয়াংশ ভেঙে গেছে কবরটার। ফাঁক দিয়ে দেখা যায় একটা কঙ্কালের অনেকটা অংশ। অজানা ভয়ে আনুর বুকে ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেলেও শফিক আমান স্বাভাবিকই রইল। ভয় পাবে দূরের কথা, বরং খুশিতে তার চোখ দুটো চকচক করে উঠেছিল। সকালের এই ঘটনাটি স্মরণে আসতেই আনু বুঝতে পারল শফিক আমান রাতের আঁধারে কবর থেকে তুলে এনেছে কঙ্কালটা। নিঝুম রাতে কবরখানা থেকে যে একাকী এমন একটা কঙ্কাল তুলে আনতে পারে তার সাহস আছে মানতেই হবে। তাই বলে এত বড় দুঃসাহস? আনুর ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে শফিক আমান নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করলেও আনুর চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। আতঙ্কটা বুকের উপর পাথর হয়ে চেপে বসেছে যেন। উত্তেজনা এবং ভয়ে স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলে একসময় আনুর চোখে ঘুম এলেও ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়ফড় করে জেগে উঠেছে বারবার।

তিন

পরের তিনটি দিন বলতে গেলে আনু কাটিয়ে দিয়েছে বাইরে বাইরেই। একটা কঙ্কালের সাথে অস্বস্তিকর সময় কাটানোর কথা কল্পনা করলেও গা শিরশির করে তার। কিন্তু রাতে বাধ্য হয়ে ফিরতেই হয়। ঘুম হয় ছাড়াছাড়া, আসেও দেরিতে। তার উপর দুঃস্বপ্ন তো আছেই। আনুর ধারণা–এরকম আরও কয়দিন চললে সে পাগল হয়ে যাবে নির্ঘাত!

শফিক আমানকে অনেক বুঝিয়েছে আনু। অনুরোধ করেছে কঙ্কালটাকে যেখানে ছিল সেখানে রেখে আসতে। নতুবা যেকোন সময় ঘটে যেতে পারে খারাপ কিছু।

আনুর অনুরোধ এবং আশঙ্কার কথা শুনে শফিক আমান প্রতিবারই হো হো করে উঠেছে। বলে, 'তুই অযথাই ভয় পাচ্ছিস, আনু। বিজ্ঞান যারা পড়ে তাদের এভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা নিতেই হয়।'

শফিক আমানের এই যুক্তি স্বস্তি দেয়নি আনুকে। বিজ্ঞানের স্বার্থে সবাই একটা করে কঙ্কাল কবর থেকে তুলে এনে ঘরে ঝুলিয়ে রাখবে–এটা মেনে নেয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

আনুর আশঙ্কাও কিন্তু অমূলক নয়। ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনাগুলোই তাকে এমন ভাবতে বাধ্য করেছে। যে রাতে কঙ্কালটা আনা হয় তার পরদিন

সকালে শফিক আমান এবং আনু হোটেল থেকে নাস্তা সেরে এসে দেখে–কঙ্কালটা মাটিতে সটান দাঁড়িয়ে আছে অবিকল মানুষের মত। যে রশি দিয়ে ঝুলানো ছিল সেই রশিটি ছিঁড়ে ঝুলে আছে গলাতে। আনু তো অবাক। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল শফিক আমানও। তবে পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নেয়। ইতোমধ্যে তার বিজ্ঞানমনস্ক মন কোন যুক্তি আবিষ্কার করে ফেলেছে হয়তো। এরপর কঙ্কালটাকে যেখানে খুশি দাঁড় করিয়ে রেখেছে শফিক আমান।

সেদিনই সকাল থেকে আনু তার পোষা বিড়ালটিকে কোথাও দেখতে না পেয়ে চিন্তায় পড়ে যায়। শেষে শফিক আমানের খাটের নিচে সে আবিষ্কার করে ওটাকে। কোন অঙ্গই আস্ত নেই বিড়ালটার। দেহের মানচিত্র পাল্টে পরিণত হয়েছে একদলা মাংসপিণ্ডে! পোষা বিড়ালের এমন নির্মম পরিণতি দেখে আনু তো কেঁদেই ফেলেছে হাউমাউ করে। ওর বিশ্বাস–এই বর্বরতা কঙ্কালটারই।

মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটেছে দুবার। একবার সিলিং ফ্যানটা খুলে দুম করে পড়ে গেল মেঝেয়। শফিক আমান রক্ষা পেল অল্পের জন্য। গত রাতে শফিক আমান ঘুমিয়ে পড়ে বেশ আগে ভাগেই। আনুর ঘুমুতে একটু দেরি হয়। হঠাৎ সে দেখে–শফিক আমানের বিছানায় দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। দুজন মিলে যখন আগুন নেভাতে পারল ততক্ষণে বিছানার অর্ধেক পুড়ে শেষ। শত অনুসন্ধান করেও আগুন লাগার কোন কারণ বের করতে পারেনি ওরা।

এইসব রহস্যময় ঘটনা বিন্দুমাত্র দুর্বল করতে পারেনি শফিক আমানকে। প্রতিবারই সে ঘটনাগুলোর পেছনে দাঁড় করিয়েছে কোন না কোন যুক্তি, ব্যাখ্যা! আনুর সেসব পছন্দ হয়নি একদম।

আজ সন্ধ্যাবেলায় যা ঘটেছে তা আনুকে এতই আতঙ্কিত করে তুলেছে যে–সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে–আজ রাতটা পার করে কাল সকালেই চলে যাবে খালার বাসায। শফিক আমান কঙ্কালটাকে সরিয়ে ফেললে এই মেসে ফিরে আসবে, নয়তো নতুন ঠিকানা খুঁজবে।

সন্ধ্যাবেলা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছিল শফিক আমান। কঙ্কালটা দাঁড় করানো ছিল তার পেছনেই। আনুকে একটা কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। সে ফিরে এসে দেখে–কঙ্কালটা হাত দুটো ধীরে ধীরে শফিক আমানের গলার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে–অনেকটা চেপে ধরার ভঙ্গিতে। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে আনু। সাথে সাথে কঙ্কালটা ঝট করে হাত দুটো নামিয়ে ফেলে স্বাভাবিক হয়ে যায়। অবিশ্বাস্য ঘটনাটা শফিক আমানকে খুলে বললে সে আনুকে তিরস্কার করে বলে, 'কুসংস্কারে পূর্ণ তোর মন। ভূত-প্রেত-দৈত্য দানব–এসব অবাস্তব চিন্তা মস্তিষ্কে ঘুরপাক খায় সারাক্ষণ। এই মস্তিষ্ক নিয়ে কি দেখতে কি দেখিস–আল্লাই মালুম!'

আনু আর কিছু বলার সাহসই পায়নি।

চার

আনুর যখন ঘুম ভাঙল কাক ভোর তখন। দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকতে শুরু করেছে ভোরের মৃদু আলো। ঘরের কোণগুলোতে বাদুড়ঝোলা অন্ধকার। যেন অদ্ভুত এক আলো আঁধারির খেলা চলছে ঘরের ভেতর।

সাধারণত এসময়ে ঘুম ভাঙে না আনুর। চাদরটা সরিয়ে আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে নামল সে। হাই তুলতে তুলতে জ্বালল বাতিটা।

শফিক আমানের বিছানাটা খালি দেখে অবাক হলো। কোথায় গেল শফিক আমান? মেঝের দিকে দৃষ্টি যেতেই রীতিমত জমে গেল আনুর দেহ। অসম্ভব আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইল কোটর ছেড়ে। বুক ফাটিয়ে চিৎকার করতে চাইছে সে। কিন্তু গলা দিয়ে গরগর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই বের হচ্ছে না।

মেঝেতে শফিক আমানের দেহটা পড়ে আছে একতাল কাদার মত, রক্তাক্ত। শরীরের একটা হাড়ও আস্ত নেই বোধহয়। হাত-পাগুলো মুচড়ে এমনভাবে ভাঙা হয়েছে যে-এগুলো মানুষেরই অঙ্গ ছিল কোনদিন-বিশ্বাস করা মুশকিল। কোটর শূন্য! রক্তভেজা চোখ দুটো মারবেলের মত পড়ে আছে দেহের এক পাশে। থ্যাতলানো নাক! গলায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে পাঁচ আঙুলের চাপের দাগ। চাপটা যে রক্ত মাংসের কোন হাতের নয়-এটাও বুঝতে অসুবিধা হলো না আনুর। জ্ঞান হারাবার ঠিক আগ মুহূর্তে অনেক কষ্টে সে একবার সারা ঘরে দৃষ্টি বোলাতে পেরেছিল। কঙ্কালটাকে কোথাও দেখতে পায়নি!

পাঁচ

কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল বলতে পারবে না আনু। একসময় জ্ঞান ফিরলেও ঘোরটা কাটল না পুরোপুরি। এই ঘোরের মধ্যেই বিচিত্র এক কৌতূহলে কবরখানার দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। নির্জন কবরস্থানে তখন শান্তির সুবাতাস। সবুজ ঘাসে ভোরের মায়াবী আলোর স্নিগ্ধতা। ভাঙা কবরটার দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল চরম সত্যটা। নিজেকে নিজেই মুক্ত করে কঙ্কালটা কবরে এসে শুয়ে আছে ঠিক আগের মতই। আপন ঠিকানায়। কিন্তু এজন্য শফিক আমানকে বড্ড বেশি মূল্য দিতে হলো। কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আনুর বুক চিরে।

মিজানুর রহমান মিজান

পুরনো ঢাকার সেই বাড়ি

প্রতীক অনেক কষ্টে সিটি কলেজে অনার্স পড়ার একটা সুযোগ পেয়ে গেল, কিন্তু থাকার জায়গা নিয়ে দেখা দিল সমস্যা। দু'চারদিন এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাসায় থাকার পর ক্লাসেরই এক বন্ধু পুরানো ঢাকার বনগ্রামের এই বাসাটা ঠিক করে দিল। বাসায় ওঠার পর প্রথম দিকে প্রতীকের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিহারীদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি। অনেক পুরনো বাড়ি। একেবারে ঘিঞ্জি। এক চিলতে উঠান। উঠানের পিছন দিকে একটা খুপরি মত ঘর। জায়গায়-জায়গায় পলেস্তারা খসে বেরিয়ে পড়েছে পুরনো দিনের ছোট ছোট লাল ইট। দরজাটার কাঠ বেশ ভারী, তবে নীচের দিকে এঁকেবেঁকে ভাঙা। ফলে বাইরে থেকে দরজার নীচ দিয়ে আলো আসে। জানালা একটা ঘুলঘুলির মত ছোট ফাঁক মাত্র। শিকগুলো ভাঙা। কপাটের নামগন্ধ নেই। বাড়ির অন্যদিকে বাড়িওয়ালা থাকে। বাড়িওয়ালাদের পরিবারটাও অদ্ভুত।

পরিবারের ছোট ছেলেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাস করেছিল। এখন কোনও এক কারণে পাগল। কারণটা প্রতীক জানে না । আর বড় ছেলে এ এলাকার মাস্তান। ছোট ছেলেটা শুধু মূর্তির মত দোতলার রেলিং ধরে দূরে দৃষ্টি মেলে নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকে। নীচে থেকে বাড়িওয়ালাদের রেলিঙের এককোনা দেখা যায়। প্রতীক মাঝেমধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে। ছোট ছেলেটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ন্যাড়ামাথা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শূন্য দৃষ্টি। খালি গা। অন্য সময় যাই হোক, বিকালে ঘুম থেকে উঠলে প্রতীক উপরের দিকে তাকালেই ছোট ছেলেটাকে দেখতে পায়। হঠাৎ কখনও বা চোখ নামিয়ে প্রতীকের দিকে তাকায়। চোখে সেই শূন্য দৃষ্টি। একটা ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত প্রতীকের শিরদাঁড়া বেয়ে নীচের দিকে নেমে যায়। এই দিকটা এত নীরব! বাড়িওয়ালাদের নীচতলায় একটা জুতোর কারখানা। রাস্তার দিকে দরজা। পিছনে শুধু একটা ছোট বের হওয়ার দরজা। মাঝেমধ্যে অল্প-বয়সী কারিগররা বিড়ি ফুঁকতে পিছনের দরজা দিয়ে চিলতে উঠানে এসে দাঁড়ায়। কখনও বা উঠানের এককোণে কাঁচা পায়খানায় গিয়ে প্রস্রাব করে। তবে বেশিরভাগ সময়ই পেছনের দিকের দরজাটা বন্ধ থাকে। একেবারে নীরব এই কোনাটা। অথচ জুতার কারখানার কারিগররা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হৈ হৈ করে কাজ করে চলেছে। রাস্তার দিকে শুধু জুতোর কারখানার দেয়াল ঘেঁষে সরু একটা গলি ভেতরে ঢোকার জন্য। মাঝে বাড়িওয়ালাদের দোতলার সিঁড়ি। গলির শেষটা এসে মিশেছে প্রতীকের ঘরের সামনের এক চিলতে উঠানে। তিনদিকে দেয়াল। প্রতীকের ঘরের সামনে তিন-চার হাত দূরে পুরনো দিনের প্রশস্ত দেয়াল সাত ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে। দেয়ালের উপর দিয়ে দূরের বড়

বিল্ডিংগুলো দেখা যায়। আর দেখা যায় আকাশের গায়ে এলোমেলো সাজানো টিভি'র অ্যান্টেনা। প্রতীকের এ বাসাটা একদম ভাল লাগে না। কিন্তু কী করা, ঢাকা শহরে বাসা পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তা ছাড়া ভাড়ারও একটা ব্যাপার আছে। টিউশনি করে চালিয়ে নেওয়া যাচ্ছে কোনওরকমে, এই ঢের। রান্না করে দিয়ে যায় বুয়া। ১৫ দিন হলো সে এখানে এসেছে। এরই মধ্যে বুঝে গেছে, আর যাই হোক বুয়াটা রান্না করে চমৎকার। বয়স প্রায় ৫০-৬০ বছর। তিনকুলে কেউ নেই। কয়েকদিন ভিক্ষা করেও দিন চালিয়েছে বলে কথায় কথায় জানিয়েছে। থাকে কোনও বস্তিতে। দু'বেলা রান্না করে দিয়ে যায়। একদম ভোরে আর শেষ বেলায়, দুপুরের পরে। এই একটু পরে বুয়া আসবে। প্রতীক বুড়িকে নানী বলে ডাকে।

প্রতীক খেয়েদেয়ে একটা ফটোস্ট্যাট করা নোট ওল্টাচ্ছিল। একটু পর পাপ্পু আসবে। তারপর দুজনে বেরিয়ে যাবে। এরকমই কথা আছে। পাপ্পুর আগেই বুয়া এসে গেল। কী রান্না করবে? প্রতীক নোটের উপর চোখ রেখেই বলে, 'ডিম, ডাল। বেগুন এনেছি, বেগুন ভাজি করো।' 'আচ্ছা,' বুয়ার সংক্ষিপ্ত উত্তর। প্রতীক লক্ষ করেছে, এই বুয়াটা চুপচাপ কাজ করে যায় বটে, তবে মাঝেমধ্যে আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এটাই প্রতীকের কাছে অস্বস্তি লাগে। বুয়ার চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক মনে হয় না প্রতীকের। কেমন যেন ঘোর লাগা দৃষ্টি। অবশ্য মাঝেমধ্যে এরকম হয়। সব সময় নয়। এ ছাড়া আর কোনও অস্বাভাবিকতা খুঁজে পায়নি প্রতীক। বুয়া রান্না করতে লেগে যায়। তেমন কোনও আয়োজন তো নয়। শুধু ডিম আর ডাল। তাও সকালের রান্না করা ডাল আছে। শুধু ডিম রান্না করতে হবে। ডিম সিদ্ধ বসিয়ে দিল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল বাইরে। এই ঘরটাতে যে ঘুলঘুলির মত একটুখানি জানালা আছে, তা দিয়েও বাড়িওয়ালাদের ছাদের কোনাটা দেখা যায়। প্রতীক জানালা দিয়ে ছাদের নীচে তাকাল। বাইরে থেকে কেমন বাতাস কাটার শিসের মত একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। প্রতীক অবাক হয়ে দেখল, উপরে বাড়িওয়ালাদের পাগল ছেলেটা নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। ব্যাপার কী? এই দিনের বেলায় ভয় পেল কী দেখে? প্রতীক হাতের নোটটা ঝট করে রেখে চৌকি থেকে নেমে দাঁড়ায় বাইরেটা দেখার জন্য। এদিকটায় কেউ নেই। বুয়া হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে ঘরের ভেতর এসে ঢোকে। বাইরে আর কেউ ছিল? প্রতীক বুয়াকে জিজ্ঞেস করে। নাহ্। বুয়া বলে। প্রতীক বাইরে এসে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখল, কোথাও কেউ নেই। বাড়িওয়ালার ছেলেটাও উধাও। সামনের জুতোর কারখানার হাতে টানা কাটার মেশিনের একটানা ঘটর ঘটর শব্দ। প্রতীক আবার এসে নোটটা চোখের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু এবার চোখ রাখে বুয়ার দিকে। বুয়াকে আজ অস্বাভাবিক লাগছে। প্রতীক কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কী নানী, কী হলো?' বুয়া ঘুরে তাকাল। চোখ জ্বলজ্বল করছে। বলল, 'কী হইবে? কিছু না।'

প্রতীক তবু হাল ছাড়ে না, কিছু তো হয়েছে। বুয়া এবার রাগে গলা চড়িয়ে

বলে উঠল, 'এই দ্যাখেন!' এই বলে ডান হাতের তর্জনীটা তুলে ধরল। আঙুলটার উপরের কড়টা কেটে প্রায় নখসহ আঙুলটা ন্যাড়া হয়ে গেছে, টপটপ রক্ত ঝরছে। প্রতীক চৌকি থেকে লাফিয়ে নামল, 'আহা!! কেমন করে হলো?'

বুয়া যেন শাসনের গলায় বলল, 'আপনার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নাই।'

প্রতীক দেখল, বুয়া ঝটপট কাপড় দিয়ে আঙুল ব্যান্ডেজ করে ফেলল। প্রচুর যন্ত্রণা হওয়ার কথা। কিন্তু বুয়ার মুখ দেখে তেমন কিছু মনে হলো না। এমন সময় পাপ্পু এল। পাপ্পু ঘরে ঢুকেই বলল, 'ঘরটা এমন মনে হচ্ছে কেন?'

'কেমন?' প্রতীক জানতে চায়।

'কেমন বলতে পারছি না।' পাপ্পুর অবাক উত্তর। সে আবার বলতে থাকে, 'কেন জানি না, আমার ভয়-ভয়ই লাগে তোর এখানে এলে। বিশেষ করে তোদের ওই ওপরের পাগলটার জন্যে। কেমন ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকে।'

কিছুক্ষণ পর ওরা বেরিয়ে যায়। এক বন্ধুর বাসায় যাবে ক্লাস নোটের জন্য। রাতে ঘটল অদ্ভুত ঘটনা। প্রতীক খাওয়া দাওয়া শেষ করে পড়বে বলে বই খুলে বসেছে। অমনি দরজায় টোকা পড়ল। প্রতীক খানিকটা ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে, 'কে?' কোনও জবাব শোনা গেল না। রাত কত হবে? বেশি হলে এগারোটা। জুতোর কারখানা বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। টুকটাক কথা শোনা যাচ্ছে এখনও। দেয়ালের ওপাশের বাড়িঘরের টিভি থেকে সিনেমার গানের সুর ভেসে আসছে। চারদিকে হৈ চৈ, কোলাহল। শুধু এই একচিলতে উঠানই অসম্ভব নীরব। দরজায় আবারও টুকটুক। খুব আস্তে কেউ টোকা দিচ্ছে দরজায়। প্রতীক কী করবে, ভেবে পেল না। তারপর বুকে সাহস সঞ্চয় করে গলায় খানিকটা জোর দিয়ে বলে উঠল, 'কে এত রাতে?'

'আমি।'

'আমি কে?' প্রতীক এবার রাগত গলায় জিজ্ঞেস করল।

'আমি বুয়া।'

প্রতীক অবাক হয়ে যায়। এত রাতে বুয়া কেন? ওর চোখে বুয়ার সেই রক্তঝরা কাটা আঙুলটা ভেসে উঠল। প্রতীক কেমন একটা অশরীরী ভয় অনুভব করে। অবশ্য তেমন কিছু হলে চিৎকার দিলেই বাড়িওয়ালারা শুনতে পাবে। বাড়িওয়ালার বড় ছেলে বলে রেখেছে কোনও অসুবিধা হলে জানাতে। তা ছাড়া, দশ গজ গলি পেরোলেই জমজমাট বড় রাস্তা। হাজার মানুষের কোলাহল। তেমন কিছু দেখলে দরজা খুলে এক দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে উঠলেই হবে। প্রতীক বলল, 'এত রাতে কী?'

'আমার ছেলে আসবে এখানে। একটু দরজা খুলেন, বসি। আসলে দেখা কইরা চইলা যামু।'

প্রতীক ধাঁধায় পড়ে যায়। সে দরজা না খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতীক বলল, 'দরজা খোলা যাবে না, নানী।'

বুয়া বলে, 'খোল, ভাই।'

'নাহ।' প্রতীক কঠিন। দরজা খুলবেই না। ঢাকা শহরে কত কী ঘটে যাচ্ছে।

বুয়ার গলা কেমন হতাশ শোনায়, 'আচ্ছা, বাইরেই বসি।'

অনেকক্ষণ কোনও সাড়া শব্দ নেই। প্রতীক অনেকক্ষণ পড়াশোনা করল। রাতও হলো অনেক। হঠাৎ বুয়ার কথা মনে পড়ল। কে জানে, এখনও বাইরে বসে আছে কিনা! সে আবার ডাকল, 'নানী।' সাড়া নেই। প্রতীক ঘরের দরজা খুলল লাইট জ্বেলে রেখেই। কেউ কোথাও নেই। চারদিকে তাকিয়ে বাথরুমে গেল সে। আসার সময়ও দেখল কেউ নেই। শুধু শুধু ভয় পাওয়া। ঘরে ঢুকে প্রতীকের আফসোস হয়। বুড়ো মেয়ে মানুষটাকে সে বাইরে বসিয়ে রেখেছিল। হয়তো বেচারীর ছেলে কোনও কেসের আসামী। রাতে গোপনে মার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ... ও বাবা, প্রায় একটা বেজে গেছে! প্রতীক লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। বুয়া বোধহয় চলে গেছে। তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। এমন কোনদিন হয়নি। ২০ দিন হলো সে এখানে এসেছে। ক্লাসে গেছে, টিউশনিতে গেছে, ঠিকঠাক মতো ঘুমও হয়েছে। কিন্তু আজকের রাতটা যেন একটু অন্যরকম। কেমন এক অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভেঙে গেছে। গলাটাও শুকিয়ে কাঠ। পানি খেতে হবে। প্রতীক চৌকী থেকে নামতে যাবে, এ সময় কানে আসে ফিসফিস কথা বলার শব্দ। প্রতীক চৌকির উপর বসেই কাঠ হয়ে গেল। কথা শোনা যাচ্ছে বাড়িওয়ালাদের ছাদ থেকে। সে ঘুলঘুলির মত জানালাটা দিয়ে উপরে উঁকি দিল। যা দেখল তাতে জ্ঞান হারাবার যোগাড়। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা গেল, কাজের বুয়া ছাদের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে বাড়িওয়ালার সেই পাগল ছেলেটা। চোখ দুটো হায়েনার মত জ্বলছে। কিন্তু দুজনে যা বলছে তা আরও ভয়ঙ্কর।...মা, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। গলার স্বর কেমন যেন ফ্যাঁসফ্যাঁসে। অনেক দূর থেকে আসা।

কেন, তুই ফাঁসি দিয়ে মরতে গেলি, বাপ?

উপায় ছিল না, মা। তুমিও তো বিষ খাইলা?

তুই চলে গেলি, আমি কী নিয়ে থাকব? গত পূর্ণিমায় তো আইলি না, বাপ?

মা, অনেক কষ্ট করে এখানে আসতে হয়। পাগলের মাথা তো, অনেক সময় আর আত্মায় ভর করতে পারি না।

আমিও বাপ। ওই কাজের বুড়িটার অবস্থাও ভাল না। কোনদিন হুট করে চলে আসবে আমাদের জগতে। বুয়ার গলায় রক্ত জল করা এক ধরনের শাসানি। প্রতীক এক মুহূর্ত ভাবে। সর্বনাশ, এরা তবে কেউ মানুষ নয়!! দুজনের মধ্যে দুটো মৃত মানুষের আত্মা ভর করেছে! বুয়াকে তার নিয়তিই এত রাতে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। প্রতীক বিছানা থেকে খালি গায়ে নেমে সন্তর্পণে দরজার ছিটকিনিটা খুলল। এখান থেকে বড় রাস্তায় যাবে। ঘামে ভিজে গেছে সমস্ত শরীর। পা পাথরের মত ভারী। দরজা খুলে প্রতীক খালি পায়ে দৌড় দিল। বাড়িওয়ালার দোতলার সিঁড়ির ঘরটা পার হওয়ার সময় শুনতে পেল, পাগলটা বলছে, নতুন ছোঁড়া টের পেয়ে গেছে।

হ্যাঁ বাপ, মেরে ফেলতে হবে ওকে...।

প্রতীক এক দৌড়ে রাস্তায় নেমে এল। রাস্তার এমাথা ওমাথা একেবারে

ফাঁকা। প্রতীক সোজা পুব দিকে দৌড় দিল। খানিক দৌড়ে একটা বারান্দার দেয়ালের সাথে সেঁটে রইল। উঁকি দিয়ে এক পলক তাকাল। পাগল আর বুয়া যেন বাতাসে ভর করে রাস্তার ও-মাথা থেকে আসছে। পাগলটার চোখ বাতির মত জ্বলছে। ঝট করে মাথা ভেতরে নিয়ে এল প্রতীক। সামনে দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে। বুয়া বলছে, কোথায় যাবে? গলায় হিংস্রতা। রাস্তার বাতির আলোতে দুটো মানুষকে আরও ভৌতিক লাগছে। দুজনে প্রায় নিঃশব্দে, দ্রুত রাস্তার পুব দিকের মাথায় এগিয়ে চলল। ওমাথায় যেতেই প্রতীক বারান্দা থেকে নেমে রাস্তার পশ্চিম দিকে দৌড় দিল। খানিকটা দৌড়ে পিছন ফিরে তাকাল। দেখতে পেয়েছে পাগল আর বুয়া বাঅসে ভর করে দ্রুত এগিয়ে আসছে। কোথাও একটা রাস্তার কুকুর কেউ কেউ করে কেঁদে উঠল। প্রতীক রাস্তার মাথায় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারল। মোড়ের কাছে পৌঁছতেই দুজন লোক সাপটে ধরে ফেলল ওকে। প্রতীক শুধু বলতে পারল, আমাকে বাঁচান। লোক দুটো রাতের পাহারাদার। হাতে বাঁশের লাঠি। একটা লোক জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে? রাস্তার পুব দিকে আঙুল তুলে দেখাল প্রতীক। তারপর পাহারাদারদের হাতেই নেতিয়ে পড়ল। পাহারাদাররা দেখল একটা বুড়ো মহিলা আর একটা লোক রাস্তার মাঝখানে চলে এসেছে।

সবুজ মিয়া বলল, দেখলি, ওই হারামজাদারা!

অনেক দিন তো ছিল না, বলল সঙ্গী চাঁন মিয়া। আবার আসছে।

সবুজ মিয়া আর চাঁন মিয়া অনেকদিন থেকে এই গলিতে পাহারা দেয়। তারা এই গলির অন্ধি-সন্ধি জানে। বারো নাম্বার বাড়ির জানালায় অনেক রাতে যে আগুন জ্বলতে দেখা যায়, সেটা অনেকের মত এরাও দেখেছে বহুবার। সেটার না হয় কারণ ছিল যে, ওই বাড়ির একটা বউ শরীরে আগুন জ্বালিয়ে মরেছে। কিন্তু এরা রাতে কেন বেরোয়? কোনওদিন সামনে পড়েনি। পড়লে মজা দেখিয়ে দিত। সবুজ মিয়া আর চাঁন মিয়া প্রতীককে রাস্তার পাশে শুইয়ে দিল। প্রতীকের জ্ঞান ফিরে এল কিছুক্ষণ পর। সে ওদের ঘটনাটা বলতে চাইল। ওরা বাধা দিয়ে বলল, 'সব জানি।'

'তা এখন কোথায় যাবেন?' সবুজ মিয়া জিজ্ঞাসা করে।

'আমাকে একটু এই মহল্লার ২৪/৪ নং বাসায় পৌঁছে দিন।'

বাসাটা এখান থেকে দূরে নয়। ওখানে পাপ্পুসহ আরও ক'জন ছেলে মেস করে থাকে। সবুজ মিয়া আর চাঁনমিয়া প্রতীককে পাপ্পুদের মেসে পৌঁছে দেয়। এতরাতে প্রতীককে খালি গায়ে দেখে সবাই অবাক। সবাই বুঝে নেয় খুব একটা বিপদ গেছে ওর ওপর দিয়ে। ধরে নেয় ছিনতাইকারীরা ওর সব কিছু নিয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে শুধু পাপ্পুর কাছে সত্যি কথা জানায় প্রতীক।

'সব শুনে পাপ্পু বলে, সত্যি নাকি? ঢাকা শহরেও ঘটে এসব!'

প্রতীক চুপ করে থাকে। পরদিন সকালে প্রতীক পাপ্পুকে নিয়ে বনগ্রামের বাসায় যায়। ঘরে তালা। চাবি একটি বুয়ার কাছে, একটি প্রতীকের কাছে থাকে। প্রতীক ঘরের তালা খুলল। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। সকালে এসে বুয়া ডাল, ভাত, ডিম, ভাজি রেঁধে রেখে গেছে! পাপ্পু বলল, চল, অনেক হয়েছে।

আমার ওখানে চৌকিতে ডাবলিং করে থাকব।'

দু'জনে বিছানাপত্র গোছাতে লেগে যায়। বাড়িওয়ালাকে একমাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে গেলেই চলবে।

এই ঘটনার দশ বছর পর প্রতীক আবার বনগ্রামের বাসাটার খোঁজ নিতে আসে। কোথাও পুরনো দালান বাড়িটার চিহ্নমাত্র নেই। সেখানে ঝকঝকে একটা সাততলা বিল্ডিং। বারান্দায় মেলা কাপড়চোপড় আর বাহারি ফুলের টপ দেখেই বোঝা যায়, এখানে পয়সাওয়ালা লোকেরাই ভাড়া থাকে।

বাড়ির দারোয়ান প্রতীককে দেখে চিনে ফেলে, 'আরে, আপনি! সেই যে রাতে রাস্তায় দৌড় দিছিলেন!'

সবুজ মিয়া অনেক বুড়িয়ে গেছে। 'আগের বাড়িওয়ালা কোথায়?' প্রতীক জানতে চায়।

'সে সার কবে লাপাত্তা হয়ে গেছে। সব বিক্রিবাট্টা করে কোথায় গেছে কে জানে!'

প্রতীক বলে, 'পাগল ছেলেটা?'

'সে তো সার, কবে মইরা গেছে।'

'আর কাজের বুয়া?' প্রতীক জিজ্ঞেস করে?

'জানি না, সার।'

প্রতীক সবুজ মিয়ার হাতে একটা পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে বেরিয়ে আসে। সবুজ মিয়ার মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হয় না। প্রতীক ভাবে একদিন এই বুড়ো দারোয়ানটা তার জীবন বাঁচিয়েছিল। দ্রুত হাঁটা শুরু করে সে। আজ রাতেই তার নিউ ইয়র্কের ফিরতি ফ্লাইট।

মিতুল খান মিতুল

জিন্দালাশ

এক

হাসপাতালের মর্গে পাহারায় রয়েছেন রহমত মিয়া। অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন তিনি। অনেক বছর ধরেই হাসপাতালে কাজ করছেন, কিন্তু ইদানীং সমস্যা হচ্ছে তাঁর। মনে হয় ভিতরে কারা যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। ভিতরে কাটাছেঁড়া লাশ ছাড়া কিছুই নেই তা ভাল করেই জানেন রহমত মিয়া। তবুও গতকাল সকালে তালা খুলে ভিতরে গেছেন।

জ্যান্ত কোন কিছুই চোখে পড়েনি। তা ছাড়া লাশগুলো যেমন থাকার কথা তেমনিই আছে। কাউকেই এই কথা বলেননি, বললেই ভাববে রহমত মিয়া ভয় পেয়েছে।

ক্ষীণ একটা আর্তনাদ রহমত মিয়ার কানে এল। ভিতরে কে যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। একবার ইচ্ছা হলো তালা খুলে ভিতরে যাবার, পরক্ষণেই ইচ্ছাটা বাতিল করে দিলেন।

আবারও শব্দটা শুনতে পেলেন। এবার আগের চেয়ে কিছুটা জোরে। লাশেরা মারামারি করে নাকি? লাশের আবার পাহারা!

আজ রহস্যের কিনারা করতেই হবে, ভাবলেন রহমত মিয়া। ভয় বলে কিছু রহমত মিয়ার ছিল না, কিন্তু কিছুদিন যাবৎ ভয় মনের ভিতর বাসা বানাতে চাইছে।

চাবির গোছাটা নিয়ে মর্গের দরজার কাছে এগিয়ে যান রহমত মিয়া। অদ্ভুত এক অনুভূতি দোলা দিচ্ছে শরীরে।

টর্চলাইট টিপে আলো ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলেন। বারান্দা পেরিয়ে মর্গের প্রধান দরজার কাছে থামলেন তিনি।

দরজায় কান পাতলেন রহমত মিয়া। ভেতরে কে যেন পা টেনে টেনে হাঁটছে। দরজার নবে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তীব্র ওষুধের গন্ধ নাকে ঢুকছে। বমি বমি লাগছে তাঁর। বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানোর জন্য সুইচবোর্ডের দিকে যেতে থাকেন রহমত মিয়া। পায়ে কীসের যেন বাধা পেয়ে থমকে যান। টর্চের আলো ফেলে সাদা চাদরে মোড়া লাশটাকে পড়ে থাকতে দেখেন।

লাশটা এখানে এল কেমন করে? এখানে তো লাশ থাকার কথা নয়। ঘরঘর শব্দ তুলে একটা লাশ টানা ট্রলি এক মাথা থেকে অন্য পাশে সরে যায়।

সাথে সাথে টর্চের আলো ফেলেন রহমত মিয়া। কোমরে সাদা চাদর পেঁচিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

বুক থেকে বরাবর পেট পর্যন্ত কাটা এবং তাতে সেলাই দেওয়া। চক্ষুহীন

দুটো কোটর থেকে রক্ত একটু নীচে এসে জমাট বেঁধে রয়েছে।

তীব্র চিৎকার করতে যান রহমত মিয়া কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। লাশ? হ্যাঁ, লাশ, জীবন্ত হলো কী করে?

ঘুরেই দৌড় দিতে চাইলেন রহমত মিয়া। কিন্তু পারেন না। পড়ে থাকা লাশটি রহমত মিয়ার দুই পা জড়িয়ে ধরে।

ঠাণ্ডা দুহাতের বন্ধন থেকে মুক্তির আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন তিনি। পেটের ভিতরের সব নাড়িভুঁড়ি গলা দিয়ে বের হতে চাইছে।

ধপাস্ করে শক্ত মেঝেতে পড়ে যান রহমত মিয়া। সবগুলো লাশ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

চোখ বন্ধ করে ফেলেন রহমত মিয়া। জ্ঞান হারানোর আগে শুনতে পান লাশগুলোর আর্তনাদ জড়িত কণ্ঠ। 'আমাদের সবকিছু ফেরত দে, চোখ, কিডনী...সব। আমাদের বড় কষ্ট...'

দুই

চোখ মেলতেই পরিচিত রুমটা দেখতে পেল অপু। তার মনটা বাসায় ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। ডাক্তার বলেছে কয়েক দিনের মধ্যেই সে বাসায় ফিরতে পারবে।

অপুর বয়স এগারো বছর। এ বয়সে তার হেসে খেলে বেড়ানোর কথা, কিন্তু সে একমাস হলো হাসপাতালের এ রুমে বন্দি হয়ে আছে। এতটুকু বয়সেই দুটি কিডনীই নষ্ট হয়ে গেছে।

গতকাল সকালে কিডনী দুটি ফেলে নতুন কিডনী বসানো হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই আগের জীবন ফিরে পাবে অপু। আবার স্কুলে যেতে পারবে।

রিফাত...অর্ক...শিহাব এদের সবার সাথে খেলতে পারবে। এসব ভাবতেই খুশিতে ভরে গেল অপুর মন।

অপু মনে মনে আনন্দের ফানুস উড়াতে থাকল। দরজা খোলার শব্দে তার স্বপ্নের সুতো ছিঁড়ে গেল।

ঘাড় কাত করে দরজার দিকে তাকাল অপু। ডিম লাইটের মৃদু আলোয় একটা মানুষের কাঠামো দেখতে পেল।

একটু ভাল করে দেখার জন্য সামান্য উঁচু হলো অপু। ওর চেয়ে তিন-চার বছরের বড় হবে ছেলেটি। শীর্ণ হাতটা দিয়ে দরজার নব ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'ভেতরে এসো।' ক্লান্তসুরে বলল অপু।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেঁটে অপুর সামনে এসে দাঁড়াল ছেলেটি। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তার।

'বসো?'

'না, বসমু না,' মুখ খুলল ছেলেটি। তার কণ্ঠে কী যেন অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার আছে। সামান্য ভড়কে গেল অপু।

'কী নাম তোমার?' বলল অপু, 'এখানে এলে কেমন করে?'

'আমার নাম আকবর, এইহানে আমার জিনিস ফেরত লইবার আইছি।'

'এখানে তোমার কী জিনিস আছে? কার কাছে?'

'তোমার কাছে, আমার কিডনী দুইটা দিয়া দাও। আমার কষ্ট হইতাছে।'

আঁতকে উঠল অপু। কিডনী? এই ছেলেটির কিডনীই কি তার...। সত্যি সত্যি এবার ভয় পেল অপু।

'জানি, তুমি দিবা না। আমার জিনিস আমারেই লইতে হইব।'

একটা সার্জিক্যাল নাইফ নিয়ে অপুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল আকবর। অপু চিৎকার করে উঠল, কিন্তু গলা দিয়ে সামান্য 'গোঁ-গোঁ' শব্দ বের হলো কেবল।

তিন

অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন হাসপাতাল ইনচার্জ ডা. মাহবুব আলম। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মগজে গত রাতের ঘটনাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে।

মর্গের পাহারাদার রহমত মিয়ার ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া গেছে। কোন ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্টেও মানুষ এত ক্ষত-বিক্ষত হয় না। তা ছাড়া মর্গের লাশগুলোও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।

চোদ্দ-পনেরো বছরের একটা টোকাই ছেলের লাশ গায়েব হয়ে গেছে। কী করে এসব হলো? এই প্রশ্ন ঘুরে ফিরেই মাহবুব আলমের মাথায় আসছে।

গত রাতে তাঁরই ডিউটি ছিল, তাই যাবতীয় চাপ তাঁর সহ্য করতে হচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা অপু নামের এগারো বছরের একটি ছেলের মৃত্যু।

ছুরি দিয়ে তার পেটের দুপাশ চিরে ফেলা হয়েছে। কে করল এমন নিষ্ঠুর কাজ?

আজকে রাতেও ডিউটিতে আছেন ডা. মাহবুব আলম। মর্গে কোন পাহারাদার রাখা হয়নি। কেউ রাজি হয়নি পাহারা দিতে, যত্তসব!

রাত বারোটা চল্লিশ। রাউন্ড শেষে বাইরে এলেন তিনি। নিজের অজান্তেই মর্গের কাছে চলে আসলেন। চাপা গোঙানির শব্দে থমকে দাঁড়ালেন। আবারও শব্দটা শুনতে পেলেন। ভিতরে জীবিত কেউ আছে?

দ্রুত তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেন ডা. মাহবুব আলম। কম পাওয়ারের বাতিটি পুরো ঘরটির অন্ধকার দূর করতে পারেনি।

আবছা অন্ধকারে কে যেন ডা. মাহবুব আলমের দিকে এগিয়ে আসছে। আরেকটু কাছে আসতেই ভালভাবে দেখতে পেলেন।

চমকে উঠলেন ডা. আলম। চোখের ভুল? নাকি সত্যি? এটা কি সম্ভব? লাশ কী করে জীবন্ত হলো?

'ডাক্তার, আমাদের বড় কষ্ট। আঃ...আঃ...আমাদের কাটাছেঁড়া করেন কেন?' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না ডা. আলম। আমি ভয় পেয়েছি, আমার মস্তিষ্ক এই লাশটা তৈরি করেছে। নিজের মনকে বুঝালেন তিনি।

'তোমরা সবাই ওঠো, প্রতিশোধ...হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতে হবে।'

সব লাশ নড়েচড়ে উঠল। আস্তে আস্তে সবাই উঠে দাঁড়াল। বিচিত্র ভঙ্গিতে হেলে দুলে তাঁর দিকে আসতে লাগল।

'ব...ব...বড়–কষ্ট...' আর্তনাদ করল সবগুলো লাশ। দু'হাতে নিজের কান চাপা দিলেন ডা. মাহবুব আলম। জীবন্ত লাশগুলো ক্রমেই তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

মোঃ রাকিব হাসান

ওসমান'স কিউরিও শপ্

গুলশান দুই নম্বর রোডে নতুন যে মার্কেটটা হয়েছে তার দোতালায় একটা দোকান নিয়েছি আমি। ভাগ্যই বলা যায়। আমার এক বন্ধু কিনেছিল দোকানটা। ডিভি লটারিতে হঠাৎ আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় সেখানে পাড়ি জমিয়েছে। যাওয়ার সময় পুরনো বন্ধু হিসেবে ভারী সস্তায় দোকানটা আমার কাছে বিক্রি করে গেছে। এমনিতে এত দামি জায়গায় দোকান কেনার সামর্থ্য ছিল না আমার। তাই ভাগ্যগুণে দোকানটা হাতে পেয়ে, উঠেপড়ে লাগলাম আমি।

কিন্তু দোকান সাজাতে এবং জিনিসপত্র কিনতে যে পরিমাণ টাকা লাগে তা ছিল না আমার হাতে। তাই, কম টাকায় করা যায়, এবং আমার রুচির সাথেও মিলবে, এমন একটা জিনিস বেছে নিলাম দোকানে বিক্রির জন্য। নানান কিউরিও–মানে প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসপত্রের নমুনা, মূর্তি, স্যুভেনির ইত্যাদি দিয়ে সাজালাম দোকানটা। তবে এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো আসল জিনিস নয়, আসলের মত দেখতে। তাই, কেনা কম দামে হলেও আসল বলে দিব্যি অনেক চড়া দামে বিক্রি করা যায়। আর এই অঞ্চলটায় ধনী লোকদের বাস। দাম বেশি হলেও বিক্রি করতে অসুবিধা হয় না। ধনীদের আবার এসব আজব জিনিসে ড্রইংরুম সাজাবার খুব চল্। সব মিলিয়ে একদম রমরমা না হলেও, পকেটভারী কজন নিয়মিত খদ্দের পেয়ে যাওয়ায়,–বেচাবিক্রি নেহায়েত মন্দ না আমার দোকানে।

হরেক জিনিসে ঠাসা দোকান। কারুকাজ করা ছুরি, ট্যাক্সিডার্মি মানে বিশেষ কায়দায় সংরক্ষিত করা পাখি, রূপার মূর্তি, প্রাচীন তরবারি, আংটি ইত্যাদি ইত্যাদি নানান জিনিস দিয়ে ঠাসা দোকানের প্রতিটা শেলফ্। এ ধরনের জিনিস পাওয়া যায় ঢাকার মাত্র গুটিকয় দোকানে। তাই দাম চড়া রেখেও বিক্রি করতে অসুবিধা হয় না আমার। একজন ব্যবসায়ীর জন্য এর চেয়ে সুখের আর কী হতে পারে!

সেদিন সারাক্ষণ বৃষ্টি। সকাল থেকে বসে আছি। তখন বাজে প্রায় বিকাল চারটা। নতুন মার্কেট, এমনিতেই এখনও অনেকগুলো দোকান খালি পড়ে আছে। তা ছাড়া, অনেকেই সারাদিন একজনও কাস্টমার না পেয়ে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে গেছে। সব মিলিয়ে মার্কেটের দোতালাটা একদম সুনসান, নিস্তব্ধ। হঠাৎ করে মনে হবে যেন নিঝুমপুরী। সারাটাদিন যেভাবে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে তাতে আজ আর কোনও কাস্টমার না আসার সম্ভাবনাই বেশি। অন্যদের মত আমারও উচিত দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যাওয়া। কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধুবান্ধব নেই আমার। বাবা-মা বেঁচে নেই। আত্মীয়-স্বজনের

সাথে যোগাযোগ নেই বললেই চলে। টিভি দেখতেও ভাল লাগে না আমার। দু'রুমের একটা ফ্ল্যাটে একা ভাড়া থাকি আমি–বিয়ে থা করিনি। বাসায় ফিরে সময় কাটানোই দায়। তাই দোকান খুলে বসে আছি। ক'দিন আগে শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেট থেকে একটা বই কিনেছিলাম–সেটা দোকানেই ছিল। ওটা খুলে পড়া আরম্ভ করলাম। এই একটা জিনিসই আমাকে টানে–বই। অল্পক্ষণেই বইয়ের পাতায় মগ্ন হয়ে পড়লাম। এমন সময় চোখে পড়ল ভদ্রলোককে। আসছেন আমার দোকানেই। গায়ের বর্ষাতি বেয়ে পানি ঝরছে টপ্‌টপ্‌ করে। আমি উৎসাহী হয়ে বললাম, 'আসুন, সার, ভেতরে আসুন।' ভদ্রলোক কোনও উত্তর না দিয়ে গায়ের বর্ষাতিটা খুলে রাখলেন দোকানে সামনে রাখা একটি টুলের ওপর, তারপর ঢুকলেন আমার দোকানে। এতক্ষণে ভালমত লক্ষ করলাম ভদ্রলোককে। ষাট ছাড়িয়ে গেছেন। লম্বায় পাঁচ ফুট সাত কি আট। শরীরে চর্বির লেশমাত্র নেই। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, বড় বড় সাদা-কালো চুলভর্তি মাথা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। গায়ে কাজ করা সাদা সিল্কের ফতুয়া। বোঝা যায়–পয়সাওয়ালা। 'মামি আছে তোমার কাছে?' কেমন ফ্যাসফ্যাসানো গলায় ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

'মামি?' একমুহূর্তের জন্য চম্‌কে উঠেছিলাম।

'মামি চেনো না? ওই যে, মিশরের প্রাচীন রাজাদের মরদেহ সংরক্ষণ করে রাখত...'

'চিনি, সার। অমন মামি তো আমার কাছে নেই, তবে পাখির মামি রয়েছে আমার কাছে।' ঘুঘু পাখির ট্যাক্সিডার্মি করা শরীর আঙুল উঁচিয়ে দেখালাম ওঁকে।

'আরে, মানুষ আর পাখির শরীর এক হলো নাকি?'

'না সার, তা নয়। কিন্তু যে মামির কথা আপনি বলছেন সেটা ভীষণ দুর্লভ জিনিস, বড় বড় জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকে। কোথাও কিনতে পাবেন বলে মনে হয় না।'

'বলছ পাব না?' ভদ্রলোকের গলায় হতাশা।

'পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বিদেশে পেলে পাওয়া যেতেও পারে, কিন্তু আমাদের দেশে পাবেন না।'

হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠল ভদ্রলোকের চেহারায়।

আমি খদ্দের হারানোর ভয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপনি আপাতত এই পাখিটাই নিন। আমি আসল মামির খোঁজ নিয়ে রাখব।'

'বলছ?'

'জ্বী, সার। তা ছাড়া, এত ভাল ট্যাক্সিডার্মি করা পাখি আর কোথাও পাবেন না। দামটা আপনার জন্য কমিয়ে রাখব।'

'কত দাম?'

'একদম কেনা দাম সার, হাজার পঞ্চাশ।'

বিনাবাক্যব্যয়ে কিনে নিলেন ভদ্রলোক জিনিসটা। প্যাকেটে ভরে দিতেই

সেটা নিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন উনি।

আমি মহাখুশি। 'এমনিতেই পাখির ট্যাক্সিডার্মিটা বিক্রি হচ্ছিল না, পড়েছিল অনেক দিন। আর ওটা আমি কিনেছি মাত্র তিনশ' টাকায়। অর্থাৎ লাভ হলো পুরো সাতশো পঞ্চাশ টাকা। যাই হোক, জিনিস বিক্রি হলো, মজার একটা লোকও দেখা হলো। মনে মনে বললাম, 'নির্ঘাত পাগল।'

তারপর থেকে মাসে দু'একবার করেই ওই লোক আমার দোকানে আসতে আরম্ভ করলেন। নামটা জানা হয়েছে—শফিকুল চৌধুরী। অবশ্য নাম ছাড়া আর কিছুই জানা হয় না; ভদ্রলোক কোনও কথা বলতে চান না। প্রতিবার এসে মামির খোঁজ করেন। আমি মামি না দিতে পারলেও ওই জাতীয় কোনও একটা জিনিস চড়াদামে গছিয়ে দিই ভদ্রলোককে। উনি কোন দামাদামি করেন না। যা বলি, তাই দিয়ে কিনে নেন জিনিসটা। তাই আমিও বেশি ঘাঁটাই না ওঁনাকে। কখন কোন্ আচরণে আবার উনি রাগ করেন, হাতছাড়া হয়ে যায় এমন শাঁসাল একজন কাস্টোমার, তাই কিছু জিজ্ঞেসও করি না।

কিন্তু কৌতূহল তো সবারই থাকে। একদিন জয় হলো কৌতূহলেরই। সেদিন দুপুরে এলেন ভদ্রলোক। যথারীতি খোঁজ করলেন মামির। 'পেয়েছ কোনও মামি?'

'না, সার, তবে খোঁজ করছি।' আসলে খোঁজ করছি না আমি, বলার জন্য বলা।

'এখনও পাওনি?' কেমন যেন ভেঙে পড়লেন ভদ্রলোক। 'দশ বছর ধরে খুঁজছি, পাইনি কোথাও, কেউ দেয় না।'

আমি সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম। 'এতদিন ধরে মামি খুঁজছেন কেন, সার?'

'কী করব?' আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক। 'তার আগে তুমি বলো যে নিজের সন্তান মারা গেলে কেমন লাগে মানুষের?'

এমন প্রশ্নে অবাক লাগল আমার। গলায় করুণ সুর ফুটিয়ে বললাম, 'দুঃখ হয়, সার।'

'দুঃখ? হ্যাঁ, দুঃখ বলতে পার। নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছেলেটা মারা গেলে পিতার দুঃখ হয় বৈকি। নিজের তরতাজা ছেলের শরীর মাটির গর্তে পড়ে থাকে। খসে-খসে পড়ে চামড়া-মাংস। খুবলে খায় পোকা। হাড়গোড়গুলো খালি পড়ে থাকে। তখন, তখন কষ্ট হয় বৈকি।' চোখ ছলছল করতে থাকে ভদ্রলোকের।

পরিষ্কার বুঝতে পারি আমি, ভদ্রলোকের ছেলে মারা গেছে। বোঝা যায়, খুব প্রিয় ছিল ওই সন্তান। সন্তান হারানোর সেই শোকের কথাই বলছেন উনি। মনটা খারাপ হয়ে যায় আমার। তবে, মামির ব্যাপারটা বুঝতে পারি না আমি। এর সথে মামির সম্পর্ক কী? মামি কেন দরকার?

আমার আর প্রশ্ন করা লাগে না, ভদ্রলোক নিজেই বলতে থাকেন, 'আমি মামি খুঁজছি, জানার জন্য যে কীভাবে বানায়। মিশরীয়রা মামি বানাত, তাতে

নষ্ট হত না মৃতদেহ। বছরের পর বছর ভাল থাকত শরীরটা। আমিও মামি বানাব। তা হলে আর কারও মৃতদেহ নষ্ট হবে না, খসে খসে পড়বে না মাংস, খুবলে খাবে না পোকা। আমার মত করে কাঁদতে হবে না আর কোনও পিতাকে।'

পুত্রশোকে ভদ্রলোক উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠেছেন, এটা বুঝতে পারি আমি। সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে আমার সামনে। বলতে কী, আধপাগল ওই লোকটার জন্য মনটা ভারি খারাপ হয়ে যায় আমার। আহা, বেচারা।

তারপর কেটে গেছে তিন মাস। দেখা নেই শফিকুল চৌধুরীর। নিজের ওপর রাগ হয় আমার। কী দরকার ছিল সেদিন আগ বাড়িয়ে অত কথা বলতে যাবার।...আমার কথায় মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন উনি, তাই আসছেন না। নিয়মিত জিনিস বেচা যেত ওঁনার কাছে, এই মন্দা বাজারেও। আমার ভুলেই এমনটা হলো। ধেত্তেরি!

এভাবে কেটে গেছে ছ'মাস। হঠাৎ একদিন হাজির ভদ্রলোক। ভারি খুশি হই আমি। যাক্ বাবা, বাঁচা গেল। সেদিন কিন্তু অন্যদিনের মত মামির খোঁজ করলেন না; একটা ছুরি পছন্দ করলেন উনি। হাতলে পাথরের কারুকাজ করা দেড়ফুট লম্বা একটা ভোজালী। চামড়ার খাপ। দামী জিনিস। কিন্তু দাম নিয়ে বরাবরের মত এবারও কোনও কথা বললেন না ভদ্রলোক। প্যাকেট করতে বললেন। প্যাকেট করতে করতে কৌতূহলটা আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমার। থাকতে না পেরে, ভাল কাস্টোমার হারানোর ভয় উপেক্ষা করে, জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'মামি পেয়েছেন, সার?'

'মামি?' একটু যেন চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। 'না, পাইনি। তবে...'

'তবে?'

'আসলে... মামি বানাবার কায়দাটা আবিষ্কার করে ফেলেছি আমি।'

'মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

'মানে, একটা ওষুধ বানিয়েছি। ওটা খেলে শরীর পচে না মৃতদেহের। একদম তাজা থাকে বছরের পর বছর। এমনকী পোকা-মাকড়ও ধরে না।'

আমি বুঝতে পারি, ভদ্রলোক যা বলছেন তার পুরোটাই অবাস্তব। বিশ্বের তাবৎ বড় বড় বিজ্ঞানীরা মামি তৈরির কায়দা জানতে মাথা কুটে মরছেন। মৃতদেহকে শুধু ওষুধ দিয়ে সংরক্ষণ করা যায় না বছরের পর বছর। এমন অবস্থায়, এসব কথা, অবাস্তব তো বটেই। বুঝি, এগুলো ভদ্রলোকের উন্মাদ অবস্থার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আসলে উনি মানসিকভাবে অসুস্থ। তাও, ভদ্রতাবশত বলি, 'বলেন কী! এটা তো বিশাল আবিষ্কার!'

'হ্যাঁ। তবে একটা ঝামেলা আছে।'

'কী ঝামেলা?'

'ঝামেলা হলো, ওষুধটা খেতে হয় মারা যাবার ঠিক আগে। কিন্তু, মরার ঠিক আগের মুহূর্তটা যে কোন্‌টা সেটা বোঝা যায় না।'

'কেন? তখনই খেতে হয় কেন?'

'কারণ,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলেন ভদ্রলোক, 'কারণ, ওটা বিষ। খেলেই মরতে হবে। তাই কার ওপর যে পরীক্ষা করব বুঝতে পারছি না।'

'তাও ঠিক।' হাসি চেপে বলি আমি। বুঝি, এসব পাগলের প্রলাপ মাত্র। মানিব্যাগ বের করেন ভদ্রলোক, ছুরির দাম মেটাবেন।

'আমার কাছে পাঁচশো টাকা কম পড়ছে। তুমি বরঞ্চ ক্রেডিট কার্ডে দামটা রাখো।'

এই সুযোগটার অপেক্ষাতেই ছিলাম আমি, যে-কোনও এক ছুতোয় ভদ্রলোকের বাসাটা দেখে আসব একদিন। অনেকদিন থেকেই আমার কৌতূহল। তাই মিথ্যে বললাম, 'আমার কার্ড সিস্টেমটা যে সার কাজ করছে না।'

'তা হলে?'

'কোনও অসুবিধা নেই। আপনি পাঁচশো টাকা কমই দিন। আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যান, আমি গিয়ে বাকি টাকা নিয়ে আসব,' নির্দ্বিধায় বলি আমি। কারণ ওই পাঁচশো টাকা না পেলেও আমার খুব ক্ষতি হবে না, আমি ওটা ছাড়াই পাঁচশো টাকা লাভ করে ফেলেছি। আর ভদ্রলোক যেমন, তাতে এই ক'টা টাকার জন্য উনি আমাকে ঘোরাবেন না। আর, সবচেয়ে বড় লাভ এই ছুতোয় আজব মানুষটার বাড়িটা দেখে আসা হবে।

'ঠিক আছে,' বললেন শফিকুল চৌধুরী। একটা কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এতে আমার ঠিকানা লেখা আছে। সন্ধ্যা সাতটার পর আমাকে বাড়িতেই পাবে।'

দিন তিনেক পর ঠিকানামত ওঁনার বাসায় পৌছালাম। হাতির পুলের গলিতে তিনতালা বাড়ির দোতালায় ওঁনার নিবাস। দরজায় নেমপ্লেটে বড় বড় করে নাম লেখা। নামের নীচে লেখা দেখে বুঝি, উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন একসময়, রসায়ন বিভাগে। কিন্তু কলিংবেল বাজিয়েও কারও সাড়া পেলাম না। বুঝলাম, কেউ নেই বাড়িতে। হতাশ হয়ে ফিরে আসছিলাম। এমন সময় মোটাসোটা এক ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন, আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাউকে খুঁজছেন?'

'জ্বী। শফিকুল চৌধুরী সাহেব।'

'উনি তো নেই।'

'তাই ভেবেছিলাম। ঠিক আছে, আমি আরেকদিন আসব।'

'আসলে,' ভদ্রলোক বলেন, 'মারা গেছেন চৌধুরী সাহেব।'

'মারা গেছেন?' ভয়ানক চমকে উঠি আমি।

'হ্যাঁ। গত পরশু দুটোর দিকে হঠাৎ ওঁনার আর্তচিৎকার শুনতে পাই আমরা। পাশের ফ্ল্যাটেই থাকি, ছুটে এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকি। দেখি বুকে হাত দিয়ে যন্ত্রণায় আর্তচিৎকার করছেন ভদ্রলোক। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেয়া হয় ওঁনাকে। ডাক্তাররা দেখেই বললেন, বিষ খেয়েছেন উনি। অনেক চেষ্টা

করলেন ডাক্তাররা, কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। আসলে ছেলে হারানোর শোক সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন ভদ্রলোক।'

'আত্মহত্যা?'

'তা ছাড়া আর কী! আহা, পাগলাটে হলেও, বড় ভাল লোক ছিলেন।'

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় আমার। না, টাকার জন্য নয়। ওঁনার কাছ থেকে অনেক লাভ করতাম আমি, সে তুলনায় ও ক'টা টাকা কিছুই নয়। আসলে, পুত্রশোকে কাতর ভদ্রলোকের জন্য বেশ একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল আমার।

তারপর কেটে গেছে প্রায় পনেরো দিন। ওঁনার স্মৃতি প্রায় ঝাপসা হয়ে আসছে। সকালে নাস্তা শেষে চায়ে চুমুক দিতে দিতে চোখ বুলাচ্ছিলাম খবরের কাগজে। এক কোনার একটা খবর চোখে পড়ল হঠাৎ, লাশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রির জন্য কবরস্থান থেকে লাশ চোরের দল তিনটি লাশ তুলে ফেলেছিল। তখন তারা ধরা পড়ে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, একটি লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত, পচেনি একটুও। লাশটি মেডিকেলে রাখা আছে। কেমন একটা সন্দেহ উঁকি মারতে থাকে ভেতরে ভেতরে। কাপড়-জামা পড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি আমি। ঠিক করি দোকানে যাওয়ার আগে একবার মেডিকেলে যাব আমি। ওই অক্ষত লাশটা না দেখা পর্যন্ত শান্তি নেই আমার।

মেডিকেলের কেয়ারটেকার আমার পূর্ব পরিচিত। তাই সহজেই লাশ ঘরে যেতে পারি।

কেয়ারটেকার লাশের মুখ থেকে কাপড়টা সরাতেই ভয়ানক চমকে উঠলাম আমি। যা ভেবেছিলাম তাই। শুয়ে আছেন শফিকুল চৌধুরী। মনে হচ্ছে, ঘুমোচ্ছেন; জেগে উঠেই আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'মামি আছে, মামি?' এত জীবন্ত হয় কোনও মানুষের মুখ! কেয়ারটেকার ভদ্রলোক জানান, 'আমি জীবনে এমন আজব ঘটনা দেখিনি। লাশের গায়ে পচন ধরেনি এতটুকু। তবে ভদ্রলোকের কোনও আত্মীয়-স্বজন আসেননি; তাই বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে আজ দুপুরেই ওঁনার দাফন করবে আঞ্জুমান মফিদুলের স্বেচ্ছাসেবী দল। আর একটুপর এলেই আর দেখতে পেতেন না। আপনি কি ওঁনার কেউ হন?'

'না, আমি ওঁনার কেউ হই না।' আচ্ছন্নের মত স্থান ত্যাগ করি আমি।

সারাটা দিন আমার কাটে স্থবিরের মত। বারবার মাথায় আসতে থাকে শফিকুল চৌধুরীর মৃত মুখ। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ওই বিষটি উনি নিজের ওপরই পরীক্ষা করেছিলেন। আর উনি যা বলেছিলেন সেটা পাগলের প্রলাপ ছিল না। আমি বুঝতে পারি রসায়নের অধ্যাপক শফিকুল চৌধুরী দীর্ঘদিনের চেষ্টায় আসলেই এমন একটা ওষুধ তৈরি করেছেন। অস্থির লাগে আমার। ভাল লাগে না দোকানে বসে থাকতে। কী করব বুঝতে পারছি না।

পরদিন দোকানে এসে উকিলের লোক একটা চিঠি দিয়ে গেল আমাকে। ওটা নাকি মৃত্যুর পর আমাকে দিতে বলেছিলেন শফিকুল চৌধুরী। কাঁপা কাঁপা হাতে খামটা খুলি আমি। ভেতরে একটা পাঁচশ' টাকার নোট, বুঝি–সেই

ছুরিটার বাকি দাম। সাথে একতাড়া কাগজ। গোটাটা জুড়েই ক্ষুদে ক্ষুদে ইংরেজি অক্ষরে কীসব লেখা। লেখাটার শিরোনাম হচ্ছে–'হাউ টু মেক আ মামি', সোজা কথায়–'মামি তৈরির নিয়ম!'

কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকি আমি। ভদ্রলোকের বোধকরি সাতকুলে কেউ ছিল না, তাই আমাকেই দিয়ে গেছেন যুগান্তকারী ওই আবিষ্কারের ফর্মুলা। সে যাই হোক, সাদা কথাটা হচ্ছে মামি কেমন করে তৈরি করা যায় তার নিয়ম এখন আমার হাতে। কিন্তু ইংরেজিতে আমি নিতান্তই কাঁচা, আর রসায়নের যেসব ফুর্মলা লেখা আছে ওতে, ওগুলো বোঝা আমার কম্ম নয়। তাই, একজন ব্যবসায়ী হিসেবে, চড়া দাম পেলে বেচতে পারি আমি এটা। আপনারা যদি কেউ কিনতে চান তা হলে যোগাযোগ করুন আমার সাথে। দোকানে যোগাযোগ করাই ভাল। ঠিকানাটা মনে রাখুন–গুলশান দুই নম্বর রোডের গোল চক্করের সাথে নতুন মার্কেট। দোতালা। দোকানের নাম– 'ওসমান'স কিউরিও শপ্। শুক্রবার বন্ধ।

আসমার ওসমান

ভয়ঙ্কর সেই ঝোড়ো সন্ধেয়

কী যে বিচিত্র মানুষের মন! একেকজনকে আকর্ষণ করে একেক জিনিস। এমন অনেক মানুষও আছেন পৃথিবীতে, যাঁরা কেবল বাজার করেই প্রচুর আনন্দ পান। বাড়ির আশপাশের প্রতিটি হাট-বাজারে যাবেন তাঁরা, তারপর ফিরে এসে সবাইকে ফলাও করে বলবেন, কত বাড়ল বা কমল চাল-আলু-পটল-মাছ-মাংস ডালের দাম। আর বলাই বাহুল্য, গল্পের এক ফাঁকে তাঁরা প্রমাণ করে দেবেন যে, কোন কিছু কেনার বেলাতেই তাঁদের ঠকানো অত সহজ নয়। আমার আকর্ষণ দুটো–বই এবং আতঙ্ক। বইয়ের পোকা আমি, দুর্লভ বই খুঁজে বের করা আমার নেশা। তিন চার শতাব্দী আগের অনেক রোমাঞ্চকর বই আছে ল্যাটিন ভাষায় লেখা। তাই একসময় ল্যাটিনও শিখে নিয়েছি। বই ছাড়া আর ছুটেছি আতঙ্কের পেছনে। কোথাও আতঙ্ককর কিছু আছে শুনলে ছুটে যাই আমি সেই ঠিকানায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেবল হতাশই হতে হয়। কোন গোরস্থানে প্রতি মাঝরাতে ভূত বের হয় শুনে সেখানে গিয়ে হয়তো দেখা গেল, সেই ভূত আসলে একটা কালো বিড়াল! কিংবা কোন বাড়িতে এক রাতের বেশি কেউ থাকতে পারে না শুনে ছুটে গিয়ে দেখা গেল, যাবতীয় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ইঁদুরের পাল। আতঙ্কের সন্ধানে কোথায় না গেছি আমি!

ওহ্ হো, নিজের পরিচয়টাই দেয়া হয়ে উঠেনি এখনও। নাম আমার আশরাফুল ইসলাম। ব্যবা-মার একমাত্র সন্তান। তাঁরা গত হয়েছেন অনেক আগেই, আর যাবার আগে এতটাই রেখে গেছেন আমার জন্যে যে উড়ানোর ইচ্ছে থাকলেও উড়িয়ে দেয়া কঠিন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ.। বিয়ে করিনি এখনও, তবে জোর কথাবার্তা চলছে। অনেকগুলো মিল, ফ্যাক্টরি আছে আমার। সেসবে কালেভদ্রে ঢুঁ মারা ছাড়া এই দুই আকর্ষণ নিয়েই আছি। দেখাশোনা যা করার ম্যানেজারেরাই করে। ব্যাটাদের পুকুর চুরির সংবাদ আমার অজানা নয়। তবে তারপরেও আমার জন্যে যা থাকে...তাই ওসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামাই না। থাকি নওগাঁয়। সেখান থেকে ছুটে গেছি চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, সিলেট, বরিশাল, ঢাকা, দিনাজপুর, রাজশাহী, পঞ্চগড়, খুলনা, বাগের হাট, রংপুর–কোথায় নয়! কিন্তু দুর্লভ অনেক বই সংগ্রহ করতে পারলেও আতঙ্ক আমাকে এড়িয়েই গেছে। কেবল একবার...তা হলে খুলেই বলি ঘটনাটা।

সালটা ছিল ১৯৮৯। অক্টোবর মাস। একটা কাজে গিয়েছিলাম নিয়ামতপুর। সেখানেই শুনলাম, পোরশার পাশের গ্রাম গাংগুরিয়ার এক বাড়িতে নাকি ভয়ঙ্কর এক ভূতের বাস, যে শুধু ভয়ই দেখায় না, বাড়ির অধিবাসীর সঙ্গে লড়াই পর্যন্ত করে। তৎক্ষণাৎ রওনা দিলাম। কিন্তু গোমস্তাপুর পেরিয়ে যেতেই আকাশ হঠাৎ কালো হয়ে এল। শনশন বইছে বাতাস, যে-কোন মুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে

মুষলধারে বৃষ্টি। এদিকটায় এলে বিশ্বাসই হয় না, বাংলাদেশে এত মানুষ। মাইলের পর মাইল পড়ে আছে ধু-ধু মাঠ, বাড়িঘরের চিহ্নমাত্র নেই। ভেতরে ভেতরে যখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি, সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই চোখে পড়ল দোতলা একটা বাড়ি। রাস্তা ছেড়ে বাড়িটার বারান্দায় উঠে মোটর সাইকেল স্ট্যাণ্ড করতেই শুরু হলো ঘন বৃষ্টি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, অনেক দিন থেকে বাড়িটাতে কেউ থাকে না। এদিক-সেদিক আগাছা জন্মেছে, বারান্দায় পুরু হয়ে আছে ধুলোর স্তর। কিন্তু ভেতর থেকে আসছে চার্জারের আলো। কড়া নাড়লাম জোরে জোরে। কোন সাড়াশব্দ নেই। অনেকক্ষণ পর ধাক্কা দিতেই ক্যাঁচ করে খুলে গেল দরজা। দ্রুত নেমে আসছে আঁধার। ভেতরে ঢুকলাম। ঘরটার পলেস্তারা এখানে-সেখানে খসে পড়েছে। কোত্থেকে যেন ভেসে আসছে গা গুলিয়ে তোলা একটা দুর্গন্ধ।

বাড়িটার কোথায় যেন ওত পেতে রয়েছে দারুণ এক রহস্য। এগোলাম। দ্বিতীয় ঘরটাতেই চার্জার জ্বলছে। সেখানে কয়েকটা আলমারি আর র‍্যাক, সবগুলোই বইয়ে ঠাসা। এমন জায়গায় এরকম একটা লাইব্রেরি দেখব আশা করিনি। আরও অবাক হলাম, যখন লক্ষ করলাম, সবগুলো বই-ই সুদৃশ্য চামড়ায় বাঁধাই করা। লাইব্রেরির মাঝখানে একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার। একটা বই পড়ে আছে টেবিলের ওপর। হাতে নিয়ে কয়েক পাতা ওলটাতেই বুঝলাম, বইটা খুব দুর্লভ, কঙ্গো অঞ্চলের নরমাংসভোজীদের নিয়ে লেখা। অনেক ছবি রয়েছে বইটাতে। ১৩ নং ছবিটায় দেখা যাচ্ছে কসাইয়ের এক দোকানের দৃশ্য। ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। পরক্ষণেই মনে মনে নিজেকে গালি দিলাম এরকম সামান্য একটা বিষয় নিয়ে চঞ্চল হবার জন্যে।

পাশের র‍্যাক থেকে একটা বই টেনে নিয়ে দেখছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দ ভেসে এল ওপরতলা থেকে। কান পাতলাম। হ্যাঁ, কে যেন পায়চারি করছে। তা হলে আমি কড়া নাড়ানোর সময় সাড়া দিল না কেন? পরে মনে হলো, লোকটা নিশ্চয় ঘুমাচ্ছিল এতক্ষণ, এইমাত্র জেগেছে। কয়েক মিনিট পর সিঁড়িতে পদশব্দ পাওয়া গেল। ভারী পদশব্দ, কিন্তু তার মধ্যেই যেন অদ্ভুত এক সতর্কতা মেশানো।

শব্দ এগিয়ে এল ক্রমে। একটু পরেই একটা লোক এসে দাঁড়াল লাইব্রেরির দরজায়। বৃদ্ধ, মুখভর্তি সাদা ধপধপে দাড়ি। লম্বায় ভদ্রলোক ছয় ফুটের ওপরেই হবেন, বয়সের তুলনায় অনেক শক্ত গড়নের। মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক রকমের লাল, আর তাতে কুঞ্চন নেই বললেই চলে। মাথার সাদা চুল অনেকটাই পাতলা হয়ে এসেছে, তীক্ষ্ণ চোখজোড়ায় মর্মভেদী দৃষ্টি। পোশাক-পরিচ্ছেদ কেমন যেন অগোছাল আর তাঁর অপরিচ্ছন্নতা বর্ণনাতীত।

ভদ্রলোককে প্রথম দর্শনে একটা শিহরণ জেগেছিল। কিন্তু তিনি যখন আমাকে একটা চেয়ারে বসতে ইশারা করেন, নিজেও বসে কথা বলে উঠলেন, তাতে ঝরে পড়ল আতিথেয়তার সুর।

'বৃষ্টিতে আটকা পড়েছেন, তাই না? ভাগ্যিস সময়মত এখানে এসে পড়েছিলেন, আশেপাশে তো আর কোন বাড়ি নেই। আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে

পড়েছিলাম। আপনার মত তো আর কম বয়স নয় আমার, এখন তাই দুপুরে একটু না ঘুমালে চলে না। দূরে কোথাও যাচ্ছিলেন? বেশির ভাগ লোকই এদিক দিয়ে যায় না আর।'

আমি কোন জবাব দিলাম না।

'আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম, নতুন মুখ আর চোখেই পড়ে না আজকাল। একসময় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি, অথচ এখন আর শহরের দিকেও যাই না। তবে শহুরে মানুষ দেখলেই চিনতে পারি, এই যেমন আপনি। শেষ একজন শহুরে মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে অনেক দিন আগে। '৮৪ সালে। মোহনপুরের এক ব্যবসায়ী, বগুড়ায় থাকতেন, কিন্তু আমার এখান থেকে যাবার পরেই হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন ভদ্রলোক–' খুক খুক হেসে উঠে থেমে গেলেন বৃদ্ধ, জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও আর কোন ব্যাখ্যা দিলেন না। সময় কাটতে লাগল। বাইরে থেকে ভেসে আসছে ঝড়ের গর্জন। ভাবছিলাম, টেবিলের ওপর পড়ে থাকা বইটা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত হবে কিনা। শেষমেশ কৌতূহল চেপে রাখা আর সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। তবে প্রশ্ন করার পর দেখলাম, ভালই হয়েছে। ভদ্রলোক খুব সহজভাবেই নিলেন ব্যাপারটা।

'ওহ্, আফ্রিকা সম্বন্ধে লেখা বইটা? '৫৮ সালে ওটা আমাকে দিয়েছিলেন ক্যাপটেন আমুণ্ডসেন। দুঃখের বিষয়, কিছু দিন পরেই ম্যাকাওয়ের এক জুয়ার আড্ডায় ভদ্রলোক মারা যান গুলিবিদ্ধ হয়ে।'–সামান্য থেমে আবার বলে চললেন বৃদ্ধ।

'অনেক দিন ধরে বাণিজ্যিক এক জাহাজের ক্যাপটেন ছিলেন আমুণ্ডসেন, অদ্ভুত সব জিনিস কিনতেন বন্দরে বন্দরে। যত দূর সম্ভব এই বইটা কিনেছিলেন তিনি লণ্ডন থেকে। একবার গিয়েছিলাম তাঁর ডেনমার্কের বাড়িতে। বইটা দেখে এত পছন্দ হলো যে, চেয়ে বসলাম লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে। তিনিও সেদিন খুব খোশ মেজাজে ছিলেন, দিয়ে দিলেন এক কথায়। বইটা অদ্ভুত জানেন, এই যে দেখুন–দাঁড়ান, আমার চশমাটা–' পকেট হাতড়ে গোল লেন্সের ইস্পাতের ফ্রেমের একটা চশমা বের করে পরলেন বৃদ্ধ, তারপর পাতাগুলো ওলটাতে লাগলেন পরম যত্নে।

'বইটা ল্যাটিন ভাষায় লেখা। আমুণ্ডসেন পড়তে পারতেন। আমি পারি না। অনেক খুঁজে রংপুরের এক হিন্দু কেরানী পেয়েছিলাম–অম্বর রায়। চাকুরিও দিয়েছিলাম তাঁকে উচ্চ বেতনের, কিন্তু সপ্তাহখানেক পরেই এক সকালে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ কোথায় যে চলে গেলেন ভদ্রলোক–হয়তো বসে বসে এক বুড়োকে বই পড়ে শোনানোর মত অলস কাজ তাঁর ভাল লাগেনি। অম্বর রায় গেলেন...হ্যাঁ, মনে পড়েছে। '৮১ সালে। তা, আপনি নিশ্চয় ল্যাটিন জানেন না?' জানি শুনে শিশুর মত হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। দ্রুত কয়েক পাতা অনুবাদ করে শোনালাম। কোন সংকোচ ছিল না আমার, হঠাৎ ভুল হলেও তিনি তো আর তা ধরার মত পণ্ডিত নন।

'ভাবলে অবাক লাগে,' বললেন বৃদ্ধ, 'ছবি কী ভাবে মানুষকে এত আকর্ষণ

করতে পারে? এই যে এই ছবিটা দেখুন, এত বড় পাতাঅলা গাছ দেখেছেন কখনও? কিংবা এই ছবিটার মত মানুষ? লক্ষ করুন, মানুষগুলোর শরীর কাফ্রিদের, অথচ মুখ রেড ইণ্ডিয়ানদের মত। আর এই ছবির জীবগুলো দেখুন, অর্ধেক বানর অর্ধেক মানুষ। এই ধরনের জীব আমি কখনও দেখিনি। আপনি দেখেছেন? দেখুন, দেখুন, এই ছবিটা–' এবারে শিল্পীর আঁকা এক কল্পিত জীবনের ছবি দেখালেন বৃদ্ধ, যার দেহটা ড্রাগনের মত অথচ মাথাটা কুমিরের।

'কিন্তু এবারে আপনাকে দেখাব বইয়ের শ্রেষ্ঠ ছবিটা,' স্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল বৃদ্ধের, চোখজোড়ায় খেলা করতে লাগল অদ্ভুত এক আলো। পাতা উল্টে তিনি বের করলেন আমারই দেখা ১৩ নং ছবিটা। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঁকা হয়েছে কসাইয়ের দোকানের দৃশ্য। দেয়ালের গায়ে লাগানো আংটা থেকে ঝুলছে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আবার শিরশিরে ভাবটা ফিরে এল আমার, কিন্তু বৃদ্ধ ছবিটাকে রীতিমত উপভোগ করছেন।

'কেমন লাগছে ছবিটা? প্রথমবারেই আমি আমুণ্ডসেনকে বলেছিলাম, এত দিনে একটা সত্যিকারের চাঞ্চল্যকর ছবি দেখলাম। নরমাংসভোজীদের সম্বন্ধে বইয়ে পড়েছি অনেক, কিন্তু ছবি দেখিনি কখনও। ছবি দেখার মজাই আলাদা, সবকিছু একেবারে জীবন্ত মনে হয়। নরমাংসভোজন পাপ কাজ, কিন্তু আমরা কি সর্বক্ষণ পাপের মাঝেই বসবাস করছি না?–জানেন, এই ছবিটা দেখলে বুড়ো বয়সেও উত্তেজনা আসে আমার, ঠাণ্ডা স্নায়ু চঞ্চল হয়।–তাই তো মাঝে মাঝে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকি। দেখুন, পায়ের কোন্ জায়গায় কুড়াল চালিয়েছে কসাইটা বেঞ্চের ওপরে রাখা মাথাটা দেখেছেন? আংটা থেকে ঝোলানো দুই বাহু? দেখছেন ভাল করে? একদম জীবন্ত না?'

স্বর শুনে এখন মনে হচ্ছে, বৃদ্ধ যেন পৌঁছে গেছেন সুখের স্বর্গে কিন্তু তাঁর স্বর না চড়ে নেমে গেল আরও গভীরে। আমার অবস্থা বলার মত নয়, সরসর করে একটা সাপ যেন ওঠানামা করছে মেরুদণ্ড বেয়ে। বৃদ্ধ যে পাগল কিংবা কিছুটা হলেও বিকৃত মানসিকতার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবার কথা বলতে লাগলেন তিনি ফিসফিস করে। খসখসে সেই ফিসফিসানি চিৎকারের চেয়েও ভয়ঙ্কর, শুনতে শুনতে পাতার মত কাঁপতে লাগলাম আমি।

'আগেই বলেছি, ভাবলে অবাক লাগে, ছবি কী ভাবে মানুষকে এত আকর্ষণ করতে পারে! আমুণ্ডসেনের কাছ থেকে বইটা নেয়ার পর প্রায়ই ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। বিশেষ করে বগুড়ার সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক উধাও হয়ে যাবার পর থেকে আকর্ষণ আরও বাড়ল। তারপর একদিন--ভয় পাবেন না, ইয়াংম্যান–পরীক্ষা করে দেখার শখ হলো আমার ভাবলাম, এতে দোষের কিছু নেই এই অঞ্চলটাতে খুব ভেড়া পাওয়া যায়। এক সন্ধেয় চুপ করে ধরে নিয়ে এলাম একটা ভেড়া, তারপর লম্বা একটা ছুরি দিয়ে...সত্যি বলতে কী,' ভেড়া টুকরো টুকরো করে আংটাতে ঝুলিয়ে রাখলে দেখতে খুব মজা লাগে–লক্ষ করেছেন কখনও?' স্বর তাঁর এখানে এতটাই নেমে গেল যে, শোনা যায় কি যায় না। ঝর ঝর করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, গুড় গুড় করছে সারা আকাশ। হঠাৎ ঝলসে

উঠল তীব্র আলো, কানফাটানো শব্দে বজ্রপাত হলো আশপাশেই কোথাও, থর থর করে কেঁপে উঠল পুরো বাড়িটা। কিন্তু বৃদ্ধের এসব দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই।

'ভেড়া টুকরো টুকরো করে আংটাতে ঝুলিয়ে রাখলে দেখতে খুব মজা লাগে সত্যিই, কিন্তু একদিন তাতেও আর মজা পেলাম না। আসলে দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে! ছবি দেখার পাশাপাশি দেশ ভ্রমণের কিছু স্মৃতি আমাকে অস্থির করে তুলল। আফ্রিকায় থাকতে শুনেছি, আদিবাসীদের কেউ কেউ বলাবলি করত, আপন জাতির রক্ত আর কাঁচা মাংস নাকি তেজ বাড়ায়, এমনকী ব্যাপারটা নিয়মিত করতে পারলে অনন্ত জীবন লাভও সম্ভব'—থেমে গেলেন বৃদ্ধ, তাঁর দুই চোখ এখন ঠিক দুই টুকরো আগুনের মত ধকধক করে জ্বলছে।

বীভৎস ছবিটা বুকে মেলে ধরে পড়ে রইল বইটা আমাদের মাঝখানে। কারও মুখে কথা নেই। এমন সময় ওপর থেকে টপাৎ করে কী যেন একটা জিনিস পড়ল খোলা বইটায়। ভাবলাম, পুরানো বাড়ির জীর্ণ ছাদ চুইয়ে নিশ্চয় বৃষ্টির ফোঁটা নেমে এসেছে। কিন্তু বৃষ্টির রঙ কি লাল হতে পারে? সরসর করে খাড়া হয়ে গেল মাথার পেছনের প্রত্যেকটা চুল, হাত-পা একদম অসাড় হয়ে গেল। তাকালেন বৃদ্ধ ওপরদিকে, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকালাম আমি তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে। ঘণ্টাখানেক আগে যে-ঘর থেকে তিনি নেমে এসেছেন, সেটার ছাদের এক জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়ে প্রায় ফুটো হয়ে গেছে, আর সেই ফুটোতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে টকটকে লাল একটা রঙ! কতক্ষণ ওভাবে তাকিয়েছিলাম জানি না। চিৎকার করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর হঠাৎ তীব্র এক বজ্রপাত আমাকে অসাড়তা থেকে মুক্তি দিল। তখন কী ভাবে লাফিয়ে উঠেছিলাম, কী ভাবে এক দৌড়ে গিয়ে মোটর সাইকেল স্টার্ট দিয়ে অভিশপ্ত ওই বাড়ি ছেড়ে তুমুল বৃষ্টিপাতের মধ্যেই রাস্তায় উঠে এসেছিলাম, আর কী ভাবেই বা শেষমেশ পৌঁছেছিলাম নওগাঁয়, সে সব স্পষ্ট করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

খসরু চৌধুরী

প্রায়শ্চিত্ত

আমার নাম মানিক। আমি আপনাদের আমার দুঃখের কাহিনি শুনাতে বসেছি। তার আগে বলি, এটা আমার প্রায়শ্চিত্তের কাহিনি। যার ফল আমি এখনও ভোগ করে চলেছি। জানি না আর কতকাল ভোগ করতে হবে। তা হলে, আমার কাহিনি শুরু করি।

এস.এস.সি পরীক্ষায় ফেল করার পর পড়াশোনাটা ছেড়েই দিলাম। বাবা এবং বড় ভাইয়ের আদেশ অমান্য করে কুসঙ্গে পড়ে দু'হাতে টাকা ওড়াতে লাগলাম। প্রথমে ধরলাম মদ, তারপর জুয়ো। বাড়ি থেকে চুরি করে ধান চাল বিক্রি করে জুয়োর টাকা জোগাড় করি। রাতে মদ খেয়ে বাসায় ফিরি। বাবা এবং বড় ভাই নানাভাবে বুঝাতে লাগলেন। শেষে বাবা হুমকি দিলেন, কথা না শুনলে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। ওইদিনই আমার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে বাবার জমানো টাকা এবং ধান লুট করে নিয়ে এলাম। বাবা সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন কীর্তিটা কার। স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন বাবা। তিনি সম্ভবত বুঝতে পারেননি, এতটা উচ্ছন্নে আমি কীভাবে গেলাম। যখন আলমারি থেকে জমানো টাকাগুলো নিচ্ছি, বাবা শুধু বললেন, 'তুই আমার বুকটা পুড়িয়ে দিলি বাবা, তোরও বুকটা পুড়বে।'

বাবার এ হাহাকার আমি কানেই তুললাম না। এ আঘাত বাবা সইতে পারলেন না। ঠিক আট দিনের মাথায় বাবা মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুতে কোন পরিবর্তন হলো না আমার কর্মকাণ্ডের। আমি জানতাম সব সম্পত্তি বাবা বড় ভাইকে দিয়ে যাবেন। আর বড় ভাইকে পটিয়ে সম্পত্তি কেড়ে নেয়া কোন কঠিন কাজ নয় আমার জন্য। যথারীতি বড় ভাইকে ধরলাম সম্পত্তির জন্যে। বড় ভাই বলল, 'তোর হাতে পড়লে সব নষ্ট হবে। তা ছাড়া তুই বাবাকে কষ্ট দিয়েছিস।' ওইদিনই রাতে মাতাল হয়ে বড় ভাইয়ের গায়ে হাত তুললাম। বড় ভাই রাজি হলো অর্ধেক সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিতে। সম্পত্তি, জমি পেয়েই শ্যামলীকে বিয়ে করলাম। অবশ্য সম্বন্ধ করে নয়, তাকে আমি তুলে নিয়ে এলাম। সে অবশ্য আমাকে এখন দোষারোপ করে এবং নিজের বুক চাপড়ায় বলে, 'তুমি তোমার অভিশপ্ত জীবনের সাথে আমাকে জড়িয়ে আমার জীবনটাকেও অভিশপ্ত করেছ।' ঠিক কথা, আমি স্বীকার করি। আমাদের প্রথম সন্তান রতনের জন্মের পরে, শ্যামলী সন্তানের গায়ে হাত রেখে আমাকে কসম করাল, ওসব ছেড়ে দেয়ার জন্যে। আস্তে আস্তে আমি ভাল হয়ে যাচ্ছিলাম। জুয়ো ছেড়েছি। প্রতিবেশীদের মুরগী, ছাগলগুলো এখন নিরাপদে ঘুরে বেড়ায়। মাঝরাতে মাতাল হয়ে এসে আর শ্যামলীর গায়ে হাত তুলি না। একটু একটু সামাজিক কাজেও অংশগ্রহণ করি। যদি পারি, টাকা পয়সা দিয়ে গ্রামের অভাবী মানুষদের সাহায্য করি। ধান, চাল

ধার চাইতে এলে পারতপক্ষে খালি হাতে ফিরিয়ে দিই না। আমার বড় ছেলের বয়স চার বছর হলো। শ্যামলী জানাল, সে দ্বিতীয়বারের মত মা হতে চলেছে। তাকে বললাম, 'আমি এবার মেয়ের বাপ হতে চাই।' এভাবে আস্তে আস্তে আমি অন্য মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছিলাম। যাদের সাথে ঝগড়া ছিল, যেচে পড়ে ঝগড়া মিটিয়ে ফেললাম। দ্বিতীয় ছেলের জন্মের আগের রাতে শ্যামলী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নের কথা বলে বলে সে কাঁদতে লাগল। বলল, সে স্বপ্নে দেখেছে, আমার বাবা তাকে ডেকে বলছে, 'বৌমা, আমি তোমার কোলে আসছি। কিন্তু বেশিদিন থাকব না। আমাকে তোমরা রাখতে পারবে না।' শ্যামলী তার শ্বশুরকে থাকার জন্যে খুব অনুরোধ করল, কিন্তু তিনি কিছুতেই থাকলেন না। তারপর দিন একটা সুস্থ সবল ছেলে হলো আমাদের। স্বপ্নের কথা ভেবে কয়েকদিন মন খারাপ থাকল আমাদের। কিন্তু আস্তে আস্তে সব ভুলে যেতে চেষ্টা করলাম। ছেলেকে নিয়ে গেলাম ওঝা, বৈদ্য, ফকির, দরবেশের কাছে। ঝাড়ফুঁক করালাম। ছেলে আমার বেশ নাদুস-নুদুস। চারবছরে পড়ল ছেলে। দু'ছেলেকে নিয়ে ভীষণ সুখী আমরা। দান-খয়রাত করি। ছেলে সারা উঠোন ঘুরে বেড়ায়, তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। একদিন শ্যামলীকে বললাম, 'বাজারে যাচ্ছি, কী আনতে হবে বলো।' ছেলে দুটোকে আদর করে বাজারে চলে গেলাম। তখনও কি জানতাম, আমার বুক পোড়ার শুরু তখন থেকে? বাজার থেকে ফেরার পথে শুনতে পেলাম আমার ছোট ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে দেখলাম শ্যামলী কাঁদছে। তাকে বেশ বকলাম, ছেলেকে দেখে রাখতে পারে না বলে। তারপর খুঁজতে বের হলাম। হঠাৎ করে চার বছর আগের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল। সৃষ্টিকর্তাকে ডাকলাম। মৃত বাবাকে ডেকে ক্ষমা চাইলাম। হঠাৎ কুয়োর দিক থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। দৌড়ে গিয়ে দেখলাম, এ যে আমার বুকের ধনের মৃতদেহ। বেচারা, ছোটছেলে সাঁতার কাটতে পারে না, কুয়োয় পড়ে গিয়েছিল। দম ফেটে নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। আমরা কাঁদলাম, প্রতিবেশীরা কাঁদল। দেখলাম, শ্যামলী স্বপ্নের কথা ভেবে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তোমার পাপে এমন হলো। তুমি খুনী।'

দ্বিতীয় ছেলের মৃত্যুর পরে বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম একদিন। বাবা বলছে, 'কিরে খোকা, কেমন আছিস? আমাকে তুই সুখ দিসনি। আমার সম্পত্তি নষ্ট করেছিস। আমার বুক পুড়িয়ে দিয়েছিলি তুই। তোর বুক পুড়ছে, কেমন লাগছে তোর?' বাবার কাছে কেঁদে কত ক্ষমা চাইলাম। বাবা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বিদায় নিলেন। তারপর থেকে ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটে আমাদের। পরের উপকার করে পাপ কাটাবার চেষ্টা করি। জানি না কতটা পাপ কমেছে। শ্যামলী আবার জানাল সে মা হতে যাচ্ছে। অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক কাঁপে আমাদের। দিন রাত সৃষ্টিকর্তাকে ডাকি। গ্রামের ফকির মিসকিনদের ডেকে খেতে দিই। যাবার সময় টাকা গুঁজে দিই আর আমার অনাগত সন্তানের জন্যে দোয়া চাই। বৌয়ের বাচ্চা হওয়ার সময় এলে চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠি। দু'জনেই ঘুমোতে ভয় পাই। যদি স্বপ্নে বাবা দেখা দেন! যদি অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আমার আর বৌয়ের শরীর গেল

ভেঙে। ঠিকমত খাওয়া নেই, ঘুম নেই। শেষে ভাগ্যকে মেনে নিয়ে বৌকে বললাম, 'বৌ, যা হওয়ার হবে, কী আর করব, পাপ করেছি। ফল ভোগ করতে হবে।' বৌ কাঁদে। আর বিলাপ করে। অবশেষে কোনরকম দুঃস্বপ্ন দেখা ছাড়াই বৌ এক পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। ফুটফুটে ছেলে আমার। মন্দিরে মসজিদে মানত করলাম ছেলের জন্যে। তারপর দুই বছরের মাথায় আরও এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। ছেলে তিনটাকে নিয়ে আমার সুখের সংসার। মাঝে মাঝে স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। ভয়ে ভয়ে দিন কাটাই। দান খয়রাত করি।

একরাতে স্বপ্নে আবার দেখা দিলেন বাবা, যখন আমার দ্বিতীয় ছেলের বয়স চার হলো। বাবা বললেন, 'মানিকরে, অনেকদিন হলো, তোর কাছে থাকলাম, যাবার সময় হলো, বিদায় দে।' বাবাকে থাকার জন্যে হাতে পায়ে ধরে সাধলাম। বাবা পুকুরঘাটের দিকে নেমে গেলেন। স্বপ্নের কথা শ্যামলীকে বললাম না। প্রতিদিন অপেক্ষা করি কবে ঘটবে ঘটনাটা। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিই বা করতে পারি। বৌকেও দেখলাম কেমন মনমরা। বুঝলাম, সেও স্বপ্ন দেখেছে আবার। কিন্তু আমরা কেউ কাউকে স্বপ্নের কথা বললাম না। দু'জনেই অপেক্ষা করতে থাকি, কবে আমাদের দ্বিতীয় ছেলে কুয়োয় ডুবে মারা যাবে। আমাদের শাস্তি দেয়ার জন্যে বাবা বারবার জন্ম নিয়ে কুয়োয় ডুবে মারা যাচ্ছে একই বয়সে, একই সময়ে, এবং একই তারিখে। দান খয়রাত করি না আর, কী হবে করে! অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছি। আমি জানি, আমার নিস্তার নেই, মুক্তি নেই। ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে। কাল ১৪ ডিসেম্বর, আমার দ্বিতীয় ছেলের কুয়োয় ডুবে মরার দিন!

জ্যোৎস্না খীসা

শিশুসাপ

'সার, দক্ষিণ কোণে ওই যে ডুমুর গাছের ঝোপ–ওইহানে য্যান যায়েন না!'

'কেন?'

'ওই ঝোপের মধ্যে "শিশু সাপ" আছে!'

'শিশু সাপ? সে আবার কী?'

'পানির দেও!'

হাসি পেলেও চেপে রেখে পুকুরের দক্ষিণ কোণে বেশ ঘন ডুমুর-ঝোপের দিকে একবার তাকিয়ে পুকুরের মালিক জসিম মিয়াকে বললাম, 'আচ্ছা, তা দেখা যাবে! বড় মাছ আছে তো আপনার পুকুরে?'

'তা আছে, সার!'

'তা হলেই হলো...'

আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমি একজন মৎস্য শিকারী!

শ্রাবণ মাসের ঘনঘোর বর্ষা এখন। আকাশ মেঘলা হলেও সুন্দর এই সকালে বৃষ্টি নেই।

পুকুরের মালিক জসিম মিয়া চলে যেতেই কী মনে করে দক্ষিণ দিকের ওই ডুমুর ঝোপের পাশেই সাজিয়ে বসে 'চার' দিলাম। টোপ, পিঁপড়ের ডিম সব ঠিকঠাক করে একখানা সিগারেট ধরালাম। ছিপও একটাই। আমি নতুন সৌখিন মৎস্যশিকারী। সরকারী চাকরি করি–জসিম মিয়া আমার মক্কেল। আজ ছুটির দিন–তাই তার পুকুরে মাছ ধরার জন্যে এসেছি। সঙ্গে পিওন বা কাজের লোক কাউকেই আনিনি–একাই এসেছি। যা হোক, আল্লার নাম নিয়ে বড়শিতে টোপ দিয়ে পুকুরে ফেললাম।

গ্রামের মানুষজন খুব ভোরে ওঠে। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে জটলা করলেও কাছে কেউ এল না। সম্ভবত সম্মান করেই।

হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হলো। প্রথমে হালকা ভাবে। একটু পরে মুষলধারে। তবে চিন্তার কিছু নেই! সঙ্গে ছাতা আছে।

পুকুরটা বেশ বড়–চারদিকে নানান গাছ-ঝোপঝাড়। আমাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও দক্ষিণ কোণের ডুমুর ঝোপের পাশে বসেছি।

প্রায় আট-দশ মিনিট পরে–হ্যাঁ, সেই ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির মধ্যেই শুনতে পেলাম। প্রথমে মনে হলো কোন নবজাতক শিশু যেন ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে মৃদুশব্দে কেঁদে উঠল! আশপাশে এই বৃষ্টির মধ্যে কেউ নেই–কেবল ছাতা মাথায় আমি একা! ভয় না পেলেও কৌতূহল হলো আমার। এই বৃষ্টির মধ্যে পুকুর পারে শিশু আসবে কোথা থেকে? মনের ভুল ভেবে ফাত্‌নার দিকে মনোযোগ দিলাম। হঠাৎ শিউরে উঠলাম। হ্যাঁ! স্পষ্ট শুনতে পেলাম–ডুমুর ঝোপের মধ্য

থেকে শিশুর খল্ খল্ হাসির শব্দ ভেসে এলো! 'কীরে, ভয় পেলি?' খনখনে গলা ভেসে এল ডুমুর ঝোপের ভিতর থেকে।

এবং দেখলাম, হ্যাঁ, সত্যি একজোড়া হলুদ জ্বলজ্বলে চোখ ওই ঝোপের ভিতর থেকে ভেসে উঠল–! আমি সম্মোহিতের মত সেদিকে, সেই ডুমুর ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলাম। আর তখন লম্বা লক্‌লকে জিভ দিয়ে আমার গলা পেঁচিয়ে ধরল কে যেন!

আ খ ম খায়রুল আলম

অশুভ প্রহর

ভয়াবহ সেই দিনটির কথা মনে করলে আজও আতঙ্কে আমার হাত-পা হিম হয়ে আসে। অবিশ্বাস্য সেই কাহিনিই শোনাব এখন—আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগত। সুযোগ পেলেই কোথাও না কোথাও ঘুরতে চলে যেতাম। একবার তৌহিদ নামে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিল। আমি এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। গ্রামটি পাবনার এক প্রত্যন্ত গ্রামে, আজকালকার মত তখন যাতায়াতের এত সুবিধা ছিল না। বাসে, রিকশা করেও পুরোটা পথ যাওয়া যায় না। কয়েক মাইল পায়ে হেঁটে যেতে হয়। তৌহিদ প্রকৃতি, নদী-চাঁদ, গাছপালা, পাখির ডাক এসব মিলিয়ে সে তার গ্রামের একটি ফাটাফাটি সৌন্দর্যের বর্ণনা দিল।

নির্দিষ্ট দিনে দু'জন রওনা দিলাম। সারারাত বাসে কয়েক ঘণ্টা বসে তারপর গ্রামের উঁচু-নিচু-এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় ভয়ঙ্কর রিকশা ভ্রমণ—সবার শেষে খেতের আইল ধরে হাঁটা, সব মিলিয়ে বেশ কষ্ট, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা হলো অ্যাডভেঞ্চারের মত, তাই যত কষ্ট মনে হলো ততই বুঝি মজা।

তৌহিদের বাড়ি পৌঁছে অবশ্যি বেশ আশাভঙ্গ হলো। গ্রামটা যেরকম সুন্দর হবে মনে করেছিলাম সেরকম নয়। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ যাবার পথে মাঝামাঝি একটি ছোট্ট স্টেশনে নেমে গেলেই এরকম গ্রাম পাওয়া যায়। তবে গ্রামের মানুষজন খুব সহজ সরল। শহর থেকে এসেছি শুনে আমাদের খাতির যত্ন করার জন্য সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রথমদিনটা কোনমতে পার করে দ্বিতীয় দিনেই আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। সুন্দর জায়গা বলেই আমার চোখে ভেসে ওঠে খোলামেলা একটা জায়গার ছবি। কিন্তু এখানে সবই কেমন যেন ঘিঞ্জি। তৌহিদের অবশ্যি খুব উৎসাহ। যেটাই দেখে সেটাই দেখে বলে, 'চমৎকার! তাই না?'

আমি তার মনে ব্যথা দিতে পারি না। তাই মাথা নেড়ে বলি, 'ঠিকই বলেছিস, চমৎকার।'

সময় কাটানোর জন্য আমি তখন গ্রামের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম এখানে দেখার মত কী আছে। অনেক চিন্তা করে কয়েকজন উত্তর দিল, মাইল তিনেক দূরে একটা পুরোনো হিন্দু মন্দির আছে। গ্রামের মানুষের কাছে সেটাই খুব দর্শনীয় একটা জিনিস মনে হলেও আমার তিন মাইল হেঁটে একটা পুরোনো ভাঙা হিন্দু মন্দির দেখতে যাওয়ার কোন ইচ্ছা করল না, তাই কখনও একা আবার কখনও তৌহিদকে নিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এক সময় আবিষ্কার করলাম জায়গাটা সত্যিই খুব সুন্দর।

যেমন বট গাছটার কথা ধরা যাক। গ্রামের শেষ মাথায় একটা বিশাল

বটগাছ। এত বড় বটগাছ জীবনে দেখিনি। গাছের মোটা কাণ্ডের মাঝে বয়সের ছাপ। সেই বটগাছটার নীচে বসে পাখির কিচির-মিচির ডাক শুনি। কত রকম পাখি এই গাছটায় আসে তার হিসেব নেই।

এই বটগাছের নীচে বসেই আমার আরেকজন মানুষের সাথে পরিচয় হয়। মানুষটা বাঙালিদের তুলনায় বেশ লম্বা। গায়ের রং ফর্সা ছিল। রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীদের মত লম্বা চুল আর জট পাকানো দাড়ি। গায়ে কুচকুচে কালো রংয়ের লম্বা আলখাল্লা। চোখে সুরমা। প্রথম দর্শনেই তাকে আমার আধ্যাত্মিক টাইপের মানুষ বলে মনে হলো। মানুষটার নাম রবিশঙ্কর। এই গ্রামেই থাকে। কাজ কর্ম কিছু করে বলে মনে হয় না। কথা বলতে বলতেই অন্যমনস্ক হয়ে দূরে তাকিয়ে থাকে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

রবিশঙ্কর খুব বেশি কথা বলে না। তার কাছে জানতে পারলাম এই গ্রামের শেষে নদীর তীরে নাকি একটা শ্মশান ঘাট আছে। আমার দেখার কৌতূহল হলো। রবিশঙ্কর তখন আমাকে শ্মশান ঘাট দেখাতে নিয়ে চলল। গ্রামের পথ ধরে যাচ্ছি। মানুষজন আমাদের দেখে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। একটা ছোট বাচ্চাকে তার মা যেভাবে জাপটে ধরে সরিয়ে নিয়ে গেল তা দেখে আমার মনে হলো গ্রামের লোকজন রবিশঙ্করকে ভয় পায়।

রবিশঙ্করের কাছে শ্মশান ঘাটের কথা শুনে যেরকম ধারণা হয়েছিল গিয়ে দেখি সেরকম কিছু নয়। নদীর তীরে একটা বাঁধানো ঘাট ভেঙেচুরে আছে। তার পাশে বড় একটা জায়গা, সেখানে ভাঙা হাঁড়িকুড়ি আর আবর্জনা। খানিকদূরে ভাঙাচোরা বেশ কিছু ছোট ছোট মন্দির। জায়গাটার একটা বিশ্রী চেহারা। অবশ্য শ্মশান ঘাটের চেহারা খুব সুন্দর হবে সেরকম কোনও যুক্তি নেই।

রবিশঙ্কর এতক্ষণ কথাবার্তা বলছিল, কিন্তু শ্মশান ঘাটে এসে হঠাৎ একেবারে চুপ মেরে গেল। আমার কোনও কথারই উত্তর দেয় না। মানুষটা ঠিক স্বাভাবিক না, তাই তাকে না ঘাঁটিয়ে ফিরে এলাম।

তৌহিদের বাড়ি আসার পথে দেখতে পেলাম আমাকে নিয়ে আসার জন্য কিছু লোক হন্তদন্ত হয়ে আসছে। এতক্ষণে গ্রামে খবর ছড়িয়ে গেছে যে, রবিশঙ্কর আমাকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটি এত গুরুতর কেন প্রথমে বুঝতে পারলাম না। তাদের সাথে কথা বলে সেটা পরিষ্কার হলো, রবিশঙ্কর নাকি পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক। তার অলৌকিক ক্ষমতা। মন্ত্র বলে সে মানুষকে ছাগল বানিয়ে দিতে পারে। চোখের দৃষ্টি দিয়ে যে কোন কিছু জ্বালিয়ে দিতে পারে। অমাবশ্যার রাতে তার বাড়িতে ভূত-প্রেত আর পিশাচেরা নেমে আসে। তখন নাকি সেখানে নরবলি দেওয়া হয়। শুনে আমার ভীষণ কৌতূহল হলো। ভূত-প্রেত আমি বিশ্বাস করি না। এই প্রত্যন্ত গ্রামে রবিশঙ্করের মত একটা মানুষ গ্রামের সবাইকে ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখেছে–মানুষটার নিশ্চয়ই একটা বিশেষত্ব আছে। সেটা আমার জানার খুব কৌতূহল হলো।

সেদিন রাতে খাবার পর তৌহিদকে বললাম, 'তৌহিদ, চল্ এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।'

'এত রাতে? কোথায় যাবি?'

'রাত কোথায়! চট্টগ্রামে থাকতে এখনও আমাদের সন্ধ্যাই হত না–এখানে বলছিস রাত!'

'কিন্তু যাবি কোথায়?' তৌহিদ প্রশ্ন করে।

'রবিশঙ্করের বাড়িতে।'

তৌহিদ আঁতকে উঠল, 'রবিশঙ্করের বাড়িতে? কেন?'

'লোকটাকে আমার ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে, একটু কথা বলে আসি।'

তৌহিদ হেসে বলল, 'কথা বলতে চাইলে এই মাঝরাতে কেন? দিনের বেলায় গেলি না কেন?'

আমি বললাম, 'সে নাকি প্রেত সাধক। প্রেত সাধকের সাথে দিনে কথা বলে লাভ কী, আর দেখলি না দিনের বেলা কী হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল!'

তৌহিদ তবুও ইতস্তত করতে থাকে। তখন আমি একাই রওনা দেব বলে ভয় দেখালাম, তাতে কাজ হলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল যাই।'

গ্রামের মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। কাউকে জিজ্ঞেস করে রবিশঙ্করের বাড়ি খুঁজে বের করতে হলে সমস্যা হয়ে যেত। তবে তৌহিদের মোটামুটি ধারণা আছে। গ্রামের একেবারে শেষ মাথায় রবিশঙ্করের বাড়ি। বাড়ির সামনে বড় বড় দুটো তাল গাছ। অনেক দূর থেকে নাকি গাছ দুটো দেখা যায়।

অন্ধকার রাতে দুজন কথা বলতে বলতে যাচ্ছি। গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িতেই অন্ধকার বিরাজ করছে। হঠাৎ হঠাৎ কোনও বাড়িতে একটি দুটি আলো জ্বলছে। মাঝে মাঝে কুকুর ডাকছে। তবে গ্রামের কুকুর খুব নিরীহ, কখনও তেড়ে আসে না।

রবিশঙ্করের বাড়ির সামনে বড় বড় দুটি তাল গাছ, কাজেই খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। খেয়াল করলাম, তার বাড়ির আশপাশে আর কোনও বাড়ি নেই। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, তবু মনে হলো বাড়িটাই ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। চারপাশে ঝোপঝাড়, পেছনে বড় বড় গাছে লতা-পাতায় জঙ্গল হয়ে আছে। এত রাতে একজনের বাড়ি এসে তাকে ডেকে তুলতে সংকোচ হচ্ছিল। কিন্তু তৌহিদ কোনরকম দ্বিধা না করেই গলা ছেড়ে ডাকল, 'শঙ্করদা বাড়ি আছেন?'

কয়েকবার ডাকাডাকি করতেই খুট করে দরজা খুলে গেল এবং রবিশঙ্কর বের হয়ে এল, বলল, 'কে?'

'আমরা,' তৌহিদ একটু এগিয়ে বলল, 'আমি তৌহিদ, মোল্লা বাড়ির তৌহিদ। আর এ আমার বন্ধু, চট্টগ্রাম থেকে এসেছে।'

রবিশঙ্কর কোনও কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। তার শরীর থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ এসে ভক্ করে নাকে লাগল, তৌহিদ বলল, 'শঙ্করদা কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

'না, আমার ঘুমাতে দেরি হয়।'

'ও, ঘরে আলো নেই দেখে ভাবলাম ঘুমিয়ে গেছেন।'

রবিশঙ্কর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু পরেই চাঁদ উঠবে, তখন একটু আলো হবে।'

তৌহিদ বলল, 'শঙ্করদা, আমার এই বন্ধুর সাথে তো আপনার দেখা হয়েছে, সে আপনার সাথে কথা বলতে এসেছে।'

রবিশঙ্কর আবছা অন্ধকারের মাঝে কোথা থেকে একটা ভাঙা জলচৌকি এনে ঝেড়ে দিয়ে বলল, 'বসেন।' নিজে অসংকোচে মাটিতে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলেন।'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আপনার সাথে যখন বটগাছের নীচে দেখা হয়, তখন জানতাম না আপনি একজন তান্ত্রিক, শুনে একটু কৌতূহল হলো তাই ভাবলাম আপনার সাথে একটু কথা বলে যাই।'

রবিশঙ্কর কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বললাম, 'গ্রামের মানুষজনের কাছে শুনেছি আপনি নাকি পিশাচ সিদ্ধ তান্ত্রিক। আপনার কাছে নাকি ভূত-প্রেত-পিশাচরা আসে?'

রবিশঙ্কর এবারও কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল। আমি আবার বললাম, 'আমি কখনও ভূত-প্রেত দেখিনি। আপনার কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম।'

রবিশঙ্কর একটু নড়েচড়ে বসল, 'কী জানতে চাইছিলেন?'

'এসব কি আসলেই আছে?' আমি বললাম।

অন্ধকারে দেখতে পেলাম না, কিন্তু মনে হলো রবিশঙ্কর একটু হাসল, বলল, 'আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'না।'

রবিশঙ্কর কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল। আমি বললাম, 'কী হলো? চুপ করে আছেন কেন? কিছু একটা বলুন।'

'দেখুন, আপনি তো জিনিসটা আছে সেটাই বিশ্বাস করেন না। যেটা বিশ্বাস করেন না সেটা সম্পর্কে কী জানবেন? জেনে কী লাভ?'

আমি অন্ধকারে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, রবিশঙ্কর ঠিকই বলেছে। তবুও বললাম, 'জিনিসটা সম্পর্কে জানি না বলেই তো বিশ্বাস করার সুযোগ পাইনি। যদি দেখতে পেতাম–'

আমি কথা শেষ করতে পারলাম না, রবিশঙ্কর প্রায় ধমকে উঠল, 'আপনি দেখতে চান?' তার গলার স্বরে কিছু একটা ছিল। আমি চমকে উঠলাম।

আমতা আমতা করে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে যদি দেখতে পেতাম আর কী?'

তৌহিদ আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'কী বলছিস তুই? দেখতে চাস মানে? এর মধ্যে দেখার কী আছে?'

বুঝতে পারলাম তৌহিদ ভয় পেয়েছে। সত্যি কথা বলতে, অন্ধকার রাতে নির্জন একটা জায়গায় এভাবে বসে পিশাচ দেখার কথা চিন্তা করে আমারই কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। তবুও সাহস করে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি দেখতে চাই। দেখাতে পারবেন?'

রবিশঙ্কর বলল, 'আপনাদের সাহস আছে?'

সাহস নিয়ে খোঁটা দিলে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। আমি কঠিন গলায় বললাম, 'আছে, অবশ্যই আছে।'

'ভয় পাবেন না?'

তৌহিদ কিছু একটা বলতে চাইছিল কিন্তু আমি তাকে বলার সুযোগ দিলাম না। বললাম, 'না। ভয় পাব না।'

রবিশঙ্কর তবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। তা হলে দেখেন, দেখি আপনাদের বিশ্বাস হয় কিনা।'

তৌহিদ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখব?'

'যারা আসবে।'

'কারা আসবে?'

রবিশঙ্কর রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'রাতের বেলা যাদের নাম নিতে হয় না।'

রবিশঙ্কর তার ঘরের ভেতর ঢুকে গেল এবং কিছুক্ষণ পর কিছু জিনিসপত্র নিয়ে বের হয়ে এল। অন্ধকারে দেখা যায় না, তবু মনে হলো, একটা খুলি, কিছু ফুল, কিছু বাসনকোসন, গামছা–এইরকম ব্যবহারিক জিনিস।

রবিশঙ্কর আমাদের ডেকে বলল, 'আপনারা এইখানে বসেন।'

আমরা ইতস্তত করছিলাম, তা দেখে সে বলল, 'মাটিতেই বসতে হবে। কোন কিছু করার নাই।'

আমরা মাটিতে আসন পেতে বসলাম। রবিশঙ্কর মাটি থেকে একটা কাঠি তুলে নিল তারপর বিড়বিড় করে কী একটা পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে সে আমাদের ঘিরে একটা বড় গোল দাগ দিয়ে বলল, 'আপনদের চক্রবন্ধন দিয়ে দিলাম, কিছুতেই এই চক্র থেকে বের হবেন না। যতক্ষণ এর ভিতরে থাকবেন, ততক্ষণ আপনারা নিরাপদ। কোনও বিপদ হবে না।'

আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'কী বিপদ?'

'কত রকম বিপদ হতে পারে। যারা আসবে তারা কী করবে কে বলতে পারে!'

তৌহিদ আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'হাসান। বাদ দে। চল্, বাড়ি যাই।'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'পাগল হয়েছিস, খেলাটা দেখে যাই।'

'যদি সত্যি হয়?' তৌহিদ প্রশ্ন করে।

'ধুর, সত্যি হবে কেমন করে? তুই না কেমিস্ট্রিতে অনার্স করছিস, কখনও ভূতের কেমিকেল কম্পোজিশনে পড়েছিস?'

তৌহিদ কিছু বলল না। কিন্তু সে খুব স্বস্তি পেল বলে মনে হলো না, রবিশঙ্কর আমাদের সামনে একটা ছোট গোল দাগ দিল তারপর জীর্ণ মাদুর পেতে সেখানে বসল। তার এই কাজটা আমার কাছে বোধগম্য হলো না। সে পিশাচ সিদ্ধ তান্ত্রিক। তার আবার চক্রবন্ধনের কী প্রয়োজন? প্রশ্ন করব কিনা ভেবে পাচ্ছিলাম না।

আমার মনের কথা মনে হয় বুঝতে পেরে সে স্মিত হেসে বলল, ‘প্রেতেরা রেগে গেলে কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই, তাই সাবধান হওয়া ভাল।’

রবিশঙ্কর তার সামনে খুলিটা রেখে তার উপর একটা মোমবাতি জ্বেলে নিল। এরপর একটা থালায় আগুন জ্বালল। ছোট একটা পুঁটলি থেকে পাউডারের মত জিনিস বের করে আগুনের উপর ছুঁড়ে দিতেই কটকট শব্দ করে পুড়তে থাকল এবং একটা ঝাঁঝাল গন্ধ ভেসে আসতে লাগল। রবিশঙ্কর একটা পুরাতন লাল গামছা মাথায় বেঁধে নিল, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমি ডাকছি। মনে রাখবেন, যতই ভয় পান, এই চক্র বন্ধন থেকে বের হবেন না।’

তৌহিদ কাঁপা গলায় বলল, ‘ভয় পাব কেন?’

‘দেখবেন, নিজ চোখেই দেখবেন।’

রবিশঙ্কর দুই হাত উপরে তুলে হঠাৎ অনুচ্চ এবং দ্রুত গলায় কিছু একটা বলতে লাগল। শুনে আমার মনে হলো, সে বুঝি কাউকে তীব্র ভাষায় গালাগাল করছে। একটানা কথা বলে সে এক মুহূর্তের জন্য থামল। হঠাৎ ঘাড়ের পিছনে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেলাম শিউরে উঠল শরীরটা ক্রমেই বাড়ছে বাতাসের বেগ। মোমবাতির মাথায় আগুনের শিখাটা উন্মত্তের মত দাপাদাপি করল কিছুক্ষণ, তারপর নিভে গেল। রবিশঙ্কর চাপা গলায় বলল, ‘আসছে, ওরা আসছে।’

আমি, তৌহিদ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলাম। রবিশঙ্কর ঠিকই বলেছিল, কৃষ্ণপক্ষের রাতের আকাশে সত্যি সত্যি এখন চাঁদ উঠেছে। রবিশঙ্কর আবার হাত উপরে তুলে আকাশের দিকে মুখ করে বিড়বিড় করতে থাকল। হঠাৎ চারদিক অসম্ভব নীরব হয়ে গেল। অদ্ভুত রোমাঞ্চকর একটা নিস্তব্ধতা। ব্যাপারটি বুঝতে আমার একটু সময় লাগল। চারপাশে এতক্ষণ ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছিল হঠাৎ করে সব ঝিঁঝিঁ পোকার গুঞ্জন থেমে গেল। আমি কান পেতে থাকলাম। শুধু মনে হতে লাগল, এক্ষুণি বুঝি কিছু একটা ঘটবে

আচমকা কোথা থেকে একটা জন্তু সোজাসুজি আমাদের দিকে ছুটে এল চক্রের কিনারে এসেই হঠাৎ যেন বৈদ্যুতিক শক্ খেল জানোয়ারটা। ছিটকে সরে গেল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে, তারপর আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমার হৃৎপিণ্ড ধক ধক করছে মাথা ঘুরিয়ে প্রাণীটাকে দেখার চেষ্টা করলাম। দূরে গুড়ি মেরে বসে আছে। অন্ধকারে চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। জন্তুটার আকার-আকৃতি দেখে মনে হলো কুকুর। কিন্তু সাধারণ কুকুর থেকে অনেক বড়। প্রাণীটা নিঃশব্দে আবার আমাদের দিকে ছুটে এল, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। চাঁদের আলোয় জন্তুটাকে চিনতে পেরে শিউরে উঠলাম, টেলিভিশনে অনেকবার দেখেছি জন্তুটাকে কুকুর নয়, নেকড়ে। এই অঞ্চলে নেকড়ে কোথা থেকে এল ভেবে পেলাম না

রবিশঙ্কর এবার হাত দুটো নীচে নামিয়ে তার সামনে রাখা জিনিসপত্র থেকে ছোট্ট কৌটার মত একটা জিনিস তুলে নেয়। দড়ি দিয়ে সেটা একটা ছোট্ট লাঠির সাথে বাঁধা। লাঠিটা সে ধরে কৌটাটা ঘুরাতে ঘুরাতে আবার বিড়বিড় করতে থাকে। এতক্ষণ কথাগুলো ছিল তীব্র ভাষায় গালাগাল করার মত। এবারে সেটা

হলো একরকম অনুনয়ের মত। রবিশঙ্কর কাতর গলায় কাকে যেন ডাকছে।

আমি আর তৌহিদ অল্প অল্প কাঁপছি। রবিশঙ্করের বাড়ির পিছনে বাঁশঝাড়–গাছপালা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ নূপুরের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকল। আচমকা আমাদের সামনে দীর্ঘ দেহের কিছু একটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মানুষের মত, কিন্তু মানুষ নয়। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। চাঁদের আবছা আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় না, শুধু অবয়বটা বোঝা যায়। একজন মানুষের চামড়া ছিলে নিলে যেরকম দেখা যাবে অনেকটা সে রকম। কুৎসিত মূর্তিটা এক পা এগিয়ে আসে। পায়ে নূপুর বাঁধা, সেখান থেকে এক ধরনের শব্দ হয়। ছায়ামূর্তিটির চুল উড়ছে। উৎকট পচা মাংসের গন্ধ নাকে ঢুকল। মুখ দিয়ে বমি বের হয়ে আসতে চাইল। কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকলাম, আমি টের পাচ্ছি, তৌহিদ থরথর করে কাঁপছে। হঠাৎ আমাদের উপর চটচটে আঠাল ক্লেদাক্ত জিনিস পড়তে লাগল। কিছু বোঝার আগেই তৌহিদ লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করে ছুট লাগাল। আমি তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। শুনতে পেলাম কে যেন খনখনে গলায় হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। তৌহিদ ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু মাঝপথে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। দেখলাম অসংখ্য নেকড়ে গর্জন করে তাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু গলা থেকে আওয়াজ বেরুল না। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম, রবিশঙ্কর নিজের চক্রবন্ধন থেকে বের হয়ে তৌহিদের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এরপর আর কিছুই আমার মনে নেই।

জ্ঞান ফেরার পর দেখি কে যেন আমার মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছে। চারপাশ আলোকিত দেখে বুঝলাম সকাল হয়েছে। রাতের কথা মনে পড়তেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। পাশে দাঁড়ানো তৌহিদকে ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রবিশঙ্কর কোথায়?'

উত্তরে সে উঠানের এক কোণে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম জীবনেও তা ভুলব না। রবিশঙ্করের কুণ্ডলী পাকানো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ পড়ে আছে। চোখ দুটো খোলা। না দেখেও বুঝতে পারলাম, খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে বেচারা।

'এ কী করে হলো?' তৌহিদকে প্রশ্ন করলাম।

সে বলল, 'নেকড়েগুলো যখন আমাকে আক্রমণ করে, রবিশঙ্কর তখন দৌড়ে এসে আমাকে ধাক্কা মেরে পাশের ঝোপে ফেলে দেয়, এরপর দেখলাম নেকড়েগুলো রবিশঙ্করের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর তোর মত আমিও জ্ঞান হারাই।'

বুঝতে পারলাম রবিশঙ্কর নিজের চক্রবন্ধন থেকে বের হওয়ায় নেকড়েগুলোর শিকারে পরিণত হয়েছে। তার একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল, 'প্রেতেরা রেগে গেলে কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই।'

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, এখানে আর এক মুহূর্তও নয় কিন্তু রবিশঙ্করের লাশের একটা ব্যবস্থা না করে চলে যেতে মন সায় দিচ্ছিল না। যতই সে প্রেত

সাধক হোক, আমার জন্যই তার আজ এই অবস্থা। মনের মধ্যে একটা পাপবোধ জন্ম নিল। সে তার জীবনের বিনিময়ে তৌহিদের জীবন বাঁচিয়েছে একথাও ভুললাম না।

তার খোলা চোখ দুটোর দিকে চাইলাম। ওই চোখ দুটো যেন আমায় বলছে, 'কী গো, শহুরে মানুষ, এবার বিশ্বাস হলো?' আস্তে করে তার চোখ দুটো বুজিয়ে দিলাম। তারপর একবারও পিছনে ফিরে না তাকিয়ে দুই বন্ধু গ্রামের দিকে রওনা দিলাম। রবিশঙ্করের সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

কামরুল হাসান

বাঘ

প্রচণ্ড শীতে থরথর করে কাঁপছে রতন। গায়ে চাদর আছে, পাশে বেশ বড় করে আগুন জ্বেলেছে কিন্তু এতসব আয়োজন করেও মাঘ মাসের এই প্রচণ্ড শীত বশে আনা যাচ্ছে না। রতন নিরালা আবাসিক এলাকার নাইট গার্ড। অল্প কিছুদিন আগে সে এই চাকরিটা নিয়েছে কিংবা বলা যায় নিতে বাধ্য হয়েছে। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য কিছু একটা তো করতে হবে। তাই বাধ্য হয়ে এই চাকরিটা নিয়েছে। মোটেই সুখকর কোন চাকরি না এটা। সারারাত ঘুমের বারোটা বাজিয়ে জেগে থাকতে তো হয়ই, তার উপর গত কিছুদিন ধরে যুক্ত হয়েছে বাঘের ভয়। গত পাঁচদিন হলো খুলনা শহরে প্রতি রাতে একটা করে লাশ পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিটা লাশ পাওয়া গেছে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায়। যেন কোন হিংস্র জন্তু প্রচণ্ড আক্রোশে ছিঁড়ে কামড়ে একাকার করেছে লাশগুলোকে। পেপারে এ নিয়ে প্রতিদিন লেখালেখি হচ্ছে ডাক্তারদের মতে কোন মানুষের পক্ষে এভাবে হত্যা করা সম্ভব না। শুধমাত্র বুনো কিছু হিংস্র প্রাণী, যেমন–বাঘ, সিংহ, নেকড়ে বা হায়না এ ধরনের প্রাণীর পক্ষেই এভাবে হত্যা করা সম্ভব। খুলনা কেন সারা বাংলাদেশের কোন বনেই সিংহ, নেকড়ে বা হায়েনা নেই। কিন্তু বাঘ আছে, এই খুলনার সুন্দরবনেই। ডাক্তারদের এই মতের উপর ভিত্তি করে সারা খুলনা শহর চষে ফেলা হয়েছে কিন্তু কোথাও বাঘের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। হতভাগ্য লাশগুলোর আশপাশেই বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। সুন্দরবন থেকে বিশাল ভৈরব নদী পার হয়ে খুলনা শহরে ঢোকা কোন বাঘের পক্ষে সম্ভব না। আর যদি কোনভাবে ঢুকেও থাকে তা হলে কোথায় লুকিয়ে থাকছে বাঘটা, সেটা এখন পর্যন্ত বের করা সম্ভব হয়নি। রাত দূরের কথা, মানুষ এখন দিনের বেলাতেও ঘরের বাইরে বের হতে ভয় পাচ্ছে। গতকাল রতন একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল। চায়ের দোকানের মালিক কাদের ভাইয়ের দেশের বাড়ি সুন্দরবনের পাশেই এক গ্রামে সেখানে একটা গল্প প্রচলিত আছে, সুন্দরবনের মির্জা বাড়ি এলাকায় অনেক আগে মির্জা আসাদ ওয়ালি নামে এক জমিদার বাস করতেন। একটা পোষা বাঘ ছিল তাঁর। বাঘটাকে হিংস্র করে তোলার জন্য প্রায়ই তাকে অল্প খাবার দেয়া হত। একদিন কীভাবে যেন বাঘটা খাঁচা থেকে বের হয়ে আসে। জমিদার তখন তাঁর বাগানে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। অভুক্ত বাঘটা ক্ষুধার জ্বালায় তার মনিবকেই আক্রমণ করে বসে। জমিদারের ভাগ্য ভাল, মারা যাননি তিনি কিন্তু গুরুতর আহত হন মির্জা আসাদ ওয়ালি যেদিন আহত হন, সে রাতেই নিখোঁজ হয়ে যান। কথিত আছে, এরপর থেকে প্রতি রাতে আকাশে চাঁদ ওঠার পর থেকে তিনি বাঘের রূপ ধারণ করেন এবং প্রতি রাতে একটা না একটা খুন করেন। মির্জা আসাদ ওয়ালি আহত হবার

পর থেকে প্রতি রাতেই একজন করে গ্রামবাসী মায়া বাঘের আক্রমণে মারা যেতে থাকল। গ্রামের মানুষ মায়া বাঘের ভয়ে একে একে গ্রাম ত্যাগ করতে লাগল। ধীরেধীরে পুরো গ্রাম জনশূন্য হয়ে গেল। শোনা যায়, আজও সেই মায়া বাঘ মির্জা বাড়ির কাছেপিঠে ঘুরে বেড়ায়। আজও সুন্দরবনের আশপাশের গ্রামের মানুষ প্রায় রাতেই সেই মায়া বাঘের রক্তহিম করা গর্জন শুনতে পায়। কাদের ভাইয়ের মতে বাঘরূপী মির্জা আসাদ ওয়ালি আজ প্রায় একশো বছর পর জঙ্গল ছেড়ে শহরে চলে এসেছেন। দিনের বেলায় মানুষরূপে থাকলেও রাতে তিনি বাঘের রূপ ধারণ করে একের পর এক হত্যা করে চলেছেন। রতন জানে এটা কল্পকাহিনি ছাড়া কিছুই না। কিন্তু বাঘ তো একটা আছেই, যেটা প্রতি রাতে নির্মম ভাবে একটার পর একটা হত্যা করে চলেছে।

আবার কেঁপে উঠল রতন। শীতে না ভয়ে তা নিজেও ঠিক বুঝতে পারল না। হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ শুনে চমকে ঘুরে তাকাল। নাইটগার্ডের ইউনিফরম পরা একজন লোক ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিরাতে দুজন করে নাইটগার্ড এই এলাকা পাহারা দেয়। এই লোকটাকে ও আগে কখনও দেখেনি। নতুন বোধহয়। লোকটা একটু হেসে রতনের পাশে এসে বসল।

'নতুন নাকি? কবে জয়েন করলা?' রতন জিজ্ঞেস করল।

বিদঘুটে ভাবে একটু হাসল লোকটা।

'আজকেই,' বলল লোকটা।

'নাম কী?'

'জলিল।'

'ঘটনা শুনছ নাকি?' একটু উদাস ভাবে জিজ্ঞেস করল রতন।

'কী ঘটনা?' চোখ দুটো সরু করে জিজ্ঞেস করল জলিল।

নিজে পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও কাদের ভাইয়ের কাছে শোনা ঘটনাটা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য করে বলে গেল রতন। কিছু কথা বানিয়ে যোগ করতেও ভুলল না। গল্প বলা শেষ করে লোকটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রতন। হিংস্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

'আপনি এইসব বিশ্বাস করেন!' রাগত স্বরে জিজ্ঞাসা করল সে।

'বিশ্বাস না করার কিছুই নাই, অনেক আজব ঘটনা ঘটে এই দুনিয়ায়,' দার্শনিকের মত জবাব দেয় রতন, লোকটাকে ভড়কে দিতে পেরে মনে মনে খুশি হয়েছে সে।

ক্রুর হাসি হাসল জলিল চোখদুটো যেন মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল।

'ঠিকই বলেছেন, অনেক আজব ঘটনা ঘটে এই দুনিয়ায়। যে মায়া বাঘের কথা আপনি ভাবছেন সে হয়তো আপনার আশপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে কিংবা মানুষরূপে আপনার সামনেই রয়েছে, আপনি হয়তো বুঝতেও পারছেন না,' ধক করে জ্বলে উঠল জলিলের চোখজোড়া।

ভয়ের একটা শীতল শিহরণ বয়ে গেল রতনের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা অশুভ চিন্তা উঁকি দিচ্ছে মনের ভিতরে। সত্যি না তো কাদের ভাইয়ের কাছে শোনা

ঘটনাটা? হয়তো সত্যিই কোন মায়া বাঘ আছে, হয়তো মির্জা আসাদ ওয়ালি নামে সত্যিই কারও অস্তিত্ব আছে যে শহরে এসে প্রতি রাতে নির্মম ভাবে একটার পর একটা হত্যা করছে। জলিলের দিকে তাকাল রতন। কী যেন একটা অশুভ ব্যাপার আছে লোকটার চোখদুটোতে।

হঠাৎ মনের মধ্যে উঁকি দিল ভয়ঙ্কর চিন্তাটা, বুঝতে পারল কী ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আছে সে। আবার জলিলের দিকে তাকাল রতন। এখনও সেই ভয়ঙ্কর হাসিটা লেগে আছে জলিলের ঠোঁটে।

'তা হলে এতক্ষণে চিনতে পারলে আমি কে?' বাজ পড়ল যেন লোকটার কণ্ঠ থেকে।

ঢোক গিলল রতন। বুঝতে পারছে কাদের ভাইয়ের কাছে শোনা গল্পটা মোটেও বানোয়াট না। কিন্তু বুঝেও আর কোন লাভ নাই, মৃত্যু ওর থেকে মাত্র দুই ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আবার বিশ্রী করে হেসে উঠল জলিল, কিন্তু এবারের হাসিটা আর ভয়ঙ্কর শোনাল না, বরং মনে হলো কিছুটা ব্যঙ্গ করে হাসছে জলিল। অবাক হয়ে তাকাল রতন। জলিলের হাসি যেন থামতেই চায় না। হাসির দমকে চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসছে।

'আপনি...আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন। আপনি তো দেখি, মিয়া, ভয়ে প্যান্ট খারাপ করে ফেলেছেন,' হাসতে হাসতে বলল জলিল।

এতক্ষণে রতন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারল। লোকটা এতক্ষণ যা বলেছে সব মিথ্যা। রাগ হলো রতনের। কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না।

'তুমি কি মনে করেছ, তুমি যা বলছ আমি তা বিশ্বাস করেছি? তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি। শুধুমাত্র ভয়ের অভিনয় করেছি।' জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল রতন।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে আবার হেসে উঠল জলিল। বুঝিয়ে দিল রতনের কথা সে বিশ্বাস করছে না।

'আমি তোমার কথা এক বর্ণও বিশ্বাস করিনি,' ঝিক করে জ্বলে উঠল রতনের চোখ জোড়া, 'আমি প্রথম থেকেই জানি তুমি মিথ্যা কথা বলছ, তুমি মায়া বাঘ না।'

'আচ্ছা, তো কী করে বুঝতে পারলেন আমি মায়া বাঘ না?' জিজ্ঞাসা করল জলিল।

'আমি জানি তুমি মায়া বাঘ না,' ঘরঘর করে উঠল রতনের কণ্ঠস্বর, 'কারণ মায়া বাঘ আমি নিজেই।'

অবিশ্বাস ভরে রতনের দিকে তাকাল জলিল।

হঠাৎ ধক করে জ্বলে উঠল রতনের চোখ জোড়া, চোখ তুলে তাকাল পূর্ণিমার বিশাল চাঁদটার দিকে। ঘনঘন নিশ্বাস নিতে শুরু করল, যা অতি দ্রুত রূপান্তরিত হলো চাপা গোঙানিতে। চোখের কালো মণি বদলে গিয়ে হলুদ রং ধারণ করল। হলুদ হয়ে উঠল চামড়া, শরীর ফুঁড়ে বেরুতে শুরু করল থোকা থোকা লোম। কান দুটো আকারে বড় হয়ে উঠল। ফাঁক হয়ে গেল রতনের মুখটা, চোয়ালে ঝিকিয়ে

উঠল ক্ষুরধার দাঁতের সারি। রূপান্তরের যন্ত্রণায় হাত দিয়ে মাটি খামচে ধরল রতন, চোখের নিমিষেই ও দুটো পরিণত হলো বিশাল রোমশ থাবায়। ধীরে ধীরে রতন পরিণত হলো এক বিরাট রয়েল বেঙ্গল টাইগারে।

বিকট এক গর্জন ছেড়ে জলিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘরূপী রতন, ওরফে এককালের প্রতাপশালী জমিদার, মির্জা আসাদ ওয়ালি।

আগুনটা একটু উস্‌কে দিল রতন। শীতটা যেন আজকে একটু বেশিই পড়েছে। হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ শুনে চমকে ঘুরে তাকাল। নাইটগার্ডের ইউনিফরম পরা একজন লোক ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা একটু হেসে রতনের পাশে এসে বসল।

'নতুন জয়েন করলা মনে হয়,' একটু হেসে বলল রতন।

'আজকেই,' প্রত্যুত্তরে বলল লোকটা।

'নাম কী?'

'ইদরিস।'

'ঘটনা শুনছ নাকি?' একটু উদাস ভাবে জিজ্ঞাসা করল রতন।

'কী ঘটনা?' জিজ্ঞাসা করল লোকটা।

কাদের ভাইয়ের কাছে শোনা ঘটনাটা বলতে শুরু করল রতন।

এস. শাহরিয়ার আহমেদ সাগর

পোকা

তাসমিয়া আনন্দে হা-হা করে হেসে উঠল। সাথে সাথে মা দৌড়ে এসে দেখলেন আবার সেই একই কাণ্ড। হাবিবা কঠিন ধমক দিতে গিয়েও পারলেন না। বরং মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'আবার শুরু করলি?'

তাসমিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে মার দিকে তাকাল। মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে তিনিও হেসে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর রাতের রান্না করতে গিয়ে তিনি মেয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। নিজের মেয়ে বলে নয়, তাসমিয়া আসলেই সুন্দরী। আর সবচে' বেশি সুন্দর ওর মায়াভরা চোখ দুটো। ওই চোখে যেন একই সাথে হাসি আর কান্নার রূপ দেখা যায়। রূপে, গুণে অনন্যা তাঁর মেয়ে তাসমিয়ার একমাত্র দোষ, সে যখন যেখানে হাতের কাছে যত পোকাই পাক না কেন, ধরতে পারলেই পোকাটার চোখ গেলে দেয়। যেন এর চেয়ে আনন্দময় কোন কাজ পৃথিবীতে নেই। জ্ঞান হবার পর থেকেই ওর এই অভ্যাস। আজ বাইশ বছর পর্যন্তও অভ্যাসটা বদলায়নি। বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনের হাজার বোঝানোতেও কাজ হয়নি। এমনকী এজন্য তাসমিয়াকে ডাক্তার, কবিরাজ সবই দেখানো হয়েছে। নিয়ম করে খাওয়ানো হয়েছে নানারকম ওষুধ কিংবা গাছের রস। তবুও কোনও কাজ হয়নি। মাঝে মাঝেই হাবিবা মেয়ের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর খোদার কাছে প্রার্থনা করেন, মেয়ের যেন কোনও অমঙ্গল না হয়।

বছরখানেক আগে বহুদূরের গ্রামে এক তান্ত্রিকের খোঁজ পেয়ে হাবিবা তাসমিয়াকে সেখানে নিয়ে যান এ অদ্ভুত রোগ সারানোর জন্য। ধুপ জ্বালানো অন্ধকার সে ঘরে বসে তান্ত্রিক অনেকক্ষণ তাসমিয়াকে পর্যবেক্ষণ করেন, তারপর ঘোষণার মত করে বলেন, 'তোর মেয়ের এ নেশাই তার সর্বনাশ করবে আর তাতে তার শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অঙ্গটি নষ্ট হয়ে যাবে।'

অবশ্য এ কথায় সবচে' বেশি হেসেছিল তাসমিয়া আর ওর বাবা। তারা কিছুতেই একথা বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু সেই থেকে হাবিবা সবসময়ই মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত থাকেন। হাজার হলেও মায়ের মন তো।

...তাসমিয়াদের বাসা ধানমণ্ডি আর ওর নানা-বাড়ি যাত্রাবাড়ি। একদিন খবর আসে নানী খুব অসুস্থ, তাই মাকে যেতে হবে। সেসময় বাবা ট্যুরে গিয়েছিল আর তাসমিয়ার সেমিস্টার পরীক্ষা চলছিল। তাই মাকে একাই যেতে হলো। হাবিবা তাসমিয়াকে একা রেখে কখনও কোথাও না গেলেও এখন ভাবলেন, একটা রাতেরই তো ব্যাপার। মেয়েকে আদর করে বলে গেলেন, কাল সকালেই চলে আসব। মায়ের কাছে যাওয়ার পরও তিনি বারবার মেয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। রাতে শোয়ার পরও ঘুম আসছিল না, এমন সময় টেলিফোনের আওয়াজ পেয়ে

তিনি দৌড়ে গেলেন। কী জানি কেন, অজানা আশঙ্কায় তাঁর বুক কাঁপছিল।

তখন রাত প্রায় তিনটা। ওপ্রান্ত থেকে তাসমিয়া প্রায় শোনা যায় না এমন কণ্ঠে বলল, 'মা, আমার খুব ভয় করছে। বাসায় অনেক পোকা, কিন্তু কোনটারই চোখ নেই।' অনেকটা স্বগতোক্তির মতই তাসমিয়া বলল, 'এরা কি আমাকে খেয়ে ফেলবে, মা?'

এর পরপরই হাবিবা সূক্ষ্ম চিৎকারের শব্দ পেলেন, তারপর সব নীরব হয়ে গেল।

হাবিবা কোনরকমে তাঁর ভাইকে ঘুম থেকে তুলে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বললেন। তার এমন উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে হামিদ তক্ষুণি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পর ট্যাক্সিক্যাব নিয়ে আসতে না আসতেই হাবিবা তাতে উঠে বসলেন। তিনি সমানে আল্লাহকে ডাকছেন যেন বাসায় ফিরে মেয়েকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় ভাইয়ের কোন কথাই তাঁর কানে যায় না। গভীর রাতে রাস্তা ফাঁকা থাকায় দ্রুতই তাঁরা বাসায় চলে আসেন। দৌড়ে দোতলায় উঠতেই তিনি দেখতে পান সিঁড়ি ঘরের একশো ওয়াটের বাতি জ্বলছে আর ছোট্ট প্যাসেজে শুয়ে আছে তাসমিয়া। তিনি আর কিছু দেখার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়েন তাঁর ভাইয়ের হাতের উপর।

অবাক হামিদ তাসমিয়ার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন, তাসমিয়ার শরীরের চারপাশে অসংখ্য চোখবিহীন পোকা চক্রাকারে ঘুরছে, আর কেউ যেন খুব যত্ন করে তার সবচে' সুন্দর অঙ্গ মায়াভরা হাস্যোজ্জ্বল চোখ দু'টো কোটর থেকে খুবলে নিয়েছে। চোখের বদলে সেখানে এখন শুধুই শূন্যতা।

কাজী তামান্না তৃষা

মরা মানুষের হাত

১ ডিসেম্বর

একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে আমার জীবনে। ঘটনাটি ঘটেছে মাস দুই আগে, ফ্যাক্টরিতে। আমাকে ফ্যাক্টরির ফোরম্যান জলিল ভাই খবর দিয়েছিলেন কারখানার ডাই স্টাম্প মেশিনটি কাজ করছে না। প্রচণ্ড কাজের ধকল সইতে না পেরে নাকি হঠাৎ করে বিগড়ে বসেছে যন্ত্র।

'জলদি মেশিনটা সারাতে হবে, রায়হান,' বললেন জলিল ভাই। 'কাল সকালের মধ্যে মাল ডেলিভারি দিতে না পারলে দাইচুং স্টিলের কন্ট্রাক্টটা আমরা হারাব। কোরিয়ানদেরকে তো জানো–ডেডলাইনের ব্যাপারে একচুল এদিক-ওদিক ওরা সইবে না।'

মেরামতিটা কঠিন কিছু নয়–কিনার থেকে খানিকটা মেটাল তুবড়ে গিয়ে অচল করে দিয়েছে বিপুলাকারের যন্ত্রদানবকে। আমি ডাই স্টাম্পারের পাওয়ার অফ করে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম মূল মেশিনের কাছে। লেগে গেলাম কাজে।

'জলদি করো, রায়হান,' হাঁক ছাড়লেন জলিল ভাই।

'করছি,' প্রত্যুত্তর দিলাম আমি। ত্রিশ মিনিট পরে ঘোষণা করলাম, 'কাজ শেষ।' ভারি একটি ডাই প্লেট তুলে Platen-এর ওপর বসিয়ে দিলাম।

'ঠিক আছে। এবার মেশিনটা চালু করেন তো।'

ফোরম্যান আবদুল জলিল পাওয়ার বাটন চেপে ধরলেন–কিন্তু ঘটল না কিছুই।

'কই, মেশিন তো চলছে না,' বিরক্তি প্রকাশ করলেন জলিল ভাই। 'হতচ্ছাড়াটার পেছনে আর কত সময় দিতে হবে?'

ডাই অপারেটর রাকিব মুখে দেশলাই কাঠি গুঁজে গা জ্বালানো মুখ টেপা হাসি হাসছে। ওর হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে গেল। রাগের চোটে কারখানার প্রথম আইনটির কথা বিস্মৃত হলাম আমি। প্লাটেন-এর ওপর ঝুঁকলাম, শরীরটাকে মুচড়ে নিয়ে তাকালাম মেশিনের কেন্দ্রস্থলে। হয়তো কোনও প্রতিবন্ধকতা এখনও রয়ে গেছে যা চোখ এড়িয়ে গেছে আমার।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ, কর্কশ, গুনগুন আওয়াজ নিয়ে চালু হয়ে গেল পাওয়ার, নড়ে উঠল ডাই স্টাম্প।

'সাবধান, রায়হান!' জলিল ভাইয়ের চিৎকার ভেসে এল কানে, দেখলাম স্টাম্পার কয়েক টন ওজন নিয়ে নেমে আসছে আমার গায়ে। মরিয়ার মত গড়ান দিলাম, পিছনে সরে যেতে চাইলাম। শরীর প্রায় পুরোটাই মেশিনের বাইরে চলে এসেছে আমার। এমন সময় ডান হাতে যেন আগুন ধরে গেল, বর্ণনাতীত যন্ত্রণায়

আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে...আঁধার হয়ে এল দুনিয়া...

জ্ঞান ফিরল হাসপাতালে। আমার ডান হাতটা প্লাস্টার করা, স্লিং-এ ঝুলছে। ভোঁতা একটা ব্যথা ছড়িয়ে রয়েছে হাতে। বিছানার পাশে বসে আছেন অ্যাপ্রন পরা একজন ডাক্তার। 'যাক, রায়হান সাহেবের জ্ঞান ফিরল তবে। আমি ডাক্তার আতিক মাসুদ। আপনার চিকিৎসক।'

'কী...হয়েছে?' বিড়বিড় করলাম আমি। 'আমার হাতটা কী–?' ডানে-বামে মাথা নাড়লেন ডা. মাসুদ। 'আমি দুঃখিত,' মৃদু গলায় বললেন, 'হাতটাকে রক্ষা করতে পারিনি। ওটা মেশিনের চাপে মাংসের দলায় পরিণত হয়েছিল।'

গুঙিয়ে উঠলাম আমি। একহাতি মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার–আমাকে তো কোম্পানিই রাখবে না। কী হবে আমার! ডাক্তার ওদিকে বকবক করেই চলেছেন। তাঁর কথা কানে গেল আমার, 'নতুন টেকনিক–ট্রান্সপ্লান্ট ।'

'কী বললেন?' ভুরু কুঁচকে গেল আমার।

'বলছিলাম আপনি খুব ভাগ্যবান, মি. রায়হান। আপনার হাতটা কনুই থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যে আমরা আপনার ওপরে নতুন ট্রান্সপ্লান্ট টেকনিকটা খুব ভালভাবে কাজে লাগাতে পেরেছি।'

'মা-মানে?'

'মানে হলো আমরা আপনার শরীরে আরেকজন মানুষের হাত লাগিয়ে দিয়েছি।' আমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম ডাক্তারের দিকে, ওঁর কথা যেন মস্তিষ্কে ঢুকছে না। ডাক্তার বললেন, 'এ টেকনিক আমাদের দেশে একদমই নতুন এবং আমাদের হাসপাতালেই প্রথম এ ধরনের অপারেশন করা হলো। এসব কেসে রিজেকশনের সম্ভাবনা থেকেই যায়। তবে ডোনারের টিস্যু টাইপ আপনার সঙ্গে দারুণভাবে ম্যাচ করেছে। কাজেই আশা করা যায় আপনার শরীর নতুন হাতটি গ্রহণে কোনও ঝামেলা করবে না।' ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'কিছুটা ভাগ্য আর প্রচুর ধৈর্য থাকলে কয়েক মাসের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আবার কাজে লেগে যেতে পারবেন।'

তিন হপ্তা পরে খুলে ফেলা হলো প্লাস্টার। প্রথমবারের মত দেখতে পেলাম আমার নতুন হাত। অদ্ভুত এবং অচেনা মনে হলো হাতখানা। আমার নিজের হাতের চেয়ে লম্বায় সামান্য বড় নতুন হাত, উল্টোপিঠে প্রচুর লোম এবং আঙুলের গাঁটগুলো বক্সারদের মত কালশিটে পড়া। আমার শরীরের সঙ্গে এ হাত একদমই মানায়নি। কিন্তু তবু নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

'ক্ষতগুলো দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে,' কব্জিতে হাত বুলিয়ে বললেন ডা. আতিক মাসুদ। 'খুব ভাল লক্ষণ। কোনও সাড়া পাচ্ছেন হাতে?'

'কী? ও হ্যাঁ, চুলকাচ্ছে।'

'চমৎকার,' উজ্জ্বল দেখাল ডাক্তারের চেহারা। 'তবে এখনই হাত নাড়াচাড়ার চেষ্টা করবেন না। আরও ক'টা দিন যাক, তারপর আপনাকে ফিজিওথেরাপি দেব।'

নতুন হাতে পূর্ণ সাড়া নিয়ে আসার জন্য নানান ব্যায়াম করতে হলো আমাকে

ডাক্তারের নির্দেশে। এক্সারসাইজে আশ্চর্য ফল পেলাম। হপ্তাখানেকের মধ্যে হাত দিয়ে ছোট ছোট জিনিস তুলতে পারলাম। দিন পনেরো পরে জুতোর ফিতে বাঁধা কিংবা জামার বোতাম আটকানোর মত কাজও করা সম্ভব হলো।

থেরাপির জন্য আমাকে একটি পিয়ানো দেয়া হলো। 'বাজাতে না পারলেও সমস্যা নেই,' বললেন ফিজিওথেরাপিস্ট। 'স্রেফ প্রতিটি আঙুল আলাদাভাবে নাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যান।'

দিন দশেক পরে ডাক্তার মাসুদ এলেন আমার থেরাপি কেমন চলছে দেখতে। কিছুক্ষণ চুপচাপ লক্ষ করলেন আমাকে। তারপর হাসিমুখে বললেন, 'প্রগ্রেস মন্দ নয়। আপনার হাতে পঁচানব্বই ভাগ সাড়া ফিরে এসেছে। এতটা উন্নতি অবশ্য আমরা আশা করিনি।'

'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছি কবে?' জানতে চাইলাম আমি।

'আর কয়েকদিনের মধ্যেই।'

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই নতুন হাত নিয়ে জড়তা আমি অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছি। এটাকে এখন প্রায় আমার নিজের হাতের মতই লাগছে। ভালুকের মত বিরাট এবং রোমশ হাতটা আমার বাঁ হাতের পাশে বেঢপ দেখালেও নতুন হাতখানা দিয়ে যে কাজ চালাতে পারছি এই-ই ঢের।

তবে একটা ব্যাপার আমাকে বেশ বিব্রত করছে। মাঝে মাঝে হাতটা নিজে থেকেই যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠে, লাফ দিতে চায়। আমি ওটাকে যতই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করি, কাজ হয় না। ওটা নিজে থেকেই হ্যাঁচকা টান খায়, নড়তে থাকে। যেন রোমশ একটা মাকড়সা কব্জির শেষ প্রান্তে কিলবিল করছে।

একদিন বসে বসে বই পড়ছি, আকস্মিক জ্যান্ত হয়ে উঠল ডানহাত। ঝাঁকি খেতে লাগল আপনা আপনি। আমার খুব রাগ ধরে গেল। এ হাত তো আমার শরীরেরই অঙ্গ তা হলে কথা শোনে না কেন? ওকে আমার নির্দেশ মেনে চলতেই হবে।

আমি হাতটাকে হুকুম দিলাম ঝাঁকি থামানোর জন্য। পুরোপুরি মনোসংযোগ করলাম হাতের ওপর। পেশীতে খিঁচ ধরে গেল। অথচ হাতটা দিব্যি নিজের মত করে মোচড় খেতে লাগল, লাফাতে থাকল। বাম হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে ধরলাম বুকের সঙ্গে। আমার মুঠোর মধ্যে মোচড় খাচ্ছে ওটা–তারপর আমার বাম হাতের আঙুলগুলো মুচড়ে ধরল ডান হাতের আঙুল, এমন শক্তিতে চাপ দিল, ককিয়ে উঠলাম ব্যথায়। হঠাৎ বাম হাত ছেড়ে দিল ওটা–তারপর প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে বসল বিছানার পাশের টেবিলে, ছিটকে পড়ে গেল ওটা মেঝেতে। তারপর থেমে গেল ডান হাতের মোচড়ামুচড়ি।

ডাক্তার মাসুদকে বললাম ঘটনাটা। তেমন আমল দিলেন না। 'নার্ভাস খিঁচুনি,' ব্যাখ্যা করলেন তিনি। 'কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। নার্ভগুলো নিজেই দূর করে দেবে খিঁচুনি। কাজেই চিন্তার কিছু নেই।' আশ্বস্ত করলেন ডাক্তার।

আজ সকালে ডাক্তার মাসুদ এসেছিলেন আমাকে বিদায় জানাতে। আজ

আমি বাড়ি যাচ্ছি। হাসপাতালে আমাদের ফ্যাক্টরির মালিক,- ম্যানেজার, ফোরম্যান সহ বেশ কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ম্যানেজারের কাছেই জেনেছি অত্যাধুনিক এ হাসপাতালের চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার কোম্পানিই বহন [illegible]। যেহেতু ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে গিয়ে হাত হারিয়েছি, তাই নতুন হাত [illegible] প্লান্টের যাবতীয় খরচ যুগিয়েছে কোম্পানি। আমার জন্য তিনমাসের ছুটিও মঞ্জুর করা হয়েছে।

এতদিন হাসপাতালে থেকে ডাক্তার মাসুদের সঙ্গে আমার বেশ একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। তিনি আমার সঙ্গে ডানহাতে হ্যান্ডশেক করতে করতে বাঁ হাতে একটি ডাইরি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রতিদিন ডাইরি লিখবেন। নতুন হাতের জন্য লেখালেখির চেয়ে ভাল এক্সারসাইজ আর হয় না।'

আমি বাড়ি এসেই ডাইরি লিখতে বসে যাই। একদিনে অনেকখানি লিখে ফেলেছি। আজ আর নয়। কারণ নতুন হাতটা আবার বাঁদরামি শুরু করেছে, ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে। কাজেই এখন আমি বিশ্রাম নেব।

২ ডিসেম্বর

গতরাতে আমার ডান হাতখানা অনবরত লাফাচ্ছিল। এমনভাবে লাফাচ্ছিল যেন ইয়ো ইয়ো খেলছে। ঘুমাতে পারছিলাম না। শেষে ঘুমের বড়ি গিলতে হয়েছে। কিন্তু নতুন হাত দিয়ে বোতলের ছিপি খুলতে পারছিলাম না। আসলে হাতটা খুলতে দিচ্ছিল না। শেষে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরি ডানহাত এবং বাঁ হাতে ছিপি খুলে ফেলি। আজ অবশ্য আবার সবকিছু স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। দীর্ঘদিন পরে বাজারে গিয়েছিলাম। কাজের ছুটা বুয়া দু'বেলা রান্না করে দিয়ে যায়। একা মানুষ। দিব্যি চলে যায়।

যা বলছিলাম। বাজারে ভীরু মন নিয়ে ঢুকলেও কেউ আমাকে লক্ষ করেনি। মানে আমার বেঢপ সাইজের হাত কারও কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অপারেশনের পর থেকে অবশ্য আমি সবসময় ফুল হাতা শার্ট পরে থাকি। চাই না কেউ রোমশ, প্রকাণ্ড হাতটার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকুক।

বিকেলে আমার একমাত্র ভাগ্নে শুভ এসেছিল বাসায়। ও রাজধানীর একটি নামী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, কম্পিউটার সায়েন্সে। ওদের ইউনিভার্সিটিতে স্নুকার খেলার ব্যবস্থা আছে। পার্টনার হিসেবে ছাত্ররা গেস্টদের বাছাই করতে পারে। শুভ মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেত স্নুকার খেলতে। ও খুব ভাল স্নুকার খেলে। কোনওদিনই ওর সঙ্গে এ খেলায় জিততে পারিনি। কী আশ্চর্য, ওর মত তুখোড় খেলোয়াড়কে আজ পরপর দুই গেমে হারিয়ে দিলাম! বলাবাহুল্য আমার নতুন হাতের দুর্দান্ত মারই এ অসাধ্য সাধন করেছে।

'দারুণ দেখালে, বস্,' বলল শুভ। (ও ছোটবেলা থেকে আমাকে 'বস' বলে ডাকে, কখনোই 'মামা' বলে না)। 'ভাবছি তোমার মত হাত ট্রান্সপ্লান্ট করাব কিনা। তা হলে আগামী চ্যাম্পিয়নশিপ কেউ রুখতে পারবে না।'

সন্ধ্যা কাটল টিভিতে ফুটবল খেলা দেখে। ফিজিওথেরাপিস্ট কিছু ব্যায়াম

করতে বলেছিলেন। চোখ বুজে ব্যায়ামগুলো করতে হয়। করলাম। তারপর ঘুমাতে গেলাম।

৩ ডিসেম্বর

আজ আমার দিনটি খারাপ গেছে–খুবই খারাপ। সকালে হাতের পাগলের মত লাফালাফিতে ঘুম ভেঙে গেল। যেন পারকিনসন্স ডিজিজে আক্রান্ত হয়েছি। বুয়া আসেনি। গতকালই বলে গেছে তার মা'র অসুখ। বাড়ি যাবে। তাই নিজেই নাস্তা বানাতে গেলাম। কিন্তু হাতের যন্ত্রণায় তাও সম্ভব হলো না। আমার হাত দুটো কাঁচা ডিম মেঝেতে ছুঁড়ে ভাঙল। টেবিলে ময়দা ছড়িয়ে সাদা ভূত বানিয়ে ফেলল। বাঁ হাতে আবর্জনা পরিষ্কার করছি, বেজে উঠল ডোরবেল।

নিজাম। আমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। সিঙ্গাপুর গিয়েছিল ব্যবসার কাজে। ফিরেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। হাত বাড়িয়ে দিল নিজাম হ্যান্ডশেকের জন্য। আমিও বাড়িয়ে দিলাম হাত।

'বাড়িতে সুস্বাগতম, রায়হান ভাই,' বলল ও–হঠাৎ বিকৃত দেখাল চেহারা। কুঁচকে গেছে ব্যথায়। আমার নতুন হাতখানা ওর হাত ধরে প্রবল শক্তিতে চাপ দিচ্ছে–এবং আমি ওর হাত ছাড়তে পারছি না!

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল নিজাম। 'ঠিক আছে, রায়হান ভাই।' বলল ও। 'আপনার নতুন হাতে বেশ জোর আছে দেখছি। এখন তা হলে আমার বেচারা হাতটাকে ছাড়ুন।'

'আ-আমি হাত ছাড়তে পারছি না!' বিড়বিড় করলাম আমি। বাঁ হাতে ডান হাতের আঙুল ছুটিয়ে আনতে চেয়েও ব্যর্থ হলাম। ইস্পাতের আংটার মত ওগুলো চেপে ধরে রেখেছে নিজামের হাত।

'আরি, রায়হান ভাই!' তীব্র বেদনায় ফর্সা মুখ বেগুনি হয়ে গেছে নিজামের। 'করছেন কী আপনি? ছাড়ুন না!'

টের পেলাম নাগিনীর কুণ্ডলী যেন আরও চেপে বসল নিজামের হাতে। ব্যথার চোটে হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে নিজাম, মুক্ত হাতখানা দিয়ে আমার হাতে খামচি মারছে, ছুটিয়ে নিতে চাইছে নিজের হাত কিন্তু পারছে না। আমার এবং নিজামের সম্মিলিত চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে পৈশাচিক হাতের শক্তির কাছে।

হঠাৎ 'বাবাগো!' বলে আর্তনাদ করে উঠল নিজাম। আমি মট্ করে একটা শব্দ শুনলাম। নিজামের হাতের হাড় বোধহয় ভেঙেই গেছে। আর তখন, নিজের ইচ্ছাতেই যেন নিজামের হাতখানা ছেড়ে দিল আমার হাত, সুবোধ বালকের মত ঝুলে থাকল আমার শরীরের পাশে।

'আ-আপনি আমার হাতটা ভেঙে দিয়েছেন!' গুঙিয়ে উঠল নিজাম।

'আ-আমি দুঃখিত,' তোতলাচ্ছি আমি। 'দোষটা আমার না, বিশ্বাস করো। সব দোষ এই...এই হাতের। মাঝে মাঝে এ হাতটাকে কন্ট্রোল করতে পারি না আমি।'

নিজাম ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। আমি দ্রুত বলে চললাম,

'চলো, তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।'

'তার দরকার হবে না,' ঘাউ করে উঠল নিজাম। পিছিয়ে যেতে যেতে যোগ করল, 'আমি নিজেই ডাক্তারের কাছে যেতে পারব।'

আমি স্খলিত পদক্ষেপে ফিরে এলাম রান্নাঘরে। অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম জ্যান্ত কই মাছের মত লাফাতে থাকা হাতটির দিকে। পেশীতে বোধহয় খিঁচ ধরে গেছে, মনে মনে বললাম আমি। হ্যাঁ, তাই হবে। পেশীতে খিঁচ ধরলে আপনা থেকে হাত লাফাতেই পারে। হাতের লাফ দেয়ার এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হতে পারে। নিজামকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে হবে।

ঘটনাটি আমাকে বাকরুদ্ধ করে তুলল। মাথাটা কেমন ভার ভার ঠেকছিল। খোলা হাওয়ায় হাঁটলে ভাল লাগবে ভেবে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রমনা পার্কে একটা চক্কর দেয়ার পরে ঠাণ্ডা বাতাসে মাথা ধরাটা চলে গেল। পকেটের মধ্যে আর লাফাচ্ছে না হাত। বিষয়টি নিয়ে যত ভাবলাম, পেশীতে খিঁচ ধরার ব্যাখ্যা তত বেশি যৌক্তিক মনে হতে লাগল আমার কাছে।

বাড়ি ফেরার পথে প্রতিবেশীদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হলো। ওরা আমার সঙ্গে কুশল বিনিময় করল। বলল আমি সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরতে পেরেছি দেখে তারা খুশি হয়েছে। তবে এদের কারও সঙ্গেই আমি হ্যান্ডশেক করতে গেলাম না।

আমাদের মহল্লার সবচেয়ে বড় দোকান 'রইসউদ্দিন ট্রেডার্স অ্যান্ড বেকারী শপ'-এ এসে দাঁড়ালাম। এ দোকানে চাল-ডাল-তেল-ডিমের পাশাপাশি বিস্কিট-কেক-পেস্ট্রি সবই পাওয়া যায়। দোকানের এককোণে আবার খবরের কাগজ এবং গল্পের বই বিক্রিরও ব্যবস্থা করেছে রইসউদ্দিন। আমার খুব খিদে পেয়েছে। কেক আর পেস্ট্রি কিনলাম। বাসায় গিয়ে খাব। সকালের স্মৃতি মনে আছে। তাই রান্নার ঝুঁকিতে আর যাচ্ছি না। দাম চুকিয়ে দোকান থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় দ্বিতীয় ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটল।

'রায়হান ভাই,' পেছন থেকে ডাক দিল রইসউদ্দিন।

'আপনি কি বইটার পয়সা পরে দেবেন?'

'কীসের বই?'

'আপনার হাতের বইটা।' রইসউদ্দিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম। হাতে সেবা'র 'মন্টেজুমার মেয়ে' নামে ঢাউস এক পেপারব্যাক অনুবাদ। আমার ডান হাত জানতেও দেয়নি কখন ওটা শেলফ থেকে বই তুলে নিয়েছে!

'আ-আমি দুঃখিত,' কথা জড়িয়ে গেল আমার। 'আমি ভুলেই গেছিলাম বইটা নিয়েছি। আসলে এটা আমার দরকার নেই।'

আমি র‍্যাকে বইটা রাখার জন্য হাত বাড়ালাম–কিন্তু আমার হাত বইটা রাখতে দিল না। বইসহ হাতখানা পিছিয়ে এল ঝট করে, এবং আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওটা বইটাকে ছুঁড়ে মারল রইসউদ্দিনের মুখে।

সরাসরি মুখে গিয়ে বাড়ি খেল মন্টেজুমার মেয়ে। রইসউদ্দিনের চশমা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। শব্দ হলো ঠুন্–ভেঙে গেছে একটা কাচ। বিমূঢ় রইসউদ্দিন আর বেজায় বিব্রত আমি। আমি যা করতে পারলাম তা হলো–রইসউদ্দিনের কাছে

বিড়বিড় করে ক্ষমা চেয়ে ভূতে তাড়া খাওয়া মানুষের মত ছুটে পালিয়ে এলাম দোকান থেকে। এ পাড়ায় আসার পর থেকে আমি রইসউদ্দিনের নিয়মিত খদ্দের। কিন্তু আর কোনদিন কি লজ্জায় ও মুখো হতে পারব?

সোজা বাড়ি ছুটলাম। গেট দিয়ে ঢোকার সময় নিজামের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। হাতে ব্যাণ্ডেজ। আমাকে না দেখার ভান করে গেট থেকে বেরিয়ে গেল ও। বাসায় ঢুকে ফোন করলাম হাসপাতালে। চাইলাম ডাক্তার আতিক মাসুদকে। তিনি সাড়া দেয়ার পরে হড়বড় করে উত্তেজিত গলায় বর্ণনা করতে গেলাম আজকের ঘটনা। আমাকে শান্ত হতে বললেন ডাক্তার। জানালেন নিজেই আসছেন আমার বাসায়। সামনাসামনি বসে শুনবেন সব কিছু।

ডাক্তার মাসুদ যখন বাসায় ঢুকলেন ততক্ষণে অনেকটাই প্রশমিত করতে পেরেছি উত্তেজনা। তিনি জানতে চাইলেন কী হয়েছে। বাঁধ ভাঙা বানের পানির মত পেট থেকে উগরে দিলাম সব। পেশাদার স্থিরতা নিয়ে তিনি শুনলেন ঘটনা।

'আপনি এত ঘাবড়ে গেছেন কেন, মি. রায়হান,' ভর্ৎসনার সুর ডাক্তারের কণ্ঠে। 'আপনাকে তো আগেই বলেছি সুস্থির হতে হাতটা ক'দিন সময় নেবে।'

'সুস্থির?' রীতিমত চেঁচালাম আমি। 'একদিনে দু'দুটো হামলা–আর আপনি বলছেন সুস্থির হতে সময় নেবে? এ হাতটা পাগল হয়ে যাচ্ছে–আমি কোনভাবেই এর উন্মাদনা ঠেকাতে পারছি না।'

ডাক্তার মাসুদ আমার হাত পরীক্ষা করতে লাগলেন। আমাকে যেন ঠাট্টা করার জন্য ডাক্তারের ভাষায় 'সুস্থির' হয়ে ওটা নির্জীব পড়ে রইল শরীরের পাশে।

'শুনুন, ডাক্তার,' বললাম আমি। 'কোথাও কোন ভজকট হয়েছে–মস্ত কোনও ভজকট! এই হাত–এটা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় চলে। নিজাম এবং রইসউদ্দিনের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে–এই হাত ইচ্ছে করে তা ঘটিয়েছে–'

মুখ বাঁকালেন ডাক্তার। 'আপনি কি একটু বেশি কল্পনার সাগরে গা ভাসাচ্ছেন না, মি. রায়হান?'

'কল্পনা হলে তো ভালই হত।' নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হলো আমার। 'আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব–এ হাতটা কোত্থেকে এসেছে? কার হাত এটা?'

'এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না,' সাদামাটা গলায় জবাব দিলেন আতিক মাসুদ।

'কারণ আছে কি নেই সে আমি বুঝব,' খেঁকিয়ে উঠলাম আমি। 'কিন্তু হাতটা যে রকম আচরণ করছে তার কোনও ব্যাখ্যা তো আছে, নাকি?'

'এবং আপনার ধারণা সে ব্যাখ্যা হাতের মূল মালিকের সঙ্গে জড়িত?' থমথমে দেখাল ডাক্তারের চেহারা। 'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না ট্রান্সপ্লান্টের পরে ওই লোকের কিছু আচার-আচরণ আপনার ভেতরে ঢুকে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, আমি তা-ই ভাবছি। ব্যাখ্যাটা তো এরকমই হবে, তাই না?'

'না, মি. রায়হান। ব্যাখ্যা তা হবে না। আপনি যার প্রতি ইঙ্গিত করছেন তা হলো মেডিকেল পসিবিলিটি। তা ছাড়া, ডোনারের পরিবারের অনুমতি ছাড়া ডোনারের পরিচয় প্রকাশ করা অনৈতিক কাজ হবে। আর এক্ষেত্রে আমাদের কাছে

সেরকম কোনও পারমিশনও নেই।'

'তা হলে ব্যাখ্যাটা কী?' গর্জে উঠলাম আমি।

'ওই যে বললাম–পেশীর খিঁচুনি এবং নার্ভাস টেনশন। চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হতাশা এবং অসহায়ত্ব চোখে পানি এনে দিল আমার। 'চিন্তা না করে উপায় কী?' ভাঙা শোনাল গলা। 'এ হাতটা আমাকে দিয়ে উন্মাদের মত আচরণ করাচ্ছে!' ডাক্তার মাসুদ আমাকে ঘুমের জন্য সিডেটিভ দিলেন। দুশ্চিন্তা করতে আবার মানা করলেন এবং 'সব ঠিক হয়ে যাবে' গতানুগতিক সান্ত্বনার বুলিটি শুনিয়ে বিদায় নিলেন।

সারাটা বিকেল এবং সন্ধ্যা ঘুমিয়ে কাটল আমার সিডেকটিভের কল্যাণে। এখন যখন ডাইরি লিখছি, রাত দ্বি-প্রহর। আমার হাত সুবোধ বালকের মত ডাইরি লিখে চলেছে। তবে ডাক্তার মাসুদ যা-ই বলুন গ্রাহ্য করি না–আমি খুব ভাল করেই জানি এ হাতের জীবন আছে এবং এ পুরোপুরি নিজের ইচ্ছায় চলে।

এবং আমি যত হাতটিকে নিয়ে চিন্তা করছি ততই মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে, এরকম আচরণের জন্য হাতের মূল মালিকই দায়ী। লোকটার পরিচয় আমাকে জানতেই হবে–নইলে ঠিক পাগল হয়ে যাব!

৪ ডিসেম্বর

খোদা, এ আমি কী করলাম? পুলিশ জানতে পারলে কী হবে? ডাক্তার আতিক মাসুদকে হত্যার বিষয়টি তাদেরকে কখনোই ব্যাখ্যা করতে পারব না, বললেও তারা বিশ্বাস করবে না যে কাজটা আমি করিনি–করেছে আমার হাত!

আমার আসলে হাসপাতালে যাওয়াই উচিত হয়নি–কিন্তু রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলাম যে! আজ সকালে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। গার্ডের চোখ এড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। সে বর্ণনায় যাচ্ছি না। হাসপাতালে ঢুকে হনহন করে এগিয়ে গেলাম ক্লোকরুমে। এখানে কেবিনেটের হ্যাঙারে ডাক্তারদের অসংখ্য সাদা কোট ঝুলছে। ওগুলোর মাঝ থেকে একটা বেছে নিয়ে গায়ে চড়ালাম। হাতটা কোনও বাধার সৃষ্টি করল না। যেন জানত দুষ্কর্ম করতে এসেছি আমি এবং সে আমাকে সহায়তা করছিল।

লিফটে চেপে সোজা চলে এলাম চারতলায়। লক্ষ করল না কেউ। হাঁটা দিলাম ডা. আতিক মাসুদের অফিসে। দরজা খোলাই ছিল। কাজেই সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লাম ঘরে। একদিকের দেয়ালঘেঁষা আধ ডজন ফাইল কেবিনেট এবং একটি র‍্যাকে ফোল্ডার। আমি A-D লেখা কেবিনেটের সামনে চলে এলাম। বন্ধ। একটু খুঁজতেই ডেস্কের ড্রয়ারে পেয়ে গেলাম চাবির গোছা। দ্রুত 'A' লেখা কেবিনেটের তালা খুলে ফেললাম। হাতড়াতে লাগলাম রেকর্ড ফাইল।

আবু রায়হান: ফাইলটি বের করে নিলাম কেবিনেট থেকে। বন্ধ করলাম ড্রয়ার। ডেস্কে রাখলাম ফাইল একের পর এক পাতা ওলটাচ্ছি। দৃষ্টি স্থির হলো 'DONOR' লেখা কাগজটিতে।

পড়তে শুরু করলাম। যা ভয় করেছিলাম তাই। ডোনার আহমেদ ফারুক গত ৩০ অক্টোবর মারা গেছে পাবনার মানসিক হাসপাতালে। এই ফারুক ছিল এক ভয়ংকর খুনী। সে বরিশালে এক পরিবারের তিন সদস্যকে জবাই করে হত্যা করার পরে ধরা পড়ে যায়। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যায়, সে ছিল মানসিক ভারসাম্যহীন। হাসপাতালে গলায় রশি বেঁধে আত্মহত্যা করেছিল আহমেদ ফারুক। তবে মৃত্যুর পরেও তার শারীরিক কাঠামোর কোনও ক্ষতি হয়নি। ট্রান্সপ্লান্টের জন্য যা ছিল যথার্থ। ফাইল বন্ধ করে দিলাম। যথার্থ? হাসি এসে গেল আমার, এক উন্মাদ খুনীর হাত বসিয়ে দেয়া হয়েছে আমার শরীরে?

দরজায় শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকালাম। ডাক্তার মাসুদ। দাঁড়িয়ে আছেন দোরগোড়ায়। রাগে জ্বলছে চোখ।

'এখানে কী করছেন, মি. রায়হান?' ক্রুদ্ধ গলায় প্রশ্ন করলেন ডাক্তার। ঢুকে পড়লেন ঘরে। আমি চেয়ার ছেড়ে সিধে হলাম।

'কেন?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'আপনি কেন আমার এতবড় সর্বনাশ করলেন?'

'সর্বনাশ? আমি আপনাকে নতুন একটি হাত উপহার দিয়েছি, বাংলাদেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসে এ ধরনের সফল ট্রান্সপ্লান্ট আমিই প্রথম করলাম, আর আপনি একে সর্বনাশ বলছেন?' বলতে বলতে উত্তেজিত মাসুদ চলে এলেন আমার সামনে। আর ঠিক তখন ছোবল মারল আমার ভুতুড়ে ডানহাত। খপ করে বজ্র মুষ্টিতে চেপে ধরল ডাক্তারের গলা। খক্ খক্ করে উঠলেন তিনি। খোদার কসম বলছি, হাতটাকে থামাবার চেষ্টা করেছি আমি কিন্তু পারিনি। হাতটাতে অস্বাভাবিক শক্তি ভর করেছিল—এক উন্মাদের আসুরিক শক্তি!

ডাক্তার মাসুদের চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল, হাঁ হয়ে গেছে মুখ, নিঃশব্দ চিৎকার বেরিয়ে আসছে। হাতটার হিংস্র চাপ তাঁর গলায় ক্রমে বেড়ে চলল। একটু পরেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন ডাক্তার। আমিও হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম তাঁর গায়ের ওপর।

বিকট এবং বীভৎস ঘরঘরে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল ডাক্তার মাসুদের গলা দিয়ে—তারপর থেমে গেল। চোখের মণি উল্টে গেছে। চিকিৎসক না হয়েও দিব্যি বুঝতে পারছি মারা গেছেন ডাক্তার। যেমন চট করে গলা চেপে ধরেছিল হাতটা, তেমনি ঝট করে ছেড়েও দিল। কাঁপতে কাঁপতে খাড়া হলাম। আমার প্রথম এবং একমাত্র চিন্তাটা জাগল মাথায়, পালাতে হবে...

বাড়িতে বসে ডাইরি লিখছি। তবে মস্তিষ্কে বয়ে যাচ্ছে চিন্তার ঝড়। সারাদিন ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলাম এই বুঝি দরজার কড়া নাড়ল পুলিশ। কিন্তু পুলিশ আসেনি।

এখন কী করব? নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেব? বাকি জীবনটা জেলের ঘানি টানব নাকি তারচেয়েও খারাপ দশা হবে—পাগলাগারদে পাঠিয়ে দেয়া হবে আমাকে। কসম খেয়ে বললেই বা কে বিশ্বাস করছে যে কাজটা আমি করিনি?

না, আমি কিছুই স্বীকার করব না। ডাক্তারকে হত্যার জন্য দায়ী আহমেদ ফারুকের হাত, আমি নই! যে ভয়ংকর কাজ ওটা করেছে তার শাস্তি ওকে পেতেই

হবে।

এখন প্রায় মাঝরাত। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি। কাল ফ্যাক্টরিতে যাব। সটান চলে যাব ডাই স্টাম্পার মেশিনে। চালু করে দেব মেশিন। আহমেদ ফারুকের পৈশাচিক হাতটা রাখব প্লাটেনের ওপর। আমার নিজের হাতটা যেভাবে মাংসের দলায় পরিণত হয়েছিল, আমি দেখব খুনেটার হাতে কয়েক টন ওজনের ডাই স্টাম্প পড়ে ওটাকে রক্তাক্ত মাংসের পিণ্ডে পরিণত করেছে–তারপর চিরদিনের জন্য রেহাই পাব কুৎসিত, কদাকার এই ট্রান্সপ্লান্টের কবল থেকে।

হাতটা আবার ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে। লিখতে সমস্যা হচ্ছে। আমি কী করতে যাচ্ছি, বোধহয় টের পেয়ে গেছে শয়তানটা। কিন্তু ভৌতিক এই হাত আমাকে কিছুতেই বাধা দিতে পারবে না–কিছুতেই না!

৫ ডিসেম্বর

বেচারা আবু। নির্বোধ আবু রায়হান! ভেবেছিল আমার কবল থেকে রেহাই পাবে। পাগল না হলে কেউ এমন চিন্তা করে? ওর জানা উচিত ছিল আমি অমন কাজ ওকে কোনদিনই করতে দেব না।

আবু রায়হান ডাইরি লিখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পরে গলায় হাতের শক্ত চাপ খেয়ে জেগে যায়। ও নিশ্চয় বেকুব বনে গিয়েছিল দেখে আমি প্রচণ্ড শক্তিতে ওর গলা চেপে ধরেছি। নিঃশ্বাসের অভাবে পাগলের মত দাপাদাপি করছিল আবু রায়হান। গলা দিয়ে ঘরঘরে আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল।

কাজটা আমি করেছি রয়ে সয়ে। আবু মৃত্যুর আগে বুঝতে পেরেছে আমার চেয়ে ঘটে বেশি বুদ্ধি নেই ওর। অনেক ধস্তাধস্তি করছিল আবু রায়হান। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি কোনও। দুর্বল হাত দিয়ে আমার সবল হাত সরিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছে শুধু...

আবু রায়হানের মৃত্যুর এক ঘণ্টা পরে লাশটা টানতে টানতে বিছানা থেকে নামিয়ে এনেছি আমি। তারপর মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এসেছি ডেস্কে। এখানে আবু ওর ডাইরি রাখত। ওর ডাইরির মালিক এখন আমি। এখন থেকে প্রতিদিন আমি ডাইরি লিখব। নিজেকে সবল রাখার এটাই সর্বোৎকৃষ্ট থেরাপি, বলে গেছেন ডাক্তার আতিক মাসুদ।

অনীশ দাস অপু

***